গবেষণামূলক ফিকহি প্রবন্ধ সংকলন-১

ইসলাম ও জীবন

الجامعة الشرعية مالي باغ ڈھاکہ

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন, 'বিবাহের মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া আবাদ করার লক্ষ্যে মানব প্রজন্মের ধারা অব্যাহত রাখা। দুনিয়া যেন কখনো মানব-শূন্য না হয়। আর যৌনকামনা পুরো করা মৌলিক উদ্দেশ্য নয়; এটি সৃষ্টি করা হয়েছে মানব বংশ বিস্তারের প্রেরণা হিসাবে।'[১]

যৌনকামনা চরিতার্থ করা যদিও বিবাহের মৌলিক মাকসাদ নয়। তবে এটি অবশ্যই বিবাহের 'আখলাকী গরয'। আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. বলেছেন, 'বিবাহের আখলাকী গরয তথা চারিত্রিক উদ্দেশ্য হলো, বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ চরিত্র হেফাজত করবে। স্ত্রী ব্যতীত অপাত্রে যৌনকামনা চরিতার্থ করবে না।'[২]

সারকথা, বিবাহ ও পরিবার গঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—

ক. স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে সুকূনে কলব (মানসিক প্রশান্তি) হাসিল করা।
খ. মানববংশ বিস্তার।
গ. চারিত্রিক সুরক্ষা।[৩]

সর্বোপরি বিবাহের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাহ অর্জন করা।

এখন আমাদের ভাবতে হবে, বিবাহের মাধ্যমে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলো আমি অর্জন করতে পারছি কি না? চরিত্রের সুরক্ষা হচ্ছে কি না? বিবাহের আগে যেমন গাইরে মাহরাম নারী বা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি যেত, বিবাহের পরও কি যায়? মাকসাদ বা উদ্দেশ্য অর্জন হলে কতটুকু হচ্ছে? আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

বিবাহপূর্ব প্রস্তুতি : ইসলামের দৃষ্টিতে

[বিবাহের পূর্ব প্রস্তুতি পর্বকে দুটি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা : প্রাথমিক ও বুনিয়াদী ধাপ। এ ধাপে মৌলিক বিষয়গুলো আলোকপাত করা হবে। দুই. চূড়ান্ত ধাপ। এ ধাপে বিবাহের সাথে খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রাথমিক ধাপ

বিবাহপূর্ব প্রস্তুতিমূলক প্রাথমিক ধাপে মোট ৫ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যথা—

১. বয়স
২. শারীরিক সুস্থতা

---

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ৫/২৯২

২. সীরাতুন্নবী : ৬/২৫৬

৩. বাদায়েউস সানায়ে : ৩/২৯৬– الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ، وَهُوَ السَّكَنُ، وَالتَّوَالُدُ، وَالتَّعَفُّفِ

৩. ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক সামর্থ্য
৪. বিবাহের সহীহ নিয়ত
৫. বিবাহবিষয়ক পড়াশোনা

নিম্নে প্রত্যেকটি বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হলো—

১. বয়স

মৌলিকভাবে ইসলামে বিবাহের জন্য এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বয়স বলে দেওয়া হয়নি যে, এর আগে বিবাহ করা বৈধ নয়। এর যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো, দেশ ও সমাজের ভিন্নতার কারণে বিবাহের প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট সবার ক্ষেত্রে একরকম হয় না।

কখনো প্রয়োজন হয় সাবালক হওয়ার আগেই বিবাহের আকদ করিয়ে দেওয়া। পিতা সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনা করে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কারো দৈহিক বৃদ্ধি ও গঠন প্রক্রিয়া বলে দেয় বিবাহের উপযুক্ততা। কারো জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যায় যে, বিয়েটা দ্রুত সেরে ফেলতে হয়। মোটকথা, বিষয়টি কুরআন-হাদীসে মানুষের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু লক্ষণীয় হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই 'বিবেচনা' করার জন্য একটি বয়স দরকার। একটি বিয়ে মানেই এর মধ্যে অন্তত পাঁচটি বিষয় চলে আসে। যথা—

ক. শারীরিক সম্পর্ক।
খ. সন্তান ধারণ।
গ. সন্তান প্রতিপালন।
ঘ. ঘর সামলানো।
ঙ. স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ।

উক্ত পাঁচটি বিষয় যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একটি বয়স অবশ্যই জরুরি। সেটা কতটুকু হবে? এটি একেক দেশের জন্য একেক রকম হতে পারে। গত ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফিক্হ একাডেমি 'মাজমাউ ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দাহ'-এর ২৩ তম ফিকহি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যে কয়টি বিষয়ে শরয়ী রেজুলেশন পাশ হয়েছে, তন্মধ্যে একটি ছিল 'বাল্য বিবাহ'। উক্ত রেজুলেশনের ধারা-২ এ বলা হয়েছে,

شريعة الإسلام لم تحدد سنا لإبرام عقد الزواج، أما سن الدخول بالزوجة، فهو من الأمور التي تتحد بحسب أحوال الزمان والمكان، وبحسب صلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة.

অর্থ : শরীয়তে বিবাহের সুনির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। তবে বাস্তবে বিবাহ করে ঘর সংসার করার জন্য যে উপযুক্ত বয়স দরকার সেটা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততার বিচারে ও পারিবারিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ণিত হবে।

কোনো দেশের সরকার যদি চায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, নারীরা যেন অত্যাচারিত না হয় সেজন্য তার দেশের আবহাওয়া ও সামাজিক অবকাঠামো অনুযায়ী বিবাহের একটি ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে দিতে তাহলে সেই অধিকার তার আছে। উক্ত রেজুলেশনের ধারা : ৮ এ বলা হয়েছে,

لكل بلد الحق في تحديد السن المناسب للزواج، حسب ما يراه محققا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوج الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.

অর্থ : প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার আছে, তার দেশের জন্য বিবাহের সুনির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া। ওই দেশের মেয়েদের, সমাজ ও পরিবারের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তা করা হবে। কেউ প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের আগেই বিবাহ সম্পন্ন করলে তার জন্য যৌক্তিক শাস্তির বিধানও রাখা যাবে।'[১]

উক্ত রেজুলেশনে মেয়েদের বিবাহের স্বাভাবিক বয়স প্রস্তাব করা হয়েছে অন্তত ১৫-১৬ বছর বয়স। এর আগে কেউ নিজ মেয়েকে বিবাহ দিতে হলে আদালতের অনুমতির কথাও বলা হয়েছে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে যে আইন আছে, সে অনুযায়ী ছেলেদের বিবাহের বয়স-২১, মেয়েদের বিবাহের বয়স-১৮। তবে এর পাশাপাশি গত 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'-এ বলা হয়েছে, 'উক্ত বয়সের আগেই বিবাহের স্বার্থ দেখা দিলে আদালতের নির্দেশে বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে।'

মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে দেশীয় আইন অনুসরণ করা উচিত। এর সাথে শরীয়াহ্‌র কোনো বিরোধ নেই। তবে উক্ত বয়সের আগেই বিবাহ করতে চাইলে বা কন্যাকে বিবাহ দিতে চাইলে সেক্ষেত্রে মেয়ের স্বার্থ যেন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. শারীরিক সুস্থতা

বিবাহের একটি পূর্বপ্রস্তুতি হলো, শারীরিক সুস্থতা। কেউ যদি বড়ো ধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত থাকেন, যদ্দরুন তিনি স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম, তাহলে সেটা গোপন করে বিবাহ সম্পাদন করা বৈধ নয়।

বর্তমান সময়ে অনেকে বিবাহের পূর্বে মেডিক্যাল টেস্ট করানোর কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে এখানে কিছু আলোপাত করা হলো—

---

১. দেখুন-http://www.iifa-aifi.org/4867.html

বিবাহের পূর্বে মেডিক্যাল টেস্ট (Premarital Screening)

বিবাহ একটি স্থায়ী বন্ধনের নাম। এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ে ওঠে। এর সাথে জড়িয়ে আছে দুটি প্রাণ ও ভবিষ্যৎ বহু প্রাণের মেল-বন্ধন। এ বন্ধনগুলো যেন সঠিক ও সুরক্ষিত থাকে সেটা ইসলামে মৌলিকভাবে কাম্য। বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল টেস্ট মূলত বিবাহকে স্থায়ী করণে ভূমিকা রাখে।

বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল টেস্ট বলতে কী বুঝায়?

সৌদি আরবের 'মিনিস্ট্রি অব হেলথ' এর পরিচয় দিয়েছে এভাবে—

Definition of Premarital Screening:

It is defined as conducting examination for couples intending to marry; in order to identify if there is any injury with genetic blood diseases such as sickle-cell anemia (SCA) and Thalassemia, and some infectious diseases such as hepatitis B, C and HIV "Aids". This is in order to provide medical consultation on the odds of transmitting these diseases to the other marriage partner or the children in the future, and to give options and alternatives before soon-to-be married with the aim of helping them plan for a healthy, sound family.

অর্থাৎ 'বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল টেস্ট' বলতে বোঝানো হয়, বিবাহ করতে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর মেডিক্যাল চেকআপ করানো। যার মাধ্যমে রক্তবাহী মারাত্মক কোনো বংশানুক্রম রোগ আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। যেমন, অ্যানিমিয়া, থেলাসেমিয়া, হেপাটাইটিস বি. সি. ও এইচ আই ভি ভাইরাস। এ পরীক্ষাগুলো করা হয় যেন তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যায় যে, এ রোগগুলো অপর সঙ্গী ও বাচ্চাদের মাঝেও সংক্রমণ হতে পারে। তারা যেন বিবাহের আগেই সব বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সর্বোপরি একটি সুস্থ নিরাপদ পরিবার যেন গড়ে ওঠে।[১]

থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তরোগ। এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হলে সন্তান এতে আক্রান্ত হতে পারে। তদ্রূপ হেপাটাইটিস একটি লিভারসংক্রান্ত রোগ। এর বি ও সি স্তরটি মারাত্মক। পাত্রী যদি এ রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে স্বামী, সন্তানও সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তদ্রূপ পাত্রী অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত থাকলে সন্তান নিতে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া কোন রক্ত গ্রুপের জন্য কোন রক্ত গ্রুপধারী উপযুক্ত তাও বিয়ের আগেই পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়।

১. https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে বিবাহের পূর্বে মেডিক্যাল চেকআপ করানো দূষণীয় নয়। হাদীসে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

অর্থ : (যাও) তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারী মেয়েদের চোখে কিছু ত্রুটি আছে।[১]

ইমাম নববী রহ. লিখেছেন, এখানে চোখের ত্রুটি বলতে বোঝানো হয়েছে, চোখ অস্বাভাবিক ছোটো হওয়া। কেউ বলেছেন, নীল রঙের হওয়া বা দৃষ্টিশক্তি কম থাকা।[২] ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, মাক্কাতুল মুকাররামা তাঁদের ১৭ তম সেমিনারে ২০০৩ সালে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজুলেশন পাশ করেছে। তাতে তাঁরা লিখেছেন,

'ইসলামী ফিকাহ একাডেমি প্রতিটি দেশের সরকার ও ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি নিবেদন করেছে, তারা যেন প্রাক-বিবাহ মেডিক্যাল টেস্টের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলেন। এর প্রতি যেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ টেস্টে যারা আগ্রহী হবে তারা যেন খুব সহজেই এ সেবা পেয়ে যায়। পাশাপাশি এ টেস্টের তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে না। কেবল সরাসরি সংশ্লিষ্টদেরই একান্তভাবে জানানো হবে।'[৩]

বস্তুত বিবাহের পূর্বের মেডিক্যাল চেকআপের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। ইতিবাচক দিক তো স্পষ্ট।

নিরাপদ দাম্পত্য জীবন গড়তে তা সহায়ক হবে। নেতিবাচক দিক হলো, পরীক্ষায় নেতিবাচক কিছু ধরা পড়লে সেটা জানাজানি হয়ে যাবে। এতে পরবর্তীতে বিবাহ করাই কঠিন হয়ে যেতে পারে।

অতএব এ ব্যাপারে আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর সেটা হলো,

বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল টেস্ট এতটা আবশ্যক করা যাবে না যে, এটা বিবাহের অন্যতম শর্ত। কারণ শরীয়তে বিবাহের মৌলিক শর্ত বলে দেওয়া হয়েছে। এর ওপর অতিরিক্ত অন্য কোনো শর্তারোপ করা যাবে না। ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, মক্কাতুল মুকাররামা তাঁদের পূর্বোক্ত রেজুলেশনে এ কথাটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

---

১. সহীহ মুসলিম : ৩৩৪৯ । بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

২. শরহে নববী আলা সহীহ মুসলিম, ৯ : ২১০ (দারু ইহয়াইত তুরাছ, বৈরুত) :

قِيلَ: الْمُرَادُ صِغَرٌ، وَقِيلَ: زُرْقَةٌ. وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِجَوَازِ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا لِلنَّصِيحَةِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا.

৩. ফিকহুন নাওয়াযেল : ৩ : ৩৪৬

—পাত্র বা পাত্রী যে কেউ অপর পক্ষকে উক্ত চেকআপের রিপোর্ট পেশ করার কথা বলতে পারে।

—চেকআপের রিপোর্ট একান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো যাবে না।

—অপ্রয়োজনীয় টেস্ট বা চেকআপ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেবল রক্তবাহী বা এরকম অন্য কোনো জটিল রোগের ক্ষেত্রেই চেকআপ করা হবে। সৌদি আরবে কেবল থ্যালাসেমিয়া ও এইডসের পরীক্ষা করা হয়। এর অধিক নয়। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির পূর্বোক্ত রেজুলেশনেও এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

মোটকথা, বিষয়টি স্পর্শকাতর। ভারসাম্য রাখতে হবে। কেউ যেন কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩. ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক সামর্থ্য

আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে সমতা বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে নগদ আদায়যোগ্য মোহর এবং খোরপোশ দিতে সক্ষম ব্যক্তি ধনী পরিবারের কুফূ সাব্যস্ত হবে।[১]

তবে যুগের পরিবর্তনে ফুকাহায়ে কেরাম শরীয়াহ্‌র আলোকে এক্ষেত্রে আরো সহজ সমাধান দিয়েছেন। আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন, সামজিকভাবে প্রচলিত আদায়যোগ্য পরিমাণ মোহর এবং এক মাসের খোরপোশ আর নির্দিষ্ট কোনো পেশার মানুষ হলে প্রতিদিনের খরচ দেওয়ার সামর্থ্য থাকায় কুফূ বিবেচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাব্যস্ত হবে।[২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. আল্লামা যাইলাঈ রহ.-এর বরাতে বলেন, মোহর প্রদানে অক্ষমতা সত্ত্বেও শুধু খোরপোশ প্রদানের সক্ষমতা কুফূ হিসেবে যথেষ্ট হবে।[৩]

---

১. বাদায়েউস সানায়ে : ২/৩১৯, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)–

والمعتبر فيه القدرة على مهر مثلها، والنفقة، ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها، ونفقتها يكون كفئا لها، وإن كان لا يساويها في المال، هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد في ظاهر الروايات.

২. আদ্দুররুল মুখতার : পৃ. ১৮৭, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)–

(ومالا) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف، وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تطيق الجماع.

৩. রদ্দুল মুহতার, ৩ : ৯০, কিতাবুন নিকাহ্, বাবুল কাফাআহ (দারুল ফিকর, বৈরুত)–

قال الزيلعي: وقيل يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل.

এক্ষেত্রে ইমাম আবু বকর ইসকাফ রহ. বলেন, মোহর এবং খোরপোশ প্রদানের সক্ষমতার পাশাপাশি এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, পাত্র-পাত্রী উভয়ের জীবন যাপনের মান ও অর্থনৈতিক স্তরের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান না হওয়া।[১]

বর্তমান সময়ে বিয়েশাদীতে অর্থনৈতিক অবস্থা যেই গুরুত্বের সাথে দেখা হয় এবং অধিকাংশ সময় এ বিষয়টি দাম্পত্য জীবনে তিক্ততা, হীনম্মন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা তৈরির মাধ্যম হয়ে যায়। তাই অর্থনৈতিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যবধান হলে পাত্রী ও তার অভিভাবককে আকদের পূর্বে বাস্তবতা থেকে একটু বাড়িয়ে পাত্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, তবুও এটা কুফু হিসাবে ধর্তব্য হওয়া উচিত।[২]

মূল কথা হলো, বিবাহের জন্য বর্তমানে মৌলিকভাবে আর্থিক সামর্থ্য থাকাই যথেষ্ট। তা হলো, মোহরানা পরিশোধ করতে পারা ও মৌলিক খরচ যোগান দেওয়ার মোটামুটি সামর্থ্য থাকা।

বিবাহ করলে দরিদ্র হয়ে যাব বা আরো মোটা অঙ্কের সেলারি প্রয়োজন, ব্যাংক ব্যালেন্স আরো হোক; তারপর বিবাহ করব, এসব চিন্তা ইসলামী চিন্তা নয়। স্রেফ শয়তানের প্রতারণা।

৪. বিবাহের সহীহ নিয়ত

এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহের নিয়ত এভাবে করা যে, 'স্বভাবজাত কামচাহিদা বৈধভাবে পূরণের জন্য নবীজীর সুন্নত আদায়ের উদ্দেশ্যে, বিবাহ করছি।'[৩]

যেসব নিয়ত করা যাবে না—

—বিদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় বিবাহ করা।

—শ্বশুর বিয়ের পর বিদেশ নিয়ে যাবে, তাই বিবাহ করা।

—মেয়ের সম্পত্তি লাভ।

—ঢাকা শহরে ছেলের নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, তাই বিবাহ করা। ইত্যাদি মন্দ নিয়ত করা যাবে না।

---

১. আলবাহরুর রায়েক : ৩/২৩৩, (মাকতাবায়ে রশীদীয়া, পাকিস্তান)–

وأما الخامس فالمال، أطلقه فأفاد أنه لا بد من التساوي فيه وهو قول أبي بكر الإسكاف، قال في النوازل عنه: إذا كان للرجل عشرة آلاف درهم يريد أن يتزوج امرأة، لها مائة ألف وأخوها لا يرضى بذلك قال: لأخيها أن يمنعها من ذلك ولا يكون كفؤا وجعله في المجتبى قول أبي حنيفة، وقيده في الهداية بأن يكون مالكا للمهر والنفقة، وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية، حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه، والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله؛ لأن ما وراءه مؤجل عرفا.

২. জাদীদ ফিক্হী মাসায়েল : ৪/১২৩, (কুতুবখানায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ)

৩. আল জাওহারাতুন নাইয়্যিরা : ১/৪৩১; রদ্দুল মুহতার : ৪/৫৭, ৬৫, ৬৬

তবে বিবাহের ক্ষেত্রে এসব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ রাখতে অসুবিধা নেই। একটি কথা মনে রাখতে হবে, জানালা খুলব আযান শোনার জন্য, বাতাস খাওয়ার জন্য নয়। এ নিয়তের কারণে বাতাস আসা বন্ধ হবে না; বরং সওয়াব লাভ হবে।

৫. বিবাহ বিষয়ক পড়াশোনা

প্রতিটি কাজের শুরুতে পড়াশোনা করতে হয়। বিবাহ হলো মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুতরাং বিবাহের আগে এ বিষয়ে পড়াশোনা ও পরামর্শ গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন। বিবাহের পর একজন ব্যক্তির সাথে একাধিক মানুষের হক জড়িত হয়। স্ত্রী-স্বামীর হক, সন্তানের হক ইত্যাদি।

এর ওপর আছে বিবাহপরবর্তী পিতা-মাতা ও স্ত্রীর মাঝে ভারসাম্য তৈরি করার মতো নাজুক বিষয়। বিবাহের আগে এগুলো কিছুই ছিল না। বিবাহপরবর্তী এসব গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। এসব নাযুক বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেই ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেছেন, قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ 'যে বিবাহ করল, সে যেন সমুদ্রে যাত্রা শুরু করল।'[১]

অর্থাৎ বিবাহ করা মানে সমুদ্রে যাত্রা করা। যেখানে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি রয়েছে। বৈবাহিক জীবনটাও এমন যে, এখানে প্রচুর সবর ও ধৈর্যধারণ করতে হয়, একাধিক মানুষের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে হয়। সবার প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। মা ও স্ত্রীর মাঝে ব্যালেন্স করতে হয়। এগুলো এতটাই জটিল যে, পর্যাপ্ত পড়াশোনার পরও ধাক্কা খেতে হয়। আর পড়াশোনা না হলে তো কথাই নেই।

সহীহ হাদীসের সেই বাণী আমরা সকলেই জানি, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ প্রতিটি নর-নারীর ওপর ফরয পরিমাণ জ্ঞান অন্বেষণ করা আবশ্যক।'[২] উক্ত হাদীসের আবেদন এটিই যে, জীবনের যে-কোনো পর্বে অবতরণের আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ্ জেনে নেওয়া।

পিতা-মাতার দায়িত্ব

পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের উচিত বিয়ের আগেই ছেলে-মেয়েকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা। নসীহত করা। এ বিষয়ক ভালো কিছু বই পড়তে দেওয়া। বিজ্ঞ আলেমের কাছে নিয়ে নসীহত করানো। ছেলেকে স্ত্রীর হক শেখানো। মেয়েকে স্বামীর হকসমূহ শেখানো। স্বামীর সাথে চলাফেরার আদব-কায়দা, সদ্ব্যবহারের নীতিমালা, শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আচরণবিধি ইত্যাদি ভালো করে শেখানো। মনে রাখতে হবে, বিয়ের আগে মেয়েকে শুধু রান্নাবান্না শেখালেই হবে

---

১. মাজমূআয়ে রাসায়েলে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. ২/৭৪৫

২. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪

না; বরং রান্নার আগুন থেকে যেন সংসারে আগুন না লাগে সেসব, নিয়ম-নীতিও শেখাতে হবে। পিতা-মাতা তাদের দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সন্তানকে প্রতিটি বিষয় যত্নের সাথে শেখাবেন।

ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন, এটি পিতা-মাতার ওপর সন্তানের হকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পিতা-মাতা এ ব্যাপারে একটু সচেতন হলে বহু সংসার ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

সাহাবায়ে কেরামের যামানায় এ রীতি ছিল যে, বিয়ের আগে মেয়েকে বিশেষ নসীহত করা হতো। স্বামীর হক আদায় ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার নসীহত করা হতো। নসীহতের জন্য কখনো জ্ঞানী ও শ্রদ্ধাভাজন অভিজ্ঞ কোনো নারীর কাছেও নিয়ে যাওয়া হতো। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু আছার উল্লেখ করা হলো,

«كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ، فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا، وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ».

অর্থ : উম্মে হুমাইদ রহ. বলেন, মদীনার নারীদের রীতি ছিল, পাত্রীকে পাত্রের নিকট তুলে দেওয়ার আগে তাঁরা পাত্রীকে নিয়ে আম্মাজান আয়েশা রা.-এর নিকট যেত। আম্মাজান আয়েশা রা. পাত্রীর মাথায় হাত রেখে তার ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য দুআ করতেন। আর সংসার জীবনে তাকওয়া অবলম্বন ও স্বামীর হক আদায়ের আদেশ করতেন।[১]

«عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أنه كَانَ إِذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ، خَلَا بِهَا فَنَهَاهَا عَنْ سَيِّئِ الأَخْلَاقِ وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا».

অর্থ : জা'দা ইবনে হুবাইরা রহ. যখন তাঁর কোনো মেয়েকে বিবাহ দিতেন, তখন তাকে একান্তে ডাকতেন। এরপর সংসার জীবনে তাকে মন্দ আচরণ থেকে নিষেধ করতেন। আর সর্বোত্তম ব্যবহারের আদেশ করতেন।[২]

ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন, 'প্রাচীন আরবের এক বিজ্ঞ নারী আসমা বিনতে খারিজা আলফাযারী নিজ কন্যাকে বাসর ঘরে তুলে দেওয়ার আগে নসীহত করতে গিয়ে বললেন,

আমার প্রিয় আদরের দুলালী! আজ যে বিষয়ে তোমাকে নসীহত করব, এ বিষয়ে তোমার মাতাই অধিক উপযুক্ত ও হকদার ছিলেন। তবে তিনি যেহেতু জীবিত নেই, তাই আজ আমিই তোমাকে নসীহত করার অধিক হকদার। সুতরাং আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১৭৪১৬
২. প্রাগুক্ত : ১৭৪৩১

ভালো করে দেখো, এতদিন তুমি যে ঘরে বেড়ে উঠেছ, আজ সেখান থেকে তুমি চলে যাচ্ছ। এমন এক নতুন শয্যায় যাচ্ছ, যে সম্পর্কে তুমি অবগত নও। এমন এক সঙ্গীর নিকট যাচ্ছ, যাকে তুমি পূর্ব থেকে চিনো না। জানো না। সুতরাং তুমি তার জন্য আনুগত্যের জমি হয়ে যাও, সে তোমার জন্য সম্মানের আসমান হয়ে যাবে। তুমি তার জন্য বিছানা হয়ে যাও, সে তোমার জন্য খুঁটি হবে। তুমি তার দাসী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হবে।

তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার নিকট অধিক কিছু দাবি করবে না, তাহলে সে রাগ করবে। তাকে শয্যা প্রদান থেকে অধিক দূরে থাকবে না, নতুবা সে তোমায় ভুলে যাবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে, তুমিও তার নিকটবর্তী হবে। তার নাক, কান ও চোখের দিকে নযর রাখবে।

সে যেন তোমার কাছ থেকে সুঘ্রাণ ছাড়া অন্য কোনো ঘ্রাণ না পায়। সে যখন শুনবে, তখন যেন তোমার থেকে ভালো কথা শুনে। যখন সে তোমাকে দেখবে, তখন যেন সুন্দর কিছু দেখে।'[১]

অভিভাবকরা এ বিষয়ে অবহেলা করলে কিংবা তাদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে মেয়েরা নিজ উদ্যোগে তা জেনে নেবে। বিজ্ঞ কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করবে। নির্ভরযোগ্য বই পড়বে। যেভাবেই হোক জানতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের যামানায় নারীরা বিয়ের আগে স্বামীর হুকুক সম্পর্কে জেনে নিতেন। কখনো এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জিজ্ঞাসা করতেন ।

«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاكِ قَالَ : قَالَتْ : لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا... ».

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, একদিন এক লোক তার মেয়েকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলো। লোকটি তার মেয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল, সে বিয়ে বসতে রাজি হচ্ছে না। নবীজী মেয়েটিকে বললেন, তোমার পিতার আনুগত্য করো। মেয়েটি বলল, পিতার কথামতো বিয়েতে আমি রাজি হবো না, যতক্ষণ না আপনি আমাকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক সম্বন্ধে সংবাদ না দেবেন। এরপর নবীজী তাকে এ বিষয়ে জানালেন।[২,৩]

---

১. ইয়াইয়াউ উলুমিদ্দিন, (ইতহাফসহ) ৫/৪০৫-৪০৬
২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১৭৪০৭
৩. এই হাদীসের হুকুম সম্পর্কে আল্লামা মুনযিরী রহ. আততারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/৫৪-এ বলেন,

رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون.

এসব বিষয় যেমন পাত্রীর জন্য প্রযোজ্য, তেমনি পাত্রের জন্যও। পাত্রও স্ত্রীর অধিকার ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে তবেই বিবাহের পিড়িতে বসবে।

তাছাড়া এর পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর একান্ত নির্জনবাস, পাক-পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ক শরীয়াহ্ মাসআলা-মাসায়েলও জেনে নেওয়া আবশ্যক।

মোটকথা, উক্ত ৫টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহে করতে ইচ্ছুক পাত্র/পাত্রীর জন্য উক্ত ৫টি বিষয় ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

বিবাহপূর্ব প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ

এ ধাপটি বিবাহপূর্ব প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ। এ ধাপের বিষয়গুলো বিবাহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় রয়েছে। এক নজরে তা হলো—

১. অভিভাবকদের দায়িত্ব
২. সমকক্ষতা নির্বাচন
৩. পাত্রী নির্বাচনে যা লক্ষণীয়
৪. পাত্র নির্বাচনে যা লক্ষণীয়
৫. বিবাহের পয়গাম পৌঁছানো
৬. পাত্র/পাত্রী দেখা
৭. অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা
৮. ইস্তেখারা করা

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো—

১. অভিভাবকের দায়িত্ব

ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ছেলে-মেয়েরাও এক্ষেত্রে নিজ নিজ অভিভাবকদের ওপর আস্থা রাখবে। তাদের পরামর্শে বিবাহ করবে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের অভিভাবকদের ওপর দেওয়া হয়েছে। মেয়ে নিজ থেকে তার পছন্দমতো বিয়ে করবে না। বরং তার অভিভাবক তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। এটি তাদের দায়িত্ব।

কুরআনুল কারীমে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাদের অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে, ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ﴾ 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী, বিধবা হোক বা বিপত্নীক) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো।'[১]

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অর্থে লিখেছেন, 'স্বাধীন নারী-পুরুষ অবিবাহিত হোক অথবা বিধবা, বিপত্নীক অথবা তালাকপ্রাপ্তা, যারা বিবাহের হক আদায়ের সামর্থ্য রাখে তাদের দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা করো। এমনিভাবে তোমাদের গোলাম-বাঁদি যারা বিবাহের হক আদায়ের সামর্থ্য রাখে তাদেরও বিবাহের ব্যবস্থা করো। তাদের বিবাহের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও (কেবল নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ওদেরকে) অবিবাহিত রাখা থেকে বিরত থাকো।'[২]

যথাসময়ে বিবাহ না করার কুফল সমাজে অবশ্যম্ভাবী। সচেতন ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন। এতৎসত্ত্বেও বর্তমান সমাজের অনেক অভিভাবকই এ ব্যাপারে চরম উদাসীন। স্মরণ রাখা উচিত, উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পাওয়া সত্ত্বেও অকারণে বিবাহে বিলম্ব করলে, আর এ কারণে ছেলে-মেয়ে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হলে এর দায় পিতা-মাতার ওপর আপতিত হবে।

অতএব মেয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব হলো,

প্রথমত মেয়ের জন্য উপযোগী পাত্র বের করা। যে সৎ হবে, নেককার হবে, আমানতদার হবে। উপস্থিত আর্থিক সামর্থ্য থাকবে। ব্যস, এর বেশি কিছু দেখতে গিয়ে বিয়ে বিলম্ব করবে না। নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মেয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে না। পাত্র থেকে এমন কিছু তলব করবে না, যা তার সামর্থ্যের বাইরে।[৩]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».

---

১. সূরা নূর, আয়াত : ৩২
২. বয়ানুল কুরআন : ৩/২৫২
৩. ফতোয়ায়ে লাজনাতুদ দায়িমা : ১৮/৪৬-৪৭

অর্থ : তোমাদের নিকট যারা বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাদের দীনদারী ও চরিত্রের ব্যাপারে যদি তোমরা সন্তুষ্ট থাকো তাহলে সত্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও। তা না করে যদি আরো অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আশায় বিবাহ বিলম্ব করো তাহলে জেনে রাখো, তোমরা তখন ভূ-পৃষ্ঠে বিশাল ফেতনা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হবে।[1]

দ্বিতীয়ত, মেয়ের অমতে তাকে বিয়ে দিতে বাধ্য করবে না। কারণ, দাম্পত্য জীবনের ঝক্কি-ঝামেলা তাকেই সামলাতে হবে। অভিভাবককে নয়। তাই তার মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

«لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ».

অর্থ : 'বিধবা স্ত্রীলোকের পরামর্শ ছাড়া তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না।'[2]

একই কথা ছেলের ক্ষেত্রেও। ছেলেকে তার অমতে বিয়ে করতে বাধ্য করবে না।

২. সমকক্ষতা নির্বাচন

বিবাহ নিছক একটি চুক্তি নয়। এটি একটি দীর্ঘজীবনের সূচনা। যাকে বিয়ে করবেন (ছেলে/মেয়ে) তাকে নিয়ে পাড়ি দিতে হবে বহু পথ। সুতরাং জীবন-যুদ্ধের সহযোদ্ধা যোগ্য হওয়া একান্ত জরুরি। তাছাড়া বিবাহের সাথে অভিভাবকদের মান-সম্মানও জড়িত। নির্বাচন যেন এমন না হয় যাতে অভিভাবকগণ সমাজে লজ্জিত হন। কারণ তা হলে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দাম্পত্যসম্পর্ক স্থায়ী হবে। অটুট হবে। এই স্থায়িত্ব ধরে রাখতেই 'সমকক্ষতা নির্বাচনের' কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'সমকক্ষতার' মানদণ্ড কী? এর সীমা-পরিসীমা কতটুকু?

এক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা হলো—

মুসলিম নর-নারী যে কেউ একজন অপরজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। পাত্র-পাত্রী রাজি থাকলে এখানে শরয়ী অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো কিছু বলার অধিকার নেই। এখন জানার বিষয় হলো, শরয়ী অভিভাবক কারা? তাদের অধিকার কতটুকু?

শরয়ী অভিভাবক বা সামাজিক অভিভাবক এক নয়। বিবাহের ক্ষেত্রে শরয়ী অভিভাবক হলো যথাক্রমে—

পিতা, দাদা, ভাই, চাচা, মা, দাদি, মেয়ে, বোন, মামা, খালা ইত্যাদি।

---

১. জামে তিরমিযী : ১০৮৪। এই হাদীসের হুকুম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, هذا حديث حسن غريب

২. সহীহ মুসলিম : ১৪১৯

সুতরাং মেয়ের পিতা-মাতা থাকলে শরয়ী অভিভাবক কেবল পিতা। মা-ভাই থাকলে কেবল ভাই। মেয়ে ও বোন থাকলে কেবল মেয়ে। শুধু দুই বোন থাকলে অপর বোন।

তবে শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে শরয়ী অভিভাবক হওয়ার একটি অন্যতম যোগ্যতা হলো মেয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।[১]

তাদের অধিকারের ক্ষেত্র হলো কেবল মেয়ে। অর্থাৎ মেয়ে যদি এমন ছেলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, যে তাদের সমকক্ষ নয়; কেবল তখন তাদের অধিকার সৃষ্টি হবে।[২] এর বিপরীত ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ মেয়ে ছেলের উপযোগী কি না তা ধর্তব্য নয়। মেয়ে যদি ছেলের সমকক্ষ না হয়, তাহলে এতে কিছু আসে-যায় না। আমাদের সমাজে একেও সমকক্ষের বিচারে গণনা করা হয়। এটি ঠিক নয়।

তাদের অধিকার কেবল এতটুকু যে, যদি প্রমাণিত হয় পাত্র অসমকক্ষ, তাহলে তারা আদালতে এই বিবাহ ভাঙ্গার আবেদন করতে পারে। নিজেরা বিবাহ ভাঙ্গতে পারবে না।

'সমকক্ষ' বলতে বোঝানো হয়, পাত্র বিভিন্ন বিবেচনায় পাত্রীর সমপর্যায়ের হওয়া। অর্থাৎ ক. ধর্ম; খ. চরিত্র ও দীনদারী; গ. অর্থ-সম্পদ; ঘ. বংশমর্যাদা; ঙ. পেশা; চ. শিক্ষাদীক্ষায় পাত্রের অবস্থান মেয়ের তুলনায় নিম্নমানের না হওয়া।[৩] অর্থ সম্পদে কেবল এতটুকু হলেই হবে যে, ভারসাম্যপূর্ণ মোহরানা পরিশোধ করতে পারে ও মধ্যম ধরনের খোরপোশ দিতে পারে।[৪]

«تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

অর্থ : 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দিবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৫]

---

১. বিনায়া শরহে হিদায়া : ৬/১১৫-১১৬ (মাকতাবায়ে হক্কানিয়া, মুলতান); বাদায়েউস সানায়ে : ২/২৫০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা)–

فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم يتقدم الأقرب منهم على الأبعد، وعند عدم العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم؛ الأقرب منهم يتقدم على الأبعد، وإنما اعتبر الأقرب فالأقرب في الولاية؛ لأن هذه ولاية نظر، وتصرف الأقرب أنظر في حق المولى عليه؛ لأنه أشفق فكان هو أولى من الأبعد.

২. দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম (টীকাসহ), ১/৩৩৫

৩. আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল্ল, ৬/১৩০

৪. বাদায়ে সানায়ে : ২/৩১৯, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

৫. সহীহ বুখারী : ৫০৯০। بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, পাত্রী নির্বাচনে মৌলিকভাবে ৪টি বিষয় খেয়াল রাখা হবে। যথা : পাত্রীর সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারী। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখে পাত্রী নির্বাচন করা হবে। মৌলিকভাবে পাত্রীর সম্পদ, বংশ ও সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করতে সমস্যা নেই। তবে এগুলোর সাথে দীনদারীর সংঘর্ষ হলে তখন দীনদারীকে প্রাধান্য দিবে। যেমন, কেউ বেশ সুন্দরী তবে দীনদারী কম, অপরদিকে আরেকজন কম সুন্দরী তবে দীনদারী সন্তোষজনক। তাহলে হাদীসের নির্দেশনা হলো দীনদার নারীকে প্রাধান্য দেওয়া। দীনদারী বাদ দিয়ে অন্যান্য গুণকে প্রাধান্য না দেওয়া। যদিও ওই নারী শ্যামলা রঙের হয় বা কালো হয়।

আরেক হাদীসে এসেছে, «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

অর্থ : 'দুনিয়া কেবল ভোগ্যসামগ্রী। আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো নেক ও সৎ নারী।'[১]

সুতরাং দীনদার ও নেককার পাত্রী খুঁজতে হবে। যদি এমন হয়, মেয়ে সুন্দরের পাশাপাশি দীনদারও। তাহলে দীনদারীকে প্রাধান্য দেওয়ার নিয়ত করে নেবে। এতে হাদীসের ওপর আমল হয়ে যাবে।

৩. পাত্রী নির্বাচনে যা লক্ষণীয়

ক. অধিক সন্তানধারী বংশের হওয়া

হাদীস শরীফে এসেছে,

«تَزَوَّجُوا الودودَ الولودَ فإنِّي مكاثِرٌ بِكُمُ الأنبياءَ يومَ القيامَةِ».

'তোমরা অধিক সন্তানসম্ভবা ও প্রেমময়ী মেয়ে দেখে বিয়ে করো। কারণ, আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের ওপর আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব।'[২]

আরেক হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি নবীজীকে এসে বলল,

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».

---

১. সহীহ্ মুসলিম : ১৪৬৭, দারু ইহয়াইত তুরাস, বৈরুত, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। ২/১০৯০
২. মুসনাদে আহমাদ : ১২৬১৩।

অর্থ : 'আমি একজন মহিলাকে খুঁজে পেয়েছি। সে ভালো বংশের ও সুন্দরী। তবে সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। আমি কি তাকে বিবাহ করতে পারব?

নবীজী জবাবে বললেন, না। তাকে বিয়ে করবে না। লোকটি দ্বিতীয়বার আবার একই আবেদন নিয়ে এলো। নবীজী পুনরায় একই উত্তর দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার আবার এলো। নবীজী এবারও সেই প্রথম উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলেন। আর সাথে বললেন 'তোমরা অধিক সন্তানসম্ভবা ও প্রেমময়ী নারী বিয়ে করো। আমি আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করবো।'[১]

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ সন্তান কম নেওয়াটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অধিক সন্তানকে আমরা মুসিবত মনে করি।

অথচ হাদীসে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য সদাকায়ে জারিয়া হিসাবে যে কয়টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে 'নেক সন্তান' অন্যতম।[২] সন্তান ধারণের আগেই যদি আমরা নিয়ত সহীহ করে নিই তাহলে সন্তানের লালন-পালন ও প্রাসঙ্গিক অনেক কিছুই সহনীয় হয়ে যায়। এটিও মনে রাখা চাই, সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে বাবা-মায়ের যে কষ্ট হয় এর প্রত্যেকটিই নেক কাজে পরিণত হয়। প্রয়োজন শুধু নিয়ত সহীহ করে নেওয়া। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের চিন্তার পুনর্গঠন আবশ্যক।

খ. প্রেমময়ী হওয়া

যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়া, যাকে বিবাহ করবে সে প্রেমময়ী, মিশুক, সুরুচির অধিকারী কি না। স্ত্রী এমন হবে যে সম্পদ নয়; বরং স্বামীর প্রতি ভালোবাসা রাখবে।

গ. কুমারী হওয়া

পাত্রী কুমারী হওয়া। হযরত জাবির রা. বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন একসাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

—তুমি কি বিবাহ করেছ?

—হাঁ, বিবাহ করেছি।

—কুমারী না অকুমারী মেয়ে?

—অকুমারী মেয়ে।

—যদি কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে, সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা করতো। তুমিও তার সাথে হাসি-তামাশা করতে। সে তোমার সাথে রসিকতা করতো। তুমিও তার সাথে রসিকতা করতে।

---

১. সুনানে আবু দাউদ : ২০৫০
২. মুসনাদে আহমদ : ৮৮৪৪

—আমার পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর কয়েকজন অবিবাহিতা কন্যাসন্তান রেখে মারা গেছেন। সেই কন্যাসন্তানদের স্বার্থে আমি তাদেরই মতো কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে চাইনি। তাই অকুমারী এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি, যে তাদের দেখভাল করবে, তাদের সঠিক তরবিয়ত প্রদান করবে।

—আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।[১]

তবে অকুমারী মেয়ে বিয়ে করার বিশেষ প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট দেখা দিলে সেটাই করবে। যেমনটি উক্ত ঘটনায় উল্লেখ হয়েছে।

ঘ. সুন্দর, ভালো বংশের ও শিক্ষিতা (ধর্মীয় জ্ঞানসহ) থাকা

এই গুণগুলো থাকলে গাইরে মাহরাম নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ».

অর্থ : 'তোমাদের মাঝে যারা বিয়ে করতে সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ তা দৃষ্টিকে অবনত করে ও লজ্জাস্থানকে সুরক্ষা দেয়।'

মোটকথা, পাত্রী নির্বাচনে যা লক্ষ রাখবে—

ক. দীনদার হওয়া।
খ. অধিক সন্তানসম্ভবা হওয়া।
গ. প্রেমময়ী হওয়া।
ঘ. কুমারী হওয়া।
ঙ. সুন্দর, ভালো বংশের ও শিক্ষিতা হওয়া।

এগুলোকে দুভাগেও ভাগ করা যায়। যথা : বাহ্যিক সৌন্দর্য (Sensory beauty)। যথা : সুন্দর, বাহ্যিক দোষমুক্ত ও কুমারী হওয়া। আরেক হলো অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য (Moral beauty)। যথা-দীনদার ও নেককার হওয়া।

মনে রাখতে হবে, উক্ত পাঁচটি গুণের মাঝে প্রথম গুণটিই প্রধান লক্ষণীয়। তথা দীনদার ও নেককার হওয়া। সব ছাড় দেওয়া যাবে, তবে এ বিষয়ে ছাড় দেওয়া যাবে না।

---

১. সহীহ বুখারী : ৫৩৬৭; সুনানে কুবরা, নাসাঈ : ৮৯৪১

৪. পাত্র নির্বাচনে যা লক্ষণীয়

ক. দীনদার হওয়া

«وَعَن الْحَسَن أَتَاهُ رجل، فَقَالَ: إِن لي بِنْتا أحبها وَقد خطبهَا غيرُ وَاحِد، فَمن تُشِير عَليّ أَن أزوجها؟ قَالَ: زوّجها رجلا يَتَّقِي الله، فَإِنَّهُ إِن أَحبها أكرمها، وَإِن أبغضها لم يظلمها».

অর্থ : বিখ্যাত তাবেঈ হাসান বসরী রহ.-কে জনৈক পিতা জিজ্ঞাসা করল, আমার একটা মেয়ে আছে। কয়েকজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। সুতরাং, কার কাছে তাকে তুলে দেবো? জবাবে তিনি বললেন- 'তুমি তাকে এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দাও যে আল্লাহকে ভয় করে তথা খোদাভীরু। কারণ সে খোদাভীরু হলে এবং স্ত্রীকে ভালোবাসলে তাকে সম্মান করবে। কষ্ট দেবে না। আর যদি স্ত্রীকে তার ভালো না লাগে তাহলে তার প্রতি জুলুম করবে না।'[১]

খ. চরিত্রবান হওয়া

সহীহ হাদীসে এসেছে,

«إذا أتاكُمْ مَن تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ ودِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إنْ لا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسادٌ عَرِيضٌ».

অর্থ : 'তোমাদের কাছে যখন এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন নিজ মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিতে বিলম্ব করবে না। যদি এমনটি না করো তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।'[২]

পাত্র 'দীনদার' ও 'চরিত্রবান' হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। যদি সে দেখতে কিছুটা অসুন্দর হয়, নিম্নবংশের হয়; কিন্তু দীনদার ও চরিত্রবান হয় তাহলে তাকেই প্রাধান্য দিবে।

দেখুন, হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রা.-কে মুআবিয়া রা., আবু জাহাম রা. উভয়ে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ফাতেমা রা. যখন এ ব্যাপারে নবীজীর কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন নবীজী ফাতেমা রা.-কে উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পরামর্শ দিলেন। অথচ উসামা রা. ফাতেমা রা.-এর সমকক্ষ ছিলেন না। ফাতেমা রা. ছিলেন কুরাইশ বংশের। আর উসামা রা. ছিলেন সাধারণ বংশের। তাছাড়া

---

১. উয়ূনুল আখইয়ার, ১১/৪। শরহুস সুন্নাহ, ইমাম বাগাভী রহ. ৯/১১, (আলমাকতাবুল ইসলামী, দামেশক)

২. জামে তিরমিযী : ১০৮৪। এই হাদীসের হুকুম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, هذاحديث حسن غريب

তিনি কালোও ছিলেন। তদুপরি নবীজী তার জ্ঞান, দীনদারী ও চরিত্র দেখে তাকেই বিয়ে করতে পরামর্শ দিলেন। বোঝা গেল, দীনদারী ও সৎ চরিত্রের ওপর কোনো গুণ নেই।[১]

গ. মোটামুটি আর্থিক সামর্থ্য থাকা

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.। তাঁর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তাঁর কাছে মুআবিয়া রা. ও আবু জাহাম রা. বিয়ের প্রস্তাব দেন। ফাতেমা রা. এ ব্যাপারে নবীজীর কাছে পরামর্শ চাইলেন, কার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করবেন। নবীজী সব শুনে বললেন,

«أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ».

অর্থ : আবু জাহাম তো তার লাঠি কখনো কাঁধ থেকে নামায় না। আর মুআবিয়া তো অসচ্ছল।[২]

উক্ত হাদীসে নবীজী মুআবিয়া রা.-এর ব্যাপারে বললেন, সংসার চালানোর মতো তাঁর পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। এ থেকে বোঝা গেল, যে পাত্র বিবাহের প্রস্তাব করবে তার আর্থিক অবস্থার খোঁজ নিতে সমস্যা নেই। সে সংসারের ব্যয় বহন করতে পারবে কি না তা খোঁজ নিবে। কারণ অর্থ সম্পদ না থাকলে সহাবস্থান কষ্টকর হবে। তবে এক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখতে হবে। অঢেল সম্পদের মালিক হতে হবে এমন শর্তারোপ না করা। মোটামুটি চলনসই হলেই যথেষ্ট। উপস্থিত দরিদ্রতা না থাকলেই হলো। কারণ বিবাহটাই রিযিক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ঘ. স্ত্রীর প্রতি প্রেমময় হওয়া

পাত্র খোঁজার সময় এ গুণটিও লক্ষণীয়। তার মেজায তবিয়ত কেমন। রাগী নাকি ভদ্র। পরিবারের সদ্যসের প্রতি তার আচরণ কেমন। ছোটদের সাথে তার আচরণ কেমন। এগুলোও যথাসম্ভব খোঁজ নিবে। ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-কে আবু জাহাম রা. বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফাতেমা রা. তাকে বিয়ে করবেন কি না এ ব্যাপারে নবীজীর নিকট পরামর্শ চাইলে নবীজী বললেন, «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ»

'আবু জাহাম তো তার লাঠি কখনো কাঁধ থেকে নামায় না।' অর্থাৎ সে কড়া মেজাযের অধিকারী। নারীদের প্রতি সহনশীল নয়। তাই নবীজী তাকে বিয়ে করতে সম্মতি দেননি।

এছাড়া পূর্বে পাত্রীর জন্য যেসব গুণাবলি বলা হয়েছে সেগুলো পাত্রের জন্যও প্রযোজ্য হবে। যেমন, সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকা, একটা পর্যায় পর্যন্ত সুন্দর থাকা, ভালো বংশের হওয়া ইত্যাদি।

১.তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ২/২০১

২. সহীহ মুসলিম : ১৪৮০, দারু ইহয়াইত তুরাস, বৈরুত, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। ২/১১১৪

মোটকথা, পাত্র নির্বাচনে যা লক্ষণীয়—

ক. পাত্র দীনদার হওয়া।

খ. চরিত্রবান হওয়া।

গ. মোটামুটি আর্থিক সামর্থ্য থাকা।

ঘ. স্ত্রীর প্রতি প্রেমময় হওয়া।

ঙ. এছাড়া আলোচিত অন্যান্য গুণ থাকা।

মনে রাখতে হবে এসবের মধ্যে প্রথম দুটিই মৌলিক গুণ, যা কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না।

৫. বিবাহের পয়গাম পৌঁছানো

বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব প্রদানের ক্ষেত্রে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল—বিবাহ-সংক্রান্ত নবীজীর নির্দেশনাসমূহ থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, বিবাহের প্রস্তাব পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার অভিভাবকদের প্রতি দেওয়া হবে। এরপর অভিভাবকগণ সেটা কল্যাণকর মনে করলে এবং মেয়ে সাবালিকা হলে তার সম্মতি নেবে।[১]

তবে মেয়ের অভিভাবকও প্রস্তাব করতে পারে। হযরত উমর রা. নিজ কন্যা হাফসা রা.-এর প্রস্তাব আবু বকর রা. ও উসমান রা.-কে দিয়েছিলেন।[২]

তবে ছেলে সরাসরি মেয়েকে প্রস্তাব দেবে না। এ কথা বলবে না, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বিয়ে করতে চাই। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? ইত্যাদি। কারণ এসবে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে।[৩]

---

১. মারেফুল হাদীস : ৭/৪৪৭

২. সহীহ বুখারী : ৫১২২

بَابُ عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيْرِ

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا.

ফতোয়া লাজনাতুদ দাইমা : ১৮/৪২

৩. ফতোয়া লাজনাতুদ দাইমা : ১৮/৮০

৬. পাত্র/পাত্রী দেখা

বিবাহটা একটি দীর্ঘ জীবনের সূচনা। তাই খুব ভেবেচিন্তে খোঁজ-খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সুতরাং যে নারীকে বিবাহ করার ইচ্ছা হবে, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে একবার দেখে নেবে, যেন পরবর্তীতে মনে কোনো আক্ষেপ না থাকে। হাদীসে এসেছে, এক লোক এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করল। নবীজী তাকে বললেন,

«فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

অর্থ : (যাও) তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারী মেয়েদের চোখে কিছু ত্রুটি থাকে।[১]

আরেক হাদীসে এসেছে,

«انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».

অর্থ : (বিবাহের আগে) পাত্রীকে দেখে নেবে। কেননা তা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মাঝে প্রীতি-ভালোবাসা অর্জনে স্থায়ী হবে।[২]

আরেক হাদীসে এসেছে, নবীজীকে এক নারী বিবাহের প্রস্তাব দিলে নবীজী তাকে একবার দেখলেন। (প্রাগুক্ত)

আরেক হাদীসে এসছে,

«عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ».

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করবে তখন সম্ভব হলে সে ওই মেয়েকে দেখে নেবে, যা তাকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করবে।[৩]

মোটকথা, এসব হাদীসে বিয়ের আগে পাত্রী দেখে নেওয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট। শরয়ী দৃষ্টিতে এটি মুস্তাহাব আমল। এ বিধান মেয়ের জন্যও প্রযোজ্য।

পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো–

- শুধু চেহারা, হাতের কব্জি ও পা দেখবে।
- নির্জনে দেখবে না। বরং সাথে মেয়ে বা ছেলের কোনো মাহরাম থাকবে।

---

১. সহীহ মুসলিম : ১৪২৪, দারু ইহয়াইত তুরাস, বৈরুত, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। ২/১০৪০

২. জামে তিরমিযী : ১০৮৭। وقال الترمذي: هذا حديث حسن

৩. সুনানে আবী দাউদ : ২০৮২। باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- দেখবে শুধু ছেলে বা অন্য কোনো নারী। ছেলের পিতা, ভাই বা অন্য কেউ দেখবে না।
- ছবি আদান-প্রদান করবে না। কারণ তা অন্যের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
- দেখার পর পছন্দ না হলে দোষ চর্চা করবে না।
- ছেলে সরাসরি হাতে স্পর্শ করবে না। মুসাফাহা করবে না।
- নির্ভরযোগ্য মহিলা দ্বারাও দেখার কাজ সম্পন্ন করা যাবে। অন্দরে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাত্রীকে দেখবে। তার কোনো ত্রুটি আছে কি না জানার চেষ্টা করবে।
- দেখার পর্বে এত আনুষ্ঠানিকতা করবে না যে, পাত্রীর পরিবারের ওপর তা বোঝা হয়ে যায়।
- দেখার পর ফোনে কথাবার্তা বলা যাবে না। বিবাহ ঠিক হলেও না।

৭. অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা

সালাফের যুগে এ রীতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, পাত্র/পাত্রী নির্বাচনে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ হয়েছে, ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. পাত্র নির্বাচনে নবীজীর সাথে পরামর্শ করেছেন। তদ্রূপ সাহাবীগণও বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের আগে পরামর্শ করে নিতেন। এটি সালাফের একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ ছিল। লক্ষণীয়, তাঁদের এ সংক্রান্ত পরামর্শে বৈষয়িক বিষয়ের পাশাপাশি তাকওয়া ও খোদাভীরুতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেত। তাঁদের পরামর্শটা ছিল মূলত শরয়ী পরামর্শ।

বর্তমানের দৃশ্য এরকম নয়। এখন তো নিজের মতো করে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করা হয়। এ ব্যাপারে শরীয়াহ্ পরামর্শ নেওয়া হয় না। যদি কেউ পরামর্শ নেয় তবে সেই পরামর্শের গণ্ডি কেবল বৈষয়িক বিষয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদের সুমতি দান করুন।

৮. ইস্তেখারা

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইস্তেখারা করে নেবে। বিবাহের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইস্তেখারা করার কথা হাদীসে এসেছে।[১]

---

১. আল আওসাত : ৮/২৩৩। (দারুল ফালাহ্, মিশর)–

ذكر الاستخارة عند خطبة المرأة والأمر بكتمان ذلك

٧١٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن معاوية قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني حيوة بن شريح: أن الوليد بن أبي الوليد أخبره: أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه، عن أبيه، عن جده أبي أيوب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللَّهُمَّ إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي - تسميها باسمها - في فلانة خيرا في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها، أو قال: اقدرها لي".

বিয়ের কার্ড ছাপানোর বিধান

মৌলিকভাবে লিখিত আকারে বিয়ের দাওয়াত দেওয়া বৈধ। তবে বর্তমানে বিয়ের কার্ড ছাপাতে গিয়ে যে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (যেমন, লোক দেখানোর জন্য অতিরিক্ত খরচ করে কার্ড বানানো ইত্যাদি) সংযুক্ত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা হয়, তা লক্ষ করলে ক্ষেত্রবিশেষ তা নাজায়েয মনে হতে পারে।[১]

বিয়ের পূর্বে হবু স্ত্রীর সাথে ফোনে কথা বলার বিধান

গায়রে মাহরামের সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা জায়েয নেই। কুরআনুল কারীমে এসেছে,

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

অর্থ : তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।[২]

সুতরাং বিয়ের মতামত বা অন্যকিছু জানার প্রয়োজন হলে মেয়ের অভিভাবকদের সাথে কথা বলবে। মেয়ের সাথে নয়।[৩]

এনগেইজমেন্ট হওয়ার পর হবু স্বামী ও শ্বশুরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা কি বৈধ?

এনগেইজমেন্ট একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র। এর মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হয় না। পাত্র স্বামী ও পাত্রী স্ত্রী হয় না। তাই নিয়মতান্ত্রিক বিয়ের আগ পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাত করা বৈধ নয়।[৪]

বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ের ছবি আদান-প্রদান করার বিধান

ছবি অঙ্কন করা, ছবি তুলে প্রিন্ট করা, ভাস্কর্য তৈরি করা সবই ইসলামে নিষিদ্ধ। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে ছবি তুলে প্রিন্ট করা বৈধ। যেমন- ন্যাশনাল আইডি কার্ড তৈরি, পাসপোর্ট তৈরির জন্য।

বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখার জন্য ছবি তোলা জায়েয নয়। কারণ ছবি তোলা ছাড়াই সরাসরি কনে দেখার মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া এতে নিম্নোক্ত সমস্যাও হতে পারে,

ক. প্রদানকৃত ছবিটি বিবাহকারীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। পরপুরুষের দৃষ্টিতেও চলে যেতে পারে। যা জায়েয নয়।

---

১. জামে তিরমিযী : ১/২০৭ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح । সূরা আনআম, আয়াত : ১৭১
সহীহ বুখারী : ৬৪৯৯ –
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.
বেহেশতী যেওর ৬/৪০। কিতাবুন নাওয়াযিল ৮:৫১১

২. সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২

৩. আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল ৫/৩৪। কিতাবুন নাওয়াযিল ৮/৪৫

৪. রাদ্দুল মুহতার : ৩/১১। ফাতাওয়া রাহীমিয়্যাহ ৮/১৫১। ফাতাওয়া ইবাদুর রহমান ৪/৩০২

খ. সরাসরি দেখার মাঝে বাস্তবতা উন্মোচিত হয়। যা ছবি দেখার মাঝে পাওয়া যায় না।[১]

কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারাম

পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিত ১৪ প্রকার নারীকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[২] যথা–

১. আপন মাতা ও বিমাতা বা সৎ-মা (পিতার স্ত্রী) এবং তার ঊর্ধ্বস্তরের মহিলাগণ। যেমন : নানি, দাদি।
২. স্বীয় ঔরসজাত কন্যা ও তার অধস্তরের কন্যাগণ। যেমন : কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা ইত্যাদি।
৩. সহোদরা ভগ্নি। এতে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনও অন্তর্ভুক্ত।
৪. ফুফু।
৫. খালা।
৬. ভাইয়ের মেয়ে-ভ্রাতুস্পুত্রী। অনুরূপ তাদের কন্যা ও তদনিম্ন কন্যাবর্গ।
৭. বোনের মেয়ে-ভাগনি। অনুরূপ তাদের কন্যা ও তদনিম্ন কন্যাবর্গ।
৮. দুধ মাতা এবং তার ঊর্ধ্বস্তরের মহিলাগণ।
৯. দুধ বোন এবং তার অধস্তরের মহিলাগণ। যথা : দুধ বোনের কন্যা, দুধ ভাইয়ের কন্যা ইত্যাদি।
১০. শাশুড়ি ও তার ঊর্ধ্বস্তরের মহিলাগণ। যথা : দাদি শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি ইত্যাদি।
১১. নিজের স্ত্রীর আগের গর্ভের সন্তান; যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে।
১২. ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী ।
১৩. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা।
১৪. অপরের স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে থাকা পর্যন্ত।(৩)

---

১. সহীহ বুখারিঃ ২/৮৮৫; জামে' তিরমিযী ১:২০১; ফাতাওয়া রাহীমিয়্যাহ ৮/১৫২; কিতাবুন নাওয়াযিল ৮/৪৭; ফিকহি মাকালাত ৪/৯১

২. সূরা নিসা ২৩-

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

৩. মাআরিফুল কুরআন : ২/৩৫৫; আহকামুল কুরআন : ২/১১৩; তাফসীরে মাযহারী : ২/২৬৫; হিদায়া : ২/৩০৭; ফতোয়া আলমগীরী : ১/৩৩৯; রদ্দুল মুহতার : ৪/১০৭

বিবাহ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিষয়

মসজিদে বিবাহের আকদ করা এবং খেজুর ছিটানোর হুকুম

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। তাই বিবাহের আকদ মসজিদে হওয়া মুস্তাহাব।[১] হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

«عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ».

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা বিবাহকে প্রচার করো এবং বিবাহ-চুক্তি মসজিদে সম্পন্ন করো![২]

বিয়ের আকদের পর খেজুর, বাদাম, মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করা জায়েয। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রহ. এবং প্রসিদ্ধ তাবেঈ শা'বী রহ. বিয়ের আকদের মজলিসে খেজুর বা মিষ্টান্ন জাতীয় জিনিস ছিটানোর অনুমতি দিতেন।[৩]

তবে বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানোকে আমাদের দেশে অনেকে সুন্নত মনে করে। সুন্নত মনে করে এই কাজ করা ঠিক নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খেজুর ছিটানোর বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত নয়।[৪]

---

১. আল বাহরুর রায়েক : ৩/১৪৩- وأشار المصنف بكونه سنة أو واجبا الى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عباده

২. সুনানে তিরমিযী : পৃ. ২৫৭ : : ১০৮৯, هذا حديث غريب حسن في هذا الباب

৩. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১১/৯৮-১০০। (তাহকীক- শায়খ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ)
في نثر اللوز والسكر في العرس. 21522- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنِّهابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلاَئِمِ. ٢١٥٢٤- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.

৪. আলমাউযূআত, ইবনুল জাওযী রহ. : ২/২৬৫-
بَاب نثار الْعرس: فِيهِ عَنْ مُعَاذ وَأنس.
فَأما حَدِيث مُعَاذ فَلهُ طَرِيقَانِ:..... وَأما حَدِيث أَنَس ...... عَنْ أَنَس " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَيْنَ شَاهِدُكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شَاهِدُنَا؟ قَالَ: الدُّفُّ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ، ثُمَّ جَاءُوا بِأَطْبَاقِهِمْ فَنَثَرُوا، فَهَابَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَنَاوَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ، مَا لَكُمْ لَا تَتَنَاوَلُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النُّهِيبَةِ فِي الْعَسَاكِرِ وَأَمَّا هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فَلا." هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذ فَفِي طَرِيقه الأَوَّل بِشر بْن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ. قَالَ الْعُقَيْلِيّ: لَا يُتَابع على هَذَا الحَدِيث. وَقَدْ روى عَنِ الأَوْزَاعِيّ: أَحَادِيث مَوْضُوعَة لَا يُتَابع عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هُوَ عِنْدِي مِمَّن يضع الحَدِيث على الثقاة وَلِذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة. وَأما طَرِيقه الثَّانِي فَإِن حازما ولمازة مَجْهُولَانِ. وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ خَالِد بْن إِسْمَاعِيلَ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يضع الحَدِيث على ثقاة الْمُسلمين. وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.

উল্লেখ্য, বিবাহের মজলিসে খেজুর হাতে হাতে দেওয়া যেতে পারে আবার ছিটিয়েও দেওয়া যেতে পারে। তবে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, বর্তমান যামানায় হাতে বণ্টন করাই উত্তম। বিশেষত মসজিদে বিয়ে হলে খেজুর ছিটিয়ে না দেওয়াই উচিত।[১] কেননা এতে ক্ষেত্রবিশেষে হৈ-চৈ ও কাড়াকাড়ি করার কারণে মসজিদের আদব ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মসজিদ ময়লাও হয়ে যেতে পারে।[২]

মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন

পাত্র-পাত্রী দুই স্থানে থেকে শুধু মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয় না। কারণ, বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্ত হলো, প্রস্তাব ও কবুল একই মজলিসে হওয়া এবং অন্তত দু'জন সাক্ষী ওই মজলিসেই উভয় পক্ষের কথা শুনা। আর দূরবর্তী দুই ব্যক্তির মাঝে অডিও-ভিডিও বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত অনুপস্থিত থাকে। তাই এ পদ্ধতিতে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। পাত্র-পাত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকলে সেক্ষেত্রে বিবাহ সম্পাদন করার সঠিক পদ্ধতি হলো,

ক. পাত্র/পাত্রী তার পক্ষে বিবাহ সম্পাদনের জন্য মোবাইল ইত্যাদির মাধ্যমে কাউকে উকিল বানাবে।[৩] তিনি উকিল হয়ে অন্তত দু'জন শরয়ী সাক্ষীর সামনে বিবাহের মজলিসে সরাসরি পাত্র/পাত্রীর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করবে। আর ২য় পক্ষ ওই মজলিসেই যথা নিয়মে সরাসরি কবুল করবে।

খ. অথবা কনে টেলিফোনে বরকে নিজের বিয়ের উকিল বানাতে পারে। তখন বর যদি অন্তত দু'জন শরয়ী সাক্ষীর সামনে বলে যে, অমুক মহিলা আমাকে তার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার পক্ষে আমাকে উকিল বানিয়েছে। সে হিসাবে আমি তাকে এ পরিমাণ টাকা মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করলাম। এভাবেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। ২য় পক্ষ সরাসরি ইজাব করবে আর ১ম পক্ষ ওই মজলিসেই পাত্র/পাত্রীর পক্ষে কবুল করবে।[৪]

---

১. ইসলাহুর রুসূম, পৃ. ৯০।
২. শরহু মাআনিল আছার : ২/৩০-৩১; মুসনাদে আহমদ, ১৮৯৭৬ (৪:৪৫); ফতোয়া সিরাজিয়া, পৃ. ৭৫; আলমুহিতুল বুরহানী : ৮/৫৮; খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ৪/৩৫৬; আলআওসাত : ৮/৭৫৫; রওযাতুত তালেবীন : ৭/৩৪২; মাহমূদিয়া ১১:১৭২; তালীফাতে রশীদিয়া ২৫০
৩. ফতোয়া আলমগীরী : ১/৩৬০: الباب السادس في الوكالة: يصح التوكيل بالنكاح وان لم يحضره الشهود। খুলাসাতুল ফতোয়া : ২/১৫
৪. ফতোওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১০/৬৮০; ফতোওয়ায়ে কাসিমিয়া : ১৫/১৩১; কিতাবুন নাওয়াযিল : ৮/৭৯; আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল : ৬/৯৭

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ–

ক. বিবাহের প্রস্তাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে।

খ. অন্তত দুইজন শরয়ী সাক্ষী উক্ত প্রস্তাব ও কবুল একই মজলিসে শুনতে হবে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে পূর্বোক্ত পন্থায় উকীল নিয়োগ না করে কেবল পাত্র-পাত্রী সরাসরি মোবাইল বা স্কাইপের মাধ্যমে কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এমনকি লাউড স্পিকার দিয়ে যেভাবে ঈজাব-কবুল করে, এতে শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বিবাহ সংঘটিত হয় না।

এ বিষয়ে সৌদি আরবের উচ্চতর ফতোয়া বোর্ড লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহূসিল ইল্‌মিয়্যা ওয়াল ইফতা তাদের শরয়ী সিদ্ধান্ত এবং মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দা ও ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি ইন্ডিয়াও তাদের রেজুলেশন পাস করেছে।[২]

বিবাহ উপলক্ষ্যে গানবাজনার আয়োজন

বিবাহ উপলক্ষ্যে গানবাজনা এবং আতশবাজি ও পটকা ইত্যাদি বিষয় বর্তমান সমাজে একটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। অনেক এলাকায় যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়ে নাচানাচি করে।

আবার নাচগানের জন্য পেশাদার গায়ক-গায়িকাদের ভাড়ায় আনা হয়। মানুষ এসব নাচগান উপভোগ করে। এ ধরনের নাচগান সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয।[৩] কুরআন হাদীসে গানবাজনার ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾.

---

১. হিদায়া : ২/৩০৫–

لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين.....

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي.

২. ফতোয়ায়ে লাজনাতুদ দায়িমা, ফতোয়া নং-১২১৬, ক্বারারাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জিদ্দা, রেজুলেশন নং-৫২(৩/৬),
ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি ইন্ডিয়ার রেজুলেশনের জন্য দেখুন- জাদীদ ফিক্‌হী মাবাহিস : খ. ২১, পৃ. ২১৭

৩. রদ্দুল মুহতার : ৯/৫৭৭:

وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام: ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال: ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء النبات.

قلت : وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام "{استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر}" أي: بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة.

ফতোয়া মাহমূদিয়া : ১/২২০, ২০৭

মোটকথা, শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে গানবাজনা নাজায়েয। আর এতে অর্থ ও সময়ের অপচয় তো আছেই। অথচ এ দুটিকে আজ গুনাহই মনে করা হয় না। এর দ্বারা বিবাহের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এর থেকে বিরত থাকা জরুরি।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি তুলে প্রিন্ট আকারে সংরক্ষণ করা

আজকাল বিবাহকে কেন্দ্র করে মানুষ গুনাহের বোঝা ভারী করে ফেলে। বিবাহ মানেই গুনাহের ছড়াছড়ি, সমাজে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্তমানে বিবাহের মধ্যে অন্যতম একটি গুনাহ হলো ছবি তুলে প্রিন্ট আকারে সংরক্ষণ করা। হাদীস শরীফে ছবির ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি বাণী এসেছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ».

অর্থ : কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের যারা ছবি বানায়।[১]

অনুষ্ঠানে অনেক গায়রে মাহরাম মহিলা থাকে তাদেরও ছবি তুলে প্রিন্ট আকারে সংরক্ষণ করা হয়, যাদের সাথে দেখা দেওয়া হারাম। এছাড়া অর্থ ও সময়ের অপচয় তো আছেই। তাই বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি তোলা ও ভিডিও করা থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক।[২]

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের শরয়ী বিধান

গায়ে হলুদ প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিবাহের মূল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়ে থাকে, যাকে ফোকলোরের ভাষায় বলেঃ Many rites within one ritual। বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যে-কোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেরই একটি এবং এটি মূলত একটি মঙ্গোলীয় অনুষ্ঠান, যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। হিন্দুসমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত। অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন নামে পালন করে থাকে, যেমনঃ গায়ে হলুদ, হলদি কোটা, তেলই, কুড় দেওয়া প্রভৃতি।

---

১. সহীহ বুখারী : ৪/১২৯
২. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ : ৭/১৮০; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৩/১৬৩–
والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسية لا ينبغي على أصل قوي، ومن المقرر شرعا أن ما كان حراما أو غير مشروع في أصله لا يتغير حكمه..... فكذالك الصور قد نهى الشارع عن صنعها واقتناءها، فلا فرق بينهما كانت اتخذت بريشة المصور أو بريشة الفوتوغرافية. والله أعلم بالصواب.

একাধিক বিবাহ : বাস্তবতা ও শরীয়াহ্

বিবাহ মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। একে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। সঠিকভাবে এর লক্ষ্য ও মাকসাদ অর্জনের জন্য যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। বিবাহের অন্যতম মাকসাদসমূহ হলো প্রশান্তি বা সুকূন লাভ করা, মানববংশ বিস্তার ও চরিত্র সুরক্ষা। কখনো এমন হয় যে, উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ এক বিবাহ দ্বারা অর্জন হয় না। কখনো স্ত্রীর মাসিক স্রাব থাকে, কখনো সন্তান ধারণ করে, কখনো সন্তান হয় না, কখনো অসুস্থতা থাকে, কখনো স্বামীর যৌন প্রবৃত্তি অধিক থাকে ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ না করা হলে স্বামীর চারিত্রিক পদস্খলন হতে পারে। বিবাহের মূল মাকসাদ অর্জন ব্যাহত হবে। তাই ইসলাম দ্বিতীয় বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। এমনকি কখনও অসহায় নারীকে আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজনেও একাধিক বিবাহ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

এ জন্য ইসলাম একাধিক বিবাহকে অনুমোদন করেছে। তবে শর্ত হলো, সকল স্ত্রীদের মাঝে শরয়ী আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। যদি 'আদল ও ইনসাফ' প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে মনে হয় বা ব্যর্থ হয়; তাহলে একটির ওপরই ক্ষান্ত হতে হবে। নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না। এ হলো ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধান।

বিষয়গুলো কুরআনুল কারীমে সংক্ষেপে এসেছে এভাবে,

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا﴾

অর্থ : ...অবশ্য যদি আশঙ্কা বোধ করো যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাক।[১]

আদল ও ইনসাফ (The obligation to treat co-wives fairly)

'আদল ও ইনসাফ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের আয়ত্তাধীন সকল বিষয়ে সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব। একজন পুরুষ ইচ্ছা করলে খুব সহজেই তার সকল স্ত্রীদের মাঝে এসব বিষয়ে সমতা বিধান করতে পারবে। যেমন :

---

১. সূরা নিসা : ৩

খাবার-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, রাত্রিযাপন ইত্যাদি। এমনকি আদর-সোহাগ যেগুলোতে সমতা বজায় রাখা সম্ভব; সেগুলোও যথাসম্ভব সমতা বজায় রাখতে হবে।

অপরদিকে যেসব বিষয় মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। সহজাত প্রবৃত্তির বিষয়। যেমন, বিশেষ কোনো গুণ বা চরিত্রের কারণে কোনো এক স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসা ও অত্যধিক আকর্ষণ বোধ করা। কোনো এক স্ত্রীর আচরণে মুগ্ধ থাকা। এগুলো মানুষের আয়ত্তে নয়। মানুষ চাইলেও ভালোবাসায় সমান ভাগ করতে পারবে না। তাই এসব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। তদ্রূপ সহবাস ও সফরেও সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। এগুলো মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

অর্থ : তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না। তবে কোনো একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মতো ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করে চলো তবে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

সমতা বিধান করতে না পারার ভয়াবহতা

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ ».

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার দুজন স্ত্রী আছে আর সে তাদের মধ্য থেকে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।[২]

আদল-ইনসাফ ও বর্তমান বাস্তবতা

আজকের সময়টি খুবই নাজুক। মানুষের মাঝে দীন ও শরয়ী ইল্‌মের চর্চা খুবই কম। দীনের প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে মানুষের গাফিলতি বিরাজমান। বিশেষ করে দাম্পত্য অধিকার বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা চরমে। এহেন মুহূর্তে পুরুষরা এক স্ত্রীর হক-ই আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে পদে পদে। খাবার রান্না করা, কাপড় ধুয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে

১. সূরা নিসা, আয়াত : ১২৯
২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩২২; সুনানে আবু দাউদ : ২১৩০

যেগুলো স্বামীর শরয়ী আবশ্যকীয় হক নয়; এসব ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়।

এজন্য সালাফের অনেকেই বলেছেন, বর্তমান সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করা ঠিক নয়।

শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও বিচারক আবুল কাসেম ছাইমারী রহ. (মৃ.৩৮৬হি.) বলেছেন,

المستحب أن لا يزيد على الواحدة، لاسيما في زماننا.

> **অর্থ :** (স্বাভাবিক অবস্থায়) একের অধিক (এক স্ত্রীর বর্তমানে) বিবাহ করা উচিত নয়; বিশেষত আমাদের যামানায়।[১]

লক্ষ করুন, আজ থেকে হাজার বছর আগেই এ কথা ফকীহগণ বলে গেছেন। তখনকার দীনি পরিবেশ অবশ্যই আমাদের চেয়ে ভালো ছিল। সেই তুলনায় এই যামানায় উক্ত ফতোয়া কতটা বাস্তবসম্মত তা বলাই বাহুল্য।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, 'এ যামানায় দ্বিতীয় বিবাহ করাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত বিষয়। বর্তমান সময়ের মানুষের মেজায-তবিয়ত এভাবে গড়ে উঠছে যে, তা আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী নয়। আমরা তো কোনো আলেমকেও দেখি না একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। সুতরাং যারা আলেম নয়, তারা কীভাবে সমতা রক্ষা করবে! বরং এটাই হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় বিবাহ করে প্রথমটি ছেড়ে দেয় বা ছাড়ার মতো করে রেখে দেয়। এর কারণ হলো, বর্তমান সময়ে মানুষের মেজায-তবিয়তে ইনসাফ ও রহমের গুণ খুব কমই বিদ্যমান। এজন্য আজকের সময়ের বিবেচনায় আদল ও ইনসাফ মানুষের প্রায় সামর্থ্য বহির্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহ করা হয় সেটাও যে শতভাগ আদায় হবে এরই-বা কী নিশ্চয়তা রয়েছে!'[২]

তবে কখনও যদি এমন হয় যে, বিদ্যমান স্ত্রী স্বামীর বৈধ প্রয়োজন পূরণে শারীরিকভাবে অক্ষম, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত দ্বিতীয় বিবাহকে সহজভাবে গ্রহণ করা। পাশাপাশি স্বামীর জন্য দ্বিতীয় বিবাহে সমতা বিষয়ে পূর্বোক্ত যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা অনুসরণ করা জরুরি হবে।[৩]

---

১. আল বায়ান : ৯/১১৮
২. খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত : ২০/৩২-৩৩
৩. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু : ৬৬৭২

সারকথা

বর্তমান সময়ে এ আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা প্রায় সামর্থ্যের বাইরে। তাই পারতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করে নিজেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা ঠিক নয়।

নিকাহনামার ১৮নং ধারা সংক্রান্ত শরীয়াহ্ পর্যালোচনা

১৮ নং ধারা পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম ১৯৭৪ সালে 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪' পাশ হয়। এ আইনের ধারা ১৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৯৭৫ সালে 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা' প্রণয়ন করেন। উক্ত আইনেই বিভিন্ন ধরনের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রি ফরম তৈরি করা হয়।

পরবর্তীতে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে গত ২০০৯ সালে 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯' পাশ হয়। এটিই বর্তমানে এ বিষয়ে সর্বশেষ আইন।

উক্ত আইনের ধারা ২৭ হলো 'নিকাহ রেজিস্টার কর্তৃক রেজিস্টার সংরক্ষণ'। তাতে বলা হয়েছে, '(১) প্রত্যেক নিকাহ রেজিস্টারে বিবাহ বা তালাকের জন্য নিম্নবর্ণিত রেজিস্টারসমূহ সংরক্ষণ করিবেন-(ক) বিবাহ রেজিস্টার (ফরম 'ঘ' অনুযায়ী)...'[১]

উক্ত আইনের তফসীলে বর্ণিত 'ফরম 'ঘ'-ই হলো আমাদের আলোচিত 'নিকাহনামা'। একে 'কাবিননামা'-ও বলে। মূলত আইনের ভাষায় এর নাম হলো ফরম 'ঘ'। এতে মোট ২৫টি ধারা আছে। এর মাধ্যমেই বিবাহ নিবন্ধন করা হয়। এটিই বিবাহ নিবন্ধনের মূল দলিল। এতে বিবাহের উভয় পক্ষ, বিবাহের সাক্ষী, দেনমোহর, তাফয়ীযে তালাক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে। এর জন্য আলাদা রেজিস্টার রয়েছে।

৭৪ সনের পূর্বোক্ত আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী নিকাহ রেজিস্টার বিবাহ সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে কাবিননামার সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করা হয়। সাধারণত আমাদের সামনে যেটা থাকে সেটা মূলত সত্যায়িত প্রতিলিপি।

উক্ত 'নিকাহনামার' ধারা-১৮ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ধারা-১৮ এর আলোচ্য বিষয়

১৮ নং ধারায় 'তাফয়ীযে তালাক' বা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। তাতে লেখা থাকে,

'স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ (কোথাও লেখা থাকে 'প্রদান') করিয়াছে কি

---

১. প্রাগুক্ত : ১৯৮

না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে?'[১]

নারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এর মাধ্যমে স্ত্রীরা স্বামী থেকে দাম্পত্য জীবনের অসহনীয় পরিস্থিতিতে সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার অর্জন করে থাকে। কিন্তু আফসোস হলো, ধারাটি সাধারণত যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণ করা হয় না। যদ্দরুন এতে যে কল্যাণ ও উপকারিতা ছিল তা থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়। নিম্নে ধারাটি পূরণে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে তা আলোচনা করা হলো-

কাবিননামার ১৮ নং ধারা পূরণ ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি

কাবিননামার উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে পূরণ করা হয় না। এ সংক্রান্ত যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে তা হলো-

ক. বিবাহের অনেক কাযীই উক্ত ধারা পূরণ করার সময়, 'তিন তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে' বলে লিখে দেয়।

এটি ভুল। কারণ, উক্ত ক্ষমতাবলে পরবর্তীতে স্ত্রী যখন সামান্য কারণেই তিন তালাক গ্রহণ করে বসে তখন চাইলেও ওই স্বামীর সাথে পুনরায় ঘর সংসার করার সুযোগ থাকে না। তাই ধারাটা এমনভাবে লেখা উচিত, যেন সহজে আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়, আবার অতিরিক্ত ক্ষমতা পেয়ে ক্ষতিও যেন না হয়। এজন্য এক্ষেত্রে কেবল 'এক তালাকে বায়েন' গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। এতে এ ধারার উদ্দেশ্যও হাসিল হবে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে সে সুযোগও বাকি থাকবে।

খ. ধারায় লেখা আছে, 'কী কী শর্তে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে?'

এক্ষেত্রে শর্তগুলো ভেবে-চিন্তে লেখা হয় না। শর্তের ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ে পক্ষের মতামত নেওয়া বা শর্তগুলো সুচিন্তিতভাবে লেখার চেষ্টা করা হয় না। গৎবাঁধা কিছু শর্ত লিখে দেওয়া হয়। যা অনেক ক্ষেত্রে উপকারের পরিবর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ ডেকে আনে। তাই শর্তসমূহ ভেবেচিন্তে লিখতে হবে। (সামনে এর একটি নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে)

গ. সাধারণত বিবাহের সময় উক্ত ধারা বলে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর এখতিয়ারে দেওয়া হয়। তালাক গ্রহণের আগে নিজ অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ গ্রহণের কথা বলা হয় না। এটাও ঠিক নয়। তালাক গ্রহণের আগে স্ত্রী যদি নিজ অভিভাবকের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করে তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে অভিভাবকদের সহায়তায় আপস-মীমাংসায় বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তালাক গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া এতে পূর্বাপর চিন্তা না করে হুট করে তালাক গ্রহণের পথও বন্ধ হবে।

'আয়াতে তাখয়ীর' (সূরা আহযাব : ২৯) নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. প্রাগুক্ত : ২০৬

ওয়া সাল্লাম আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে 'দুনিয়ার অর্থ-বিত্ত চাও না আমাকে চাও' এ প্রস্তাব দেওয়ার সময় বলেছিলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তুমি তাড়াহুড়ো করো না। তুমি তোমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ো।[১]

উক্ত হাদীসে প্রিয়নবী বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজ অভিভাবকের সাথে পরামর্শ গ্রহণের কথা বলেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয়, স্ত্রীদেরকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি 'অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ সাপেক্ষে' হওয়া উচিত। যেন তালাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা তাড়াহুড়া না করে। ভুল না করে।

ঘ. উক্ত ১৮ নং ধারার ক্ষমতাবলে অনেক নারী ডিভোর্স লেটারে বিষয়টি এভাবে লিখে যে, 'আমি অমুককে তালাক দিলাম কিংবা ডিভোর্স দিলাম'। এটাও ভুল।

বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তই যদি চূড়ান্ত হয় তাহলে স্ত্রী উক্ত ধারানুযায়ী তালাক গ্রহণের কথা এভাবে বলবে কিংবা এভাবে লিখবে, 'আমি কাবিননামার ১৮ নং ধারায় স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করলাম।'

'তালাক দিলাম' বা 'ডিভোর্স দিলাম' এসব শব্দ বলবে না। কারণ, ইসলামী আইন অনুযায়ী স্বামী তালাক প্রদান করে, স্ত্রী নয়। স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে। প্রদান করে না। এজন্য অনেকের মতে, ঐভাবে স্ত্রী তালাক দিলে তালাক গ্রহণ কার্যকর হয় না।

উল্লেখ্য, কাবিননামার উক্ত ধারার ভাষ্যেও লেখা আছে 'তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না'। ইসলামী আইন অনুযায়ী স্ত্রী তালাক প্রদান করে না। তাই এখানে 'তালাক প্রদান' এর স্থলে 'তালাক গ্রহণ' শব্দ লেখা উচিত। ধারাটির সঠিক ভাষ্য হবে এরূপ, 'স্বামী স্ত্রীকে নিজ নফসের প্রতি তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে?'

আশা করি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি আমলে নেবেন।

ঙ. অনেকে ধারাগুলো পূরণ করার আগেই সাদা কাগজে দস্তখত করে দেয়। কিংবা বিবাহের কাযীরা দস্তখত করিয়ে নেয়। এরপর কাযীরা নিজেদের মতো করে ধারাগুলো (বিশেষ করে ১৮ নং ধারাটি) পূরণ করে নেয়। এটাও ভুল।

বিবাহ একটি চুক্তি। একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। আর যে-কোনো চুক্তিই ইসলামে লিখিত হওয়া কাম্য। শরীয়তে যেমন এর গুরুত্ব রয়েছে তেমনি দুনিয়ার আইনেও এর গুরুত্ব আছে। কাবিননামা হলো বিবাহ-চুক্তির লিখিত রূপ।

অতএব এটি চুক্তির নিয়মানুযায়ী পূর্ণ করা উচিত। তা হলো, আগে সবগুলো ধারা ছেলে ও মেয়ে (কিংবা মেয়ের পক্ষের অভিভাবক) কর্তৃক পূরণ হবে। এরপর উভয়ে দস্তখত করবে।

অবশ্য এক্ষেত্রে বিবাহের পর সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে দেওয়ার অর্থ যেহেতু প্রতিনিধি বা

---

১. (বিস্তারিত দেখুন সহীহ মুসলিম : ১৪৭৮; তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৭৬৪)

উকিলের মাধ্যমে 'ধারাগুলো পূর্ণ করার পূর্ব অনুমতি প্রদান' তাই ফিকহের দৃষ্টিতে এ দস্তখতও গ্রহণযোগ্য। তবে এটি নিয়ম পরিপন্থি। অতএব এমনটি না করাই কাম্য।

স্বামীর জন্য কি তাফয়ীয করা জরুরি?

বিবাহের সময় বা পরে বা আগে স্ত্রীকে তাফয়ীযে তালাক অর্পণ করা স্বামীর জন্য আবশ্যক নয়। এটি বিবাহ সহিহ হওয়ারও কোনো শর্ত নয়। তবে স্ত্রী চাইলে সেটা চেয়ে নিতে পারে। দেশীয় আইনেও এটি অর্পণ করা আবশ্যক নয়।

একটি আইনের ফায়সালায় লেখা আছে এভাবে, 'বিবাহ ভঙ্গ করার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে কাবিননামায় ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।'[১] আইনের কোথাও স্বামীর জন্য এটি আবশ্যক করা হয়নি।

তাছাড়া খোদ ১৮ নং ধারায়ও কথাটি লেখা হয়েছে অপশন হিসাবে। এর স্পষ্ট অর্থ : না করারও অধিকার আছে।

সুতরাং শরীয়াহ্ ও দেশীয় আইন উভয় দিক থেকেই তাফয়ীয অর্পণ করা স্বামীর জন্য আবশ্যক নয়। স্বামী চাইলে ওই ধারায় 'না'-ও লিখতে পারে। এক্ষেত্রে কাযী বা বিবাহ রেজিস্টারকারী পাত্রকে তাফয়ীয করতে বাধ্য করা অন্যায়।

অবশ্য পাত্রীর অধিকার আছে তাফয়ীয চাওয়ার। সাধারণ অবস্থায় ভবিষ্যৎ-সমস্যা এড়ানোর জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাফয়ীয অর্পণ করাই শ্রেয়।

১৮ নং ধারা পূরণের সঠিক পদ্ধতি

স্ত্রী যেন নিজ নফসের প্রতি তালাক গ্রহণে তাড়াহুড়ো না করে, ভেবে-চিন্তে তালাক গ্রহণ করতে পারে, পরে যেন আফসোস করতে না হয় এ জন্য একটি ভারসাম্য পন্থায় ধারাটি পূরণ করা উচিত। যেন প্রয়োজন ছাড়া সামান্য রাগ হলেই স্ত্রী তালাক গ্রহণ করতে না পারে। আবার স্বামীও যেন স্ত্রীকে আটকে রেখে জুলুম নির্যাতন করার সুযোগ না পায়।

উক্ত বিবেচনায় ধারাটি পূরণের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি—

১. সর্বোচ্চ এক তালাকে বায়েনের ক্ষমতা অর্পণ করা।
২. উক্ত ক্ষমতার বাস্তবায়ন স্ত্রীর অন্তত দুজন অভিভাবকের সাথে পরামর্শ ও অনুমতি সাপেক্ষে হওয়া।
৩. তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণটি সুচিন্তিত শর্তসাপেক্ষে হওয়া। প্রচলিত হালকা গৎবাঁধা শর্তে না হওয়া।
৪. ১৮ নং ধারা (অন্যান্য ধারাও) পূরণ করার পর দস্তখত করা। আগে নয়।

---

১. মুসলিম পারিবারিক আইন ও বিধিমালা : ১৫৯। আরো দেখুন পৃ. ৪১-৪২

উক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে আমরা উক্ত ধারাটি নিম্নোক্তভাবে পূরণ করতে পারি,

'১৮। 'স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে?'

'হাঁ, স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয় বা তার এমন কোনো ওযর দেখা দেয় যার কারণে স্ত্রীর শরয়ী হক আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে কিংবা তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, একে অপরের শরয়ী হক আদায়ে ব্যর্থ হয় এবং এসব অবস্থায় স্ত্রী পক্ষের অন্তত দুজন মুরুব্বী (বা একজন শরয়ী অভিভাবক) তাদের পৃথক হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত দেন তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের ওপর কেবল এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করতে পারবে।'

প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণের ব্যাপারে মুরুব্বীদের অনুমতি লিখিত হওয়া ভালো। যেন পরবর্তীতে মহিলাকে এ ব্যাপারে ফতোয়া বা রায় পেতে কোনো ঝামেলার সম্মুখীন হতে না হয়। কেউ যেন অনুমতির বিষয়টি অস্বীকার না করতে পারে।

উপর্যুক্ত পন্থায় ধারাটি পূর্ণ করার ফায়দা

তালাক গ্রহণে তাড়াহুড়ো হবে না। বিচ্ছেদের প্রয়োজন হলে ভেবে-চিন্তে তালাক গ্রহণ করবে।

নারীদের তালাক গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পাবে। অভিজ্ঞ মহল জানেন, বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে নারীদের পক্ষ থেকেই তালাকের ঘটনা বেশি আসছে। ১৮ নং ধারাটি উপর্যুক্ত পন্থায় পূর্ণ করলে এটি অনেকাংশেই রোধ হবে বলে আশা করি।

কেবল এক তালাকে বায়েন গ্রহণের কারণে পরবর্তীতে তারা চাইলে নতুন করে বিবাহের মাধ্যমে সংসার করার সুযোগ বাকি থাকবে।

অতএব এ ব্যাপারে সকলেরই সচেতন হওয়া জরুরি। বিশেষ করে যারা বিবাহ রেজিস্ট্রি করেন, বিবাহ পড়ান তাদের সচেতন হওয়া খুব জরুরি। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি উক্ত পুস্তিকায় ১৮ নং ধারাটি পূরণে যে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হলো, সে অনুযায়ী যেন তারা ধারাটি পূর্ণ করে দেন। এতে অনেক সংসার অল্পতেই ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে বলে আশা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের বাংলা কাবিননামা ও বর্তমান কাবিননামা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় তৈরি কাবিনামার কিছু প্রাচীন দুর্লভ কপি আমাদের হাতে আসে। বর্তমান যে কাবিননামা প্রচলিত, সেটি মূলত পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে ১৯৬১ ইং সনের সমালোচিত পারিবারিক আইন অনুসারে রচিত। বাংলাদেশ হওয়ার পর, ৭৫ ইং সনে অনেকটা এর আদলেই বাংলা কাবিননামা রচিত হয়।

বর্তমান প্রচলিত কাবিননামা ও এর আগে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকের কাবিননামা-পরস্পর তুলনা করা হলে-দেখা যায়, আগের কাবিননামার ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, তালাকের অধিকার অর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই ছিল। নিম্নে কিছু তুলনা দেখানো হল-

১. মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়া

১৯৪০ইং সনের একটি বাংলা কাবিননামায় এ বিষয়ে স্বামীর স্বীকারোক্তি হিসাবে লেখা ছিল-'স্ত্রীর ওলি আকরাব (নিকটতম অভিভাবক) এর সম্মুখ ভিন্ন মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়া যাবে না। করা হলে, তা আইনগত অগ্রাহ্য হবে।'

এটি একটি ভালো দিক। বর্তমানে নানা বাহানায় স্ত্রীর কাছ থেকে একাকী মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়া হয়।

২. বিবাহ করে প্রবাসে গমন

১৯৪৩ইং সনের একটি কাবিননামায় লেখা ছিল-'স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দূরদেশে প্রবাসে যাওয়া যাবে না। যেতে হলে স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। ১৯৪০ সনের একটি কাবিননামায় আরও লেখা ছিল-একান্ত প্রয়োজনে যেতে হলে অগ্রিম খোরপোশ দিয়ে যেতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সাক্ষাৎ করতে হবে।

এ ধারাটি বর্তমানে কতোটা প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনও গ্রাম আছে, যেখানে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই প্রবাসী থাকে। বিয়ে করে পুরুষরা দ্রুত বিদেশ চলে যায়। বছরের পর বছর স্ত্রী দেশে একাকী থাকে। এক সময় তা অনেক অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. তালাকে তাফঈয

তালাকে তাফঈয কাবিননামার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মাধ্যমে সংকটকালে প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর বন্ধন থেকে নিজেকে পৃথক করার সুযোগ লাভ করে। এ বিষয়ে প্রাচীন বাংলা কাবিননামার ভাষা ছিল এরকম-

'আপনাকে যে আমার তিন তালাক দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাহা অদ্যই আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। খোদা না করুন, কোনো কারণে আমি যদি স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারে অযোগ্য হই, কি উন্মাদ দেওয়ানা হই, কি কোনো কারণে বা অকারণে আপনার সহবাসে বঞ্চিত কি অক্ষম কি অনুপস্থিত থাকি, কিংবা উপরের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করি, তখন মুদ্দত এক বছর আমার অপেক্ষা করিয়া, তৎপর উক্ত ক্ষমতায় আপনি আপন শরীরে তিন তালাক দিয়ে ইদ্দতান্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন'। (১৯৪০ সনের একটি কাবিননামা)

প্রায় এ ধরনের কথা অন্যান্য প্রাচীন বাংলা কাবিননামায়ও আছে। এখানে তালাক প্রদানের কথা নেই, বরং তালাক গ্রহণের কথা বলা আছে। এটিই সঠিক। আমাদের প্রচলিত কাবিননামায় স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যা সঠিক নয়।

এছাড়া বাস্তবধর্মী নানা শর্তের কথা লেখা ছিল। এখনকার কাবিননামায় কোনো শর্ত বলা থাকে না। খালি জায়গা থাকে। সেখানে যে যার মতো গৎবাঁধা কিছু শব্দ লিখে দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই যা কল্যাণকর হয়ে ওঠে না।

৪. স্ত্রীর আত্ম-উন্নয়ের ব্যাপারে স্বামীর স্বীকারোক্তি

প্রাচীন কাবিন নামায় আরো একটি ভালো দিক পাওয়া যায়, তা হলো-বিবাহের পর স্ত্রীর আত্ম উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। একটি কাবিননামায় লেখা আছে-'আপনাকে পর্দায় রাখিয়া মুসলমানি আহকামাদি শিখাইতে থাকিব। আপনাকে সদা পর্দা-পুশিদায় রাখিয়া উপযুক্ত ভরণপোষণ দ্বারা নির্বিবাদে পরম সুখে রাখিব'। (১৯৪৩ ও ১৯৪০ সনের কাবিননামা)

এ বিষয়গুলো বর্তমান কাবিননামায় নেই। অথচ এগুলো একটি সুস্থ পরিবার গঠনে ভালো ভূমিকা রাখতে পারতো।

৫. স্ত্রীর সাথে সদাচরণের স্বীকারোক্তি

প্রাচীন কাবিননামায় এটাও লেখা ছিল-'আপনাকে কখনও মাইর-পিট, কটু গালিগালাজ করিব না। আপনার দ্বারা সমশ্রেণিতে মানহানিকর কোনো কার্য করাইব না। আপনার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিব না।' (১৯৪০ সনের একটি কাবিননামা)

পাকিস্তান আমলের একটি বাংলা কাবিননামায় আছে-'আপনাকে শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক কোনো কষ্ট দিবো না। মানহানিকর কোনো কাজ করবো না ও করাইবও না।'

বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব ভালো কথাগুলো আজ আমরা হারিয়েছি। আমরা মনে করি, প্রাচীন কাবীননামার এসব ভালো দিকগুলো সামনে রেখে একটি আদর্শ কাবিননামা রচিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবাহ-পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়

ওলীমা করার বিধান

বিয়ের পর ছেলেপক্ষের জন্য ওলীমা করা সুন্নত।[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ওলীমা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রা.-কেও ওলীমা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত,

«عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ».

> **অর্থ :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্য হতে হযরত যায়নাব রা.-এর বিয়েতে যে পরিমাণ খাবার দ্বারা ওলীমা করেছেন অন্য কারো বেলায় এ পরিমাণ করেননি।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

অর্থ : একটি ছাগল দ্বারা হলেও ওলীমা করো।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, ওলীমার সুন্নত আদায়ের জন্য মেহমানদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। খাবারের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ওলীমা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর (উম্মে সালামা রা.)[৪] বিয়েতে মাত্র দুই সের যব দ্বারা ওলীমা করেছেন।[৫]

সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও ওলীমা করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা শরীয়তে নেই। সামর্থ্য থাকলে বড়ো আকারে ওলীমার আয়োজন করা যাবে। তবে শর্ত হলো, তা লৌকিকতা এবং লোক দেখানোর মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে ওলীমাতে যেসব লৌকিকতা, অশ্লীলতা ও অপচয় হয়ে থাকে তা সুন্নাহ পরিপন্থি।

---

১. ফতোয়া হিন্দিয়া : ৫/৩৯৭
২. সহীহ বুখারী : ৩/৬২৭
৩. সহীহ বুখারী : ৩/৬২৭ : ৫১৬৫৭
৪. ফাতহুল বারী : ৯/২৩৯
৫. সহীহ বুখারী : ৩/৬২৭

ওলীমার দাওয়াত কবুল করার বিধান

ওলীমার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত।[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا».

অর্থ : তোমাদেরকে যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা তা কবুল কর"।[২]

তবে বর্তমান যুগে অনেক বিবাহের অনুষ্ঠানে নাচ-গান, নোংরামি ও অশ্লীলতা থাকে। তাই দাওয়াতের অনুষ্ঠানে এসব পাপ কাজ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। আর যদি দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার পর এসব পাপ কাজ দেখতে পায়। তাহলে সে যথাসম্ভব তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে এবং সে সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তি হলে, অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসবে। অনুসরণীয় ব্যক্তি না হলে পাপ কাজগুলোকে মনে মনে ঘৃণা করবে ও যথাসম্ভব তা হতে দূরে থেকে খাবার খেয়ে আসতে পারবে।[৩]

মোহর: কিছু কথা

মোহরের পরিচয়

মূলত একটি সম্মানী, যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়ে থাকে। যার মূল উদ্দেশ্যই হলো নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। তাই মোহর নির্ধারণের সময় পুরুষের ইচ্ছা ও সঙ্গতির সাথে সাথে স্ত্রীর সম্মানের বিষয়টিও লক্ষণীয়। অতএব শরীয়তের দাবী হলো, মোহরের পরিমাণ এত অল্পও নির্ধারণ না করা যে, তাতে সম্মানের বিষয়টি একেবারেই প্রকাশ পায় না। তেমনি এত অধিক পরিমাণও নির্ধারণ না করা যে, স্বামী তা আদায় করারই সামর্থ্য রাখে না। বরং উভয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত।

এক কথায় শরীয়াহ্সম্মত পন্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর জিম্মায় শরীয়াহ্সম্মত যে দায় নির্ধারিত হয়, তাকেই ফিক্হের পরিভাষায় মোহর বলে।

---

১. রদ্দুল মুহতার : ৯/৫৭৩–

وفي الاختيار: وليمة العرس سنة قديمة ان لم يجبها أثم، لقوله عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله..... ومقتضاه أنها سنة مؤكدة.

২. সহীহ বুখারী : ৩/৬২৯

৩. রদ্দুল মুহতার : ৯/৫৭৪–

(دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل ، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا؛ لقوله تعالى : - {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} - (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد)؛ لأن فيه شين الدين، والمحكي عن الإمام: كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا ، لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله، ابن كمال.

মোহরের বিধান

মোহর একটি আবশ্যিক বিধান এবং একজন স্ত্রীর শরীয়াহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার। এটি আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর জিম্মায় তা ঋণ হিসাবে থেকে যায়। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর মিরাস বণ্টনের পূর্বে স্ত্রীর মোহর আদায় করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, ﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً﴾ অর্থাৎ তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও।[১]

মোহর নির্ধারণের পদ্ধতি

হানাফী ইমামগণের মধ্যে শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে নারীর আসল হক হলো মোহরে মিছল। তা হলো, ওই নারীর (সৌন্দর্য, বয়স, সম্পদ, বসবাসের এলাকা, যুগ, বুদ্ধিমত্তা, দীনদারী, কুমারী বা বিবাহিত হওয়া, চরিত্র, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে) নিজের বংশের তার মতো অন্যান্য নারীদের সাধারণত যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা তার মোহরে মিছল বা ন্যায্য মোহরানা।[২]

আর যদি নিজের বংশের তার সমপর্যায়ের আর কোনো নারী না থাকে, তাহলে অন্য বংশে তার সমপর্যায়ের নারীদের যে মোহর সাধারণত নির্ধারণ করা হয় সেটাই তার মোহরে মিছল। শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে স্ত্রী মূলত মোহরে মিছলের হকদার। তবে স্ত্রী নিজেই যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরে মিছল হতে কম নিতে রাজি হয় অথবা স্বামী খুশি মনে মোহরে মিছল থেকে অধিক পরিমাণ নির্ধারণ করে তবে শরীয়াহ্-এর অনুমতি আছে।[৩]

সর্বনিম্ন মোহর

শরীয়তে মোহরের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। বরং ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বামীর সামর্থ্যের ওপর। তবে সর্বনিম্ন পরিমাণটি শরীয়তে নির্ধারিত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

---

১. সূরা নিসা, আয়াত : ৪

২. আদ্দুররুল মুখতার : ৩/১৩৭–

(و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي: أي مهر امرأة تماثلها (من قوم أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه. وفي الخلاصة: يعتبر بأخواتها وعماتها، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى، ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ. وتعتبر المماثلة في الأوصاف (وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وأدبا وكمال خلق) وعدم ولد. ويعتبر حال الزوج أيضا، ذكره الكمال.

৩. রদ্দুল মুহতার : ৩/১০০। (এইচ. এম. সাঈদ)–

والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل، ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى، فإنما قام مقامه للتراضي به.

«لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».

অর্থ : দশ দিরহামের কমে মোহর হয় না।[1]

এ পরিমাণের চেয়ে কম মোহর নির্ধারণ করলেও স্বামীর ওপর উল্লিখিত সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর স্ত্রীকে দেওয়া আবশ্যক হবে।[2]

আর হানাফী মাযহাব মতেও মোহরের পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম। যার পরিমাণ প্রায় ২ তোলা সাড়ে সাত মাশা বা ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা। এর চেয়ে কম মোহরে স্ত্রী সম্মত হলেও শরীয়তে তা বিধিসম্মত নয়। কারণ এর দ্বারা মোহরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। জেনে রাখা উচিত যে, এই সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে আর্থিকভাবে দুর্বল লোকদের কথা বিবেচনা করে। এর অর্থ এটা নয় যে, এটাই শরয়ী মোহর অথবা এতো অল্প মোহর নির্ধারণে শরীয়াহ্ উৎসাহিত করেছে বা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে এর চেয়ে অধিক মোহর নির্ধারণ করা অনুচিত।

মোহরে ফাতেমী

মোহর নির্ধারণের প্রচলিত আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ ও স্ত্রীগণের মোহর। আমাদের সমাজে এটিই মোহরে ফাতেমী নামে প্রচলিত।

«عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ»

হযরত আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে প্রদানকৃত মোহর কত ছিল? তিনি বলেছিলেন, ১২ উকিয়া ও এক নাশ্ (এক উকিয়ার অর্ধেক)। এতে মোট ৫০০ দিরহাম হয়। এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক (অধিকাংশ) উম্মাহাতুল মুমিনীনকে প্রদানকৃত মোহর।[3]

---

১. সুনানে দারাকুতনী : ৩/২৪– وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني كذا قاله ابن الهمام في فتح القدير ١٨٦/٣

২. বাদায়েউস সানায়ে : ২/৫৬– فصل وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم । হিদায়া ২/৩২৩

৩. সহিহ মুসলিম : ৩৪৮৯/১৪২৬

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী ও কন্যাগণের মোহরের পরিমাণ ছিল ৫০০ দিরহাম। অর্থাৎ ১৩১.২৫ তোলা বা ১৫৩০.৯ গ্রাম রুপা। এই পরিমাণটি ওই যুগে মধ্যম পর্যায়ের ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, মোহরানা নির্ধারণে স্বামীর সামর্থ্যের বিষয়টি ও স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখা।

তবে উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ নির্ধারণ করে এ নিয়তে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারণকৃত পরিমাণটি বরকতপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং এতে সওয়াবের আশা করে, তাহলে এ আবেগ ও মনোবৃত্তি অবশ্যই বরকতপূর্ণ ও পছন্দনীয় এবং প্রশংসনীয়।

তবে মোহরে ফাতেমীকেই শরয়ী মোহর বলা এবং এতো গুরুত্ব দেওয়া যে, এর চেয়ে কমবেশি নির্ধারণ করা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়-এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। বিশেষত স্ত্রী বা স্ত্রীপক্ষ যদি এতে রাজি না হয়, তখনও এ মোহারানা চাপানোর চেষ্টা করা অন্যায়।

মোহরে ফাতেমী বের করার নিয়ম

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে:

আমরা জানি, ১ দিরহাম=২৫.২ রত্তি
অতএব, ৫০০ দিরহামের পরিমাণ হবে (২৫.২×৫০০=) ১২,৬০০ রত্তি।
আর ৯৬ রত্তি = ১ ভরি হলে ১২,৬০০ রত্তি =(১২,৬০০÷৯৬) ১৩১.২৫ ভরি হবে।
∴ ব্রিটিশ পরিমাপে মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ হবে ১৩১.২৫ ভরি।

মেট্রিক পদ্ধতিতে:

আমরা জানি, ১ দিরহাম= ৩.০৬১৮ গ্রাম
অতএব, ৫০০ দিরহামের পরিমাণ হবে (৩.০৬১৮×৫০০=) ১,৫৩০.৯ গ্রাম।
তাহলে মেট্রিক পরিমাপে মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ হবে ১,৫৩০.৯ গ্রাম।
∴ মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ হলো, ১৩১.২৫ ভরি বা ১,৫৩০.৯ গ্রাম রুপা বা তার মূল্য।

স্ত্রীর মোহর বাকি রাখার ব্যাপারে ইসলামের বিধান

লোক দেখানোর জন্য অনাদায়ের নিয়তে অধিক মোহর ধার্য করা-এটি সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। মোহরানা স্ত্রীর পাওনা। কাউকে তার পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হারাম।

হাদীস শরীফে এসেছে,

«أَيِّمَا رجل تزوج امْرَأَة على مَا قل من الْمهْر أَو كثر، لَيْسَ فِي نَفسه أَن يُؤَدِّي إِلَيْهَا حَقّهَا، خدعها فَمَاتَ وَلم يؤد إِلَيْهَا حَقّهَا لَقِي الله يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ زَان».

অর্থ : যে ব্যক্তি বিয়ের সময় এ নিয়তে দেনমোহর নির্ধারণ করে যে, দেনমোহর সে পরিশোধ করবে না। তাহলে সে স্ত্রীকে ধোঁকা দিল। এরপর সে বাস্তবেই দেনমোহর শোধ না করেই যখন ইন্তেকাল করবে, তখন সে যিনাকারী হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।[১]

সুতরাং স্ত্রীর বংশীয় মর্যাদা ও স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী আদায়ের নিয়তে মোহর নির্ধারণ করতে হবে। অনাদায়ের নিয়তে মোহর নির্ধারণ করা নাজায়েয।

জবরদস্তি করে, ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অথবা স্ত্রীর লজ্জা ও দুর্বলতার সুযোগে তার দেনমোহর মাফ করিয়ে নেওয়া- এটিও নাজায়েয। এভাবে দেনমোহর মাফ হয় না। কারণ এতে স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন,

«لا يحل لإمرئ من مال أخيه شيئ إلا بطيب نفس منه».

অর্থ : কারো জন্য তার ভাইয়ের কিছুমাত্র সম্পদও বৈধ নয়, যদি তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি না থাকে।[২]

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, 'সঠিক অর্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাফ করা হলো কি না তা বুঝার উপায় হলো, মোহরানার টাকা স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। এরপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ ছাড়া স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় ওই টাকা ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে বোঝা যাবে বাস্তবেই সে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে মোহরানা মাফ করে দিয়েছে।'[৩]

উল্লেখ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে মোহরানা সহবাসের পূর্বেই আদায় করে দেওয়া কাম্য।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এক ফতোয়ায় লিখেছেন, 'সম্ভব হলে সহবাসের পূর্বেই পুরো মোহরানা আদায় করে দেওয়া উত্তম।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'সালাফে সালেহীন সহবাসের পূর্বেই পুরো মোহরানা আদায় করে দিতেন। সামান্য অংশও তাঁরা বিলম্বে আদায় করতেন না।'[৪]

---

১. আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ূ, ২৭৮১)। এই হাদীসের মান নির্ণয় সম্পর্কে ইমাম মুনযিরী রহ. বলেছেন- رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات

২. মুসনাদে আহমদ : ১৫৪৮৮। এই হাদীসের হুকুম সম্পর্কে মুহাক্কিক টীকায় উল্লেখ করেন, هذا صحيح لغيره مقطعا

৩. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ২/২৯৮

৪. মাজমুআতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ৩২/১২২-১২৩

والأولى تعجيل الصداق كله قبل الدخول إن أمكن ..... وقد كان السلف يعجلون الصداق كله قبل الدخول لم يكونوا يؤخرون منه شيئا....الخ

অন্যত্র লিখেছেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঋণের ন্যায় মোহরানাও অনাদায়ী হিসাবে লিখে রাখা হতো না। বরং সে সময়ে পুরো মোহরানাই নগদ আদায় করে দেওয়া হতো।'[১]

অবশ্য নগদ আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে, পাত্রীপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাকিতেও আদায় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য ঋণের ন্যায় কবে তা আদায় করা হবে তাও সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। আদায়ের তারিখ লিখিত হওয়াও কাম্য।

কনের বাড়িতে বরযাত্রী যাওয়ার হুকুম

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। ইসলামী শরীয়াহ্ কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। বর্তমানে বিবাহের ক্ষেত্রে বরযাত্রার বিষয়টিও বাড়াবাড়ির শিকার।

বরের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বরের সাথে বিশাল একটা দল কনের বাড়িতে যায় এবং কনেপক্ষ তাদের আপ্যায়ন করে। এদেরকে আমাদের সমাজে বরযাত্রী বলা হয়ে থাকে।

বিয়ের পর ছেলেপক্ষ ওলীমার অনুষ্ঠান করে মেহমানদেরকে খাওয়ানোর কথা হাদীসে পাওয়া যায় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ওলীমা করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও ওলীমা করতে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কনেপক্ষ বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কথা না হাদীসে পাওয়া যায়, না সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর প্রচলন ছিল।

বর্তমান সমাজে কনেপক্ষের জন্য বরযাত্রীদের খাওয়ানোকে জরুরি মনে করা হয়। বরযাত্রী বিয়েতে না থাকলে তিরস্কার করা হয়। সমাজে তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কনেপক্ষ বাধ্য হয়েই অনুষ্ঠান করে। এমন কী সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও অনুষ্ঠান করে, যা তাদের ওপর জুলুম হয়ে যায়। এভাবে অনুষ্ঠান করে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করানোর জন্য কনেপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করা শরীয়াহ্ সমর্থন করে না। এটি সমাজে একটি অপছন্দনীয় কাজ যা পরিত্যাগ করা জরুরি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

অর্থ : কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিত বৈধ নয়।[২]

তবে যদি বিয়ের সময় কনেপক্ষের বাড়িতে বরের সাথে তার বাবা, চাচা বা অন্যান্য দু'চারজন মেহমান যায়, তবে তাদের আপ্যায়ন করা যাবে।[৩]

---

১. মাজমুআতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ৩৩/১৫৮
২. মুসনাদে আহমাদ : ২৪/২৩৯
৩. ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১১/২২৯

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করা

শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য পাত্র-পাত্রী একই মজলিসে দু'জন শরয়ী সাক্ষীর (দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা) উপস্থিতিতে তাদের শুনিয়ে ইজাব কবুল করাই যথেষ্ট। বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য উক্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।[২]

তবে রেজিস্ট্রেশন বিবাহের একটি লিখিত প্রমাণপত্র, যা উক্ত বিবাহের নিরাপত্তার জন্য সরকার বাধ্যতামূলক করেছে। যেহেতু বিবাহের চুক্তির মধ্যে মোহরের লেনদেন আছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোহরের কিছু পরিমাণ বাকিও থাকে। তাই তা লিখিত আকারে থাকা উত্তম। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

﴿يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ﴾

> **অর্থ :** হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে নাও।[৩]

রেজিস্ট্রেশন না করলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বিভিন্ন আইনী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করে নেওয়া চাই।

বিয়েতে কাবিন রেজিস্ট্রি করাঃ শরয়ী দৃষ্টিকোণ

আমাদের দেশে বিয়েতে কাবিন রেজিস্ট্রি করার প্রচলন রয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটুকু জরুরি?

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে একই মজলিসে দু'জন শরয়ী সাক্ষীর সামনে ঈজাব-কবুলে করলে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু যে কোন বৈধ চুক্তি লিখিত হওয়া

---

১. সুনানে নাসায়ী : ২/৭৭

২. আল হিদায়া : ২/৩০৫-

ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي.

৩. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

শরীয়তে কাম্য। সে হিসেবে একটি সুন্নাহভিত্তিক বিয়ের জন্য আরো কিছু কার্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন,

১. মোহর ধার্য করা ।
২. মোহর নগদ কত শোধ হলো আর বাকি থাকল কত তা লিখিত হওয়া।
৩. বিয়ের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর দস্তখত করা।
৪. স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়া হলো কিনা তা লিখিতভাবে উল্লেখ থাকা।

উপর্যুক্ত কাজগুলো বর্তমান কাবিননামার মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়ে থাকে। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লিখিতভাবে কাবিন রেজিস্ট্রি হওয়া যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে জরুরি তেমনই শরীয়তও এর প্রতি উৎসাহিত করে।[১]

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে নাম ধরে ডাকা

স্বামী তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে নাম ধরে ডেকেছেন।[২]

তবে স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে না ডাকাই ভালো। সালাফে-সালেহীন থেকে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত

শ্বশুর-শাশুড়ি যতদিন জীবিত থাকবেন, পুত্রবধূ তাদের খেদমত ও আনুগত্য করে যাবে। তাদের সাথে কথাবার্তা ও উঠা-বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ রাখবে।

তাদের খেদমত করা আইনত যদিও পুত্রবধূর দায়িত্ব নয় বরং ছেলের দায়িত্ব। তবে ছেলে যেহেতু স্ত্রী-সন্তানের রুজি-রোজগারের জন্য বাইরে কাজ করতে হয়, তাই স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব দাঁড়ায় তাদের খেদমত করা। আর এটি জানা কথা যে, আইনের শুষ্ক পথে দাম্পত্যের জীবনতরি বয়ে যায় না। শুধু আইনের অধিকার দ্বারা সংসারে শান্তি আসে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চোর-পুলিশের মতো আইনের সম্পর্ক নয়। বরং দুটি হৃদয়ের সম্পর্ক। এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায়। নৈতিক ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। তাই স্বামীকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার দাবি এটাই যে, স্বামীর পিতা-মাতাকেও স্ত্রী ভালোবাসবে। স্বেচ্ছায় তাদের খেদমত করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে। এটিই সুন্নাহ। অর্থাৎ ঘরের যাবতীয় কাজ করবে স্ত্রী। আর বাইরের কাজ করবে স্বামী। এভাবে উভয় দিকে ভারসাম্য থাকতে হবে।[৩]

নিম্নে এ বিষয়ে বিখ্যাত দুজন মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো,

---

১. কিতাবুল আছল : ১০/২০৯। রাদ্দুল মুহতার : ৪/৭৬। ইমদাদুল মুফতিয়ীন : ৪৩৮। ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ : ৭/৮৫। ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ : ১০/৬০১
২. সহীহ বুখারী : ২০১৩
৩. ইসলাম আওর হামারে যিন্দেগী : ৫/১০৫-১০৮

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর নসীহত

এ বিষয়ে আমাদের দেশের নিকট অতীতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. এদেশের মেয়েদের উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত মূল্যবান নসিহত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শাশুড়ির আদব করিও এবং সর্বাবস্থায় তাহার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করিও।

তোমার শাশুড়ি যদি কোনো কাজে তোমাকে তাম্বীহ (সতর্ক) করেন, তবে উহা নীরবে শুনিও। যদি উহা মনের বিপরীত হয় এবং কটু কথাও বলেন, যাহা আশা করা যায় না, তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান কর। সহ্য কর। খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতিউত্তর করিও না।

নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁহার খেদমত করিও। আর মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তাজিম ও শ্রদ্ধা করো। শাশুড়ির বেলায় যে সব আদব-কায়দা লিখিয়াছি, শ্বশুরের বেলায়ও সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। শ্বশুর বাড়ির কোনো মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড়ো হয় যেমন, স্বামীর বড়ো ভায়ের বিবি। তবে তাহার সাথে কথাবার্তা, উঠা-বসায় তাঁহার মর্তবার প্রতি লক্ষ রাখিও।

তাঁহার সাথে দুধ-মিশ্রির মতো এমনভাবে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিও যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নিদ্বয়-একজন বড়ো ও একজন ছোট। যদি তুমি এমন ব্যবহার কর, তবে অপরপক্ষও তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করিবে।

আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তাহার সাথে স্নেহ-মহব্বত সুলভ ব্যবহার কর। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী ভাগিনী ইত্যাদির সাথে যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্ভ্রম ও নম্র ব্যবহার কর।'[১]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.-এর ফতোয়া

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. (মৃ. ১৪২১হি.)। পাকিস্তানের নিকট অতীতের প্রথিতযশা আলেম। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'দৈনিক জঙ্গ'-এর ইসলামী পাতা 'ইক্বরা'-এর সাপ্তাহিক আয়োজন 'আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল' (আপনার জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর)-এর লেখক। ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০০ সালের মে মাস পর্যন্ত। মোট ২৩ বছর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাতে ইসলামের আলোকে মানুষের বিভিন্ন সমাধান পেশ করেছেন। পরবর্তীতে 'আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল' উক্ত প্রশ্ন-উত্তরগুলোর স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশিত হয়।

তাতে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে 'শ্বশুর-শাশুড়ি ও পুত্রবধূর আচরণবিধি' নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। পাঠকদের জন্য প্রশ্ন ও উত্তরসহ আলোচনাটির হুবহু তরজমা পেশ করা হলো,

---

১. আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. গ্রন্থাবলী : ২/৯৯

প্রশ্ন : শ্বশুর-শাশুড়ির সম্মান পুত্রবধূ কীভাবে করবে? কুরআন-হাদীসের আলোকে বলুন। দেখা যায় রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি ঘরকন্যার বিভিন্ন কাজে পদে পদে শাশুড়ি পুত্রবধূকে দোষারোপ করে। এমন হলে পুত্রবধূ কি শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করতে পারবে?

উত্তর : শ্বশুর-শাশুড়ি হলো পিতা-মাতার স্থানে। তাই পুত্রবধূর নৈতিক ও চারিত্রিক দায়িত্ব হলো, নিজ পিতা-মাতার সম্মান যেভাবে সে করে, তেমনি শ্বশুর-শাশুড়ির সম্মানও করবে। বরং নিজ পিতা-মাতার চেয়েও স্বামীর পিতা-মাতাকে অধিক সম্মান দেবে। আর শ্বশুর-শাশুড়িও পুত্রবধূকে নিজ কন্যার চেয়ে বেশি স্নেহ করবে।

কিন্তু আফসোস হলো, বাস্তবে এমন হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূকে মেয়ের মতো স্নেহ করে না। সম্মান দেয় না। যদ্দরুন পুত্রবধূও তাদেরকে আপন পিতা-মাতার জায়গায় রাখে না।

মূলত বধূর এমন আচরণে তার ত্রুটি কম। বরং বধূর মা ও শাশুড়ির অবহেলা ও ত্রুটিই বেশি। আপন মায়ের সঠিক শিক্ষা ও তরবিয়তের অভাব আর শাশুড়ির যন্ত্রণাদায়ক আচরণে বধূ এ ধারণা করতে বাধ্য হয়, শাশুড়ি আস্ত একটি রাক্ষুসে-ডাইনি।

আর ঘরকে মনে করে এক জীবন্ত জেলখানা। নতুন পরিবার, নতুন ঘরে ভালোবাসার স্নিগ্ধ সৌরভ অনুভবে ব্যর্থ হয়। বরং চারদিকে কেবল ঘৃণা, কথায় কথায় দোষ ধরা, খোঁচা দেওয়ার দুর্গন্ধই অনুভব হয়।

সার্বিক অবস্থার কারণে বধূর মনে হয়, এ যেন জান্নাত থেকে বের করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো। এসব যন্ত্রণা ও ভাবনায় তাড়িত হয়ে সর্বশেষ বধূ স্বামীর সাথে বিদ্রোহ করে বসে। ভিন্ন ঘরে থাকার জোর দাবি তুলে।

পুত্রবধূ ও শ্বাশুড়ির এমন স্নায়ুযুদ্ধ ও লড়াই খতম করার সমাধান একটাই। তা হলো, বাঘ ও ছাগলকে এক ঘাটে বাধার মতো বোকামি না করা। সুতরাং উভয়ের চুলা ও থাকা আলাদা করে দিতে হবে।

শ্বশুর-শাশুড়ি বিশেষ করে শাশুড়ি যদি ভদ্র ও বুদ্ধিমান হয়, তবে মিষ্টি কৌশলে বধূ থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে যা খেদমত নেওয়ার নিতে পারে। এটি বধূর পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনি শ্বশুর-শাশুড়ির উত্তম চরিত্রের নিদর্শনও বটে। কিন্তু তা না করে বধূকে যদি ক্রয়কৃত দাসী মনে করা হয়। এরপর ধমক ও জোরজবরদস্তি করে খেদমত নেওয়া হয়, তবে তা না ইসলামে জায়েয, না নৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ।'[১]

---

১. আপ কে মাসায়েল আওর উন কা হল : ৬/৩৪৪

অ্যাপস ভিত্তিক প্রচলিত রাইডিং পদ্ধতি: শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ

শুরু কথা

মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে জীবন চলাকে সহজ করতে। খুব সহজে ও দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে। এক সময় দূর আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে চিঠি লিখতে হতো। চিঠি ছাড়া যোগাযোগের তেমন কোনো মাধ্যম ছিল না। এখন মোবাইলে বাটন টিপলেই যোগাযোগ করা যায়। প্রিয় মানুষটিকে দূর থেকে দেখাও যায়। এভাবে নানা উপায়ে মানুষ জীবনকে সহজ করে তুলতে নিত্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই আধুনিক অগ্রযাত্রায় ইদানীং নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বিশেষ কিছু অ্যাপসের মাধ্যমে। রাইডিং বা অনলাইন পরিবহন সেবা এর একটি। বর্তমানে গাড়ির জন্য রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় না। বাসায় বা অফিসে বসেই অ্যাপসের মাধ্যমে গাড়ি কনফার্ম করা যায়। এরপর অল্প সময়ে খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়। যেমন আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ কয়েকটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপস হলো- পাঠাও, উবার, সহজ, ওভাই, ওবোন ইত্যাদি। এসবের মধ্যে আমাদের ঢাকা শহরে পাঠাও ও উবার বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এসব নানা আবিষ্কার মৌলিকভাবে ভালো ও প্রশংসিত। এতে মানুষের সময় বেঁচে যায়। তবে একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে নতুন আবিষ্কৃত যেকোনো কিছু ব্যবহারের আগে এর শরয়ী নির্দেশনাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যেন ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের অজান্তে শরীয়াহ্ পরিপন্থি কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়ি। এটিই ওই হাদীসের মর্ম, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-“ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয” ।[১]

ইমাম বুখারী রহ. ‘সহীহ বুখারীতে’ একটি শিরোনাম দিয়েছেন, "باب العلم قبل العمل" অর্থাৎ ‘কোনো কাজে যোগদানের পূর্বে সে সম্পর্কে শরয়ী বিধানাবলি জেনে নেওয়া

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪

উচিত।' এরপর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্ এতৎসংশ্লিষ্ট কিছু দলিল উল্লেখ করেছেন।[১]

মোটকথা, কোনো কিছু করার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়াহ্ নির্দেশনা জানার বিকল্প নেই। বিশেষত যখন এমন বিষয় হয়, যাতে অনেক শরীয়াহ্ নির্দেশনা জড়িত রয়েছে। অথচ সে বিষয়ে খুব বেশি একটা শরীয়াহ্ চর্চা নেই, তখন সেটার শরীয়াহ্ জানার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। প্রচলিত অ্যাপস ভিত্তিক রাইডিং পদ্ধতি মূলত এমনই একটি বিষয়, যে বিষয়ে আমাদের সমাজে শরীয়াহ্ নির্দেশনা জানার চর্চা তেমন একটা নেই। তাই এ বিষয়ে শরীয়াহ্র আলোচনা সময়ের অন্যতম দাবি।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সংক্ষেপে প্রচলিত অ্যাপসভিত্তিক রাইডিং পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে শরীয়াহ্ আলোচনা করা হয়েছে।

এ সকল বিষয়ে শরীয়াহ্ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা রাইডিং অ্যাপসগুলোর নীতিমালা, শর্তসমূহ যেমন অধ্যয়ন করেছি, তেমনি যারা এসবের সাথে বাস্তবে সম্পৃক্ত তাদের একাধিক লোকের সাথেও কথা বলেছি। জেনারেল তথ্যগুলোর ব্যাপারে তারা একমত পোষণ করেছেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে শরীয়াহ্ পর্যালোচনা যেন সঠিক ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

গবেষণা করতে গিয়ে আমরা প্রচলিত প্রায় সবগুলো রাইডিং অ্যাপসই পর্যালোচনা করেছি। তবে বিশেষভাবে 'উবার ও পাঠাও'-এর ওপর দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ ছিল। কারণ বর্তমানে এ দুটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃত।

প্রকাশ থাকে যে, বক্ষ্যমাণ গবেষণায় প্রচলিত রাইড শেয়ারিং অ্যাপগুলোর কেবল বর্তমান বহুল প্রচলিত মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোনো পদ্ধতি সামনে এলে বা আলোচিত কোনো পদ্ধতি পরিবর্তন বা আপডেট হলে এর শরয়ী সমাধান বিজ্ঞ কোনো মুফতি সাহেব থেকে জেনে নেওয়া জরুরি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ শ্রম কবুল করুন। আমীন।

অ্যাপস, রাইডিং : পরিচিতি ও পদ্ধতি

অ্যাপ পরিচিতি

'অ্যাপ' শব্দটি ইংরেজি (App)। বহুবচন: অ্যাপস (Apps)। এটি মূলত "অ্যাপ্লিকেশন" (Application) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Application শব্দের **অর্থ** : A formal (often written) request for something, such as a job, permission to do something.[২] অর্থাৎ চাকরি বা কোনো কিছু করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আবেদননামা। অথবা কোনো কিছু করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা। এটি সাধারণত লিখিত হয়ে থাকে।

---

১. বিস্তারিত দেখুন : ফাতহুল বারী খ.১, পৃ.২১১
২. Oxford Learner's Dictionaries

শব্দটির আরেকটি **অর্থ** : Computing : a program designed to do a particular job.[১] অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু করার জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম ডিজাইন করা। এ অর্থেই Application থেকে 'অ্যাপ'(App) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর দ্বারা মূলত বিশেষ সফটওয়্যার বুঝানো হয়। সুনির্দিষ্ট বিশেষ কাজের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়। 'অ্যাপ' ও 'সফটওয়্যার' প্রায় অভিন্ন। তবে বর্তমানে অতি আধুনিক সফটওয়্যার বা কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলোকে সাধারণত 'অ্যাপ' বলা হয়। এটি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যেমন, মোবাইলে পরিচালনার জন্য মোবাইল অ্যাপ, কম্পিউটারে কাজ করার জন্য কম্পিউটার অ্যাপ ইত্যাদি। সাধারণত মোবাইল অ্যাপগুলো ব্যবহার করা অনেক সহজ।

বর্তমানে অনলাইন পরিবহন সেবাগুলো মূলত বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। উবার, পাঠাও ইত্যাদি মূলত মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন থাকলে গুগল প্লে-স্টোর থেকে সহজেই এই অ্যাপগুলো ডাউনলোড করে অনলাইন পরিবহন সেবা পাওয়া যায়।

রাইডিং পরিচিতি

রাইডিং (Riding) মানে বাহনে চড়া।[২] যিনি বাহন নিয়ন্ত্রণ করেন বা চালান, তাকে 'রাইডার' (Rider) বলা হয়।[৩]

যাই হোক, এখানে মৌলিকভাবে দুটি পক্ষ থাকে। যথা- যাত্রী ও চালক (রাইডার), নিম্নে পৃথক পৃথক দুটি পক্ষের পরিবহন সেবা আদান-প্রদানের পরিচিতি ও পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

গ্রাহক যেভাবে এ সেবা পেয়ে থাকে

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অনলাইন পরিবহন সেবা পেতে হলে প্রথমেই ইন্টারনেটের সাহায্যে 'এন্ড্রয়েড স্মার্টফোনের' 'গুগল প্লে-স্টোর' থেকে নিজের পছন্দমাফিক যেকোন একটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। যেমন উবার, পাঠাও প্রভৃতি অ্যাপ খুব সহজেই ডাউনলোড করা যায়।

অ্যাপ ডাউনলোড সম্পন্ন হওয়ার পর সেটা সচল করার জন্য, যাত্রীকে তার ব্যক্তিগত তথ্য অর্থাৎ নাম, ফোন নাম্বার ইত্যাদি কিছু বেসিক তথ্য ওই ডাউনলোডেড অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হয়। এসব তথ্য রাইডারের জন্য যাত্রীকে

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত

চিনতে সুবিধা করে দেয়। এটি যথাযথভাবে পাঠানোর পরই অ্যাপটি সচল হয় বা অ্যাপ ব্যবহারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়।

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে অ্যাপটি ব্যবহার উপযোগী হয়ে যাবে। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে যাত্রী রাইড শেয়ারিং সুবিধা নিতে পারেন। রাইড শেয়ারিং সুবিধা নেওয়ার জন্য অ্যাপে গিয়ে নির্ধারিত স্থানে কোথায় যাবে (Destination), কোথায় থেকে যাবে (Pickup) এ দুটি তথ্য স্পষ্ট করে লিখতে হবে। এ জন্য প্রথমেই মোবাইলে জিপিএস (Global Positioning System) লোকেশন অপশন অন বা চালু রাখতে হবে। এ দুটি তথ্য প্রদানের পর পছন্দের বাইক, কার বা অন্যান্য বাহন নিবার্চন করা যাবে।

এসব তথ্য প্রদানের পর যানের ভিন্নতা এবং গন্তব্যের দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া প্রদর্শিত হয়। স্বাভাবিকভাবে মোটরসাইকেলের ভাড়া প্রাইভেটকারের চেয়ে কিছুটা কম হয়ে থাকে। এই প্রদর্শিত ভাড়া সব সময় চূড়ান্ত হয় না। এটি অনেকটা প্রাথমিক হিসাব। গন্তব্যে পৌছার পর চূড়ান্ত ভাড়া প্রদর্শিত হয়। তবে প্রাথমিক ভাড়ার সাথে এর তফাত সাধারণত খুব বেশি হয় না।

ভাড়ায় যাত্রী সন্তুষ্ট হলে এবার অ্যাপের একটি নির্দিষ্ট বাটন প্রেস করে 'পিক-আপ রিকুয়েস্ট' পাঠাতে হয়। এই রিকুয়েস্টটি মূলত পাঠানো হয় নির্ধারিত অ্যাপ কর্তৃপক্ষের নিকট। অ্যাপ কর্তৃপক্ষ তখন তার বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনকারীর কাছাকাছি অবস্থানরত রাইডারদের মধ্যে যার পার্সোনাল রেটিং বেশি থাকে, সেই ব্যক্তির নিকট রিকুয়েস্টটি পাঠিয়ে দেয়। তিনি রিকুয়েস্ট রিজেক্ট করলে তখন অপর রাইডারের নিকট পাঠানো হয়।

আর রিকুয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলে উক্ত রাইডারের যাবতীয় তথ্য যাত্রীর কাছে চলে যায়। রাইডারের নাম, ছবি, মোবাইল নম্বর, যানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং অনেক অ্যাপে রাইডারের যানের নাম, মডেল নাম্বার ইত্যাদিও যাত্রীর অ্যাপে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া রাইডারের একটি পার্সোনাল রেটিং থাকে, যা যাত্রী দেখতে পান।

এরপর সাধারণত রাইডার ফোন দিয়ে যাত্রীর সাথে কন্ট্রাক্ট বা যোগাযোগ করে ভাড়াচুক্তি চূড়ান্ত করেন। আবার কখনো রাইডার ফোন করা ছাড়াই যাত্রীর পিক-আপ লোকেশন দেখে তার কাছে পৌঁছে যান এবং সেখানে গিয়ে সরাসরি যাত্রীর সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেন। এরপর যাত্রীকে নিয়ে রাইডার রওয়ানা হন। যাত্রী গাড়িতে উঠার পর রাইডার অ্যাপের 'রাইড স্টার্ট' বাটনে ক্লিক করেন। তখন থেকেই ভাড়া কাউন্ট শুরু হয়।

রাইড শেয়ারিং সেবা যেভাবে প্রদান করা হয়

"রাইড শেয়ারিং" বলতে বুঝানো হয়, নির্ধারিত অ্যাপের সাহায্যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেউ তার মোটর যান বা গাড়ি দিয়ে কাউকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার সেবা প্রদান করা। সহজে একে 'অনলাইন পরিবহন সেবা'ও বলা হয়।

রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানের জন্য একজন রাইডারকে যেকোনো একটি রাইড শেয়ারিং কোম্পানিতে রেজিস্ট্রেশন করে উক্ত কোম্পানির রাইডার হতে হয়। রেজিস্ট্রেশন করতে রাইডারের প্রয়োজন হয় একটি মোটরযান। সেটি মোটর সাইকেল, প্রাইভেট কার বা অন্যান্য বাহনও হতে পারে। নিজের হতে পারে, আবার কারো থেকে ভাড়ার বিনিময়েও হতে পারে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে হয়। কোনো কোনো রাইড শেয়ারিং অ্যাপ কোম্পানি প্রাথমিকভাবে তাদের ট্রেইনিং সম্পন্ন করাও বাধ্যতামূলক করে থাকে।

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর রাইডারদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তৈরি একটি অ্যাপ পূর্বোক্ত নিয়মে ডাউনলোড করে নিতে হয়। এই অ্যাপটি কেবল রাইডার পায়, যাত্রী নয়। যাত্রীদের অ্যাপস আলাদা। রাইডার অ্যাপ ডাউনলোড করার পর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ পাঠানোর মাধ্যমে রাইড প্রদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। যে রাইড শেয়ারিং অ্যাপের অধীনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে তার মাধ্যমে এখন রাইডার তার আশেপাশের যাত্রীদের রিকুয়েস্ট পাবেন।

রিকুয়েস্ট পাওয়ার সময় সাধারণত একজন রাইডার যাত্রীর পিক-আপ লোকেশন এবং গন্তব্য দেখতে পারেন। উবারে শুধু রিকুয়েস্ট যাওয়ার মাধ্যমে রাইডার যাত্রীর গন্তব্য দেখতে পারে না। তবে রিকুয়েস্ট পাঠানোর মাধ্যমে কেবল যাত্রীই তার সম্ভাব্য ভাড়া দেখতে পারে, রাইডার নয়। মূলত এসব তথ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অ্যাপস অনুযায়ী কিছু পার্থক্য হয়ে থাকে।

অ্যাপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিকুয়েস্ট পাওয়ার পর রাইডার চাইলে সেই রাইড অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন, আবার ক্যান্সেলও করতে পারেন।

রাইডার রিকুয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর সাধারণত যাত্রীকে ফোন করেন এবং ফোনে কথা বলে চুক্তি চূড়ান্ত করেন। আবার কখনো রাইডার ফোন করা ছাড়াই যাত্রীর পিক-আপ লোকেশন দেখে তার কাছে পৌঁছে যান এবং সেখানে গিয়ে সরাসরি যাত্রীর সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেন।

যাত্রী এবং রাইডার সাধারণত উভয়েই একে অপরকে অ্যাপে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে নিতে পারেন।

ফোনে কনফার্ম হওয়ার পর অথবা রাইডার পিক-আপ পয়েন্টে আসার পর যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করেন। এই সময়ে রাইডার 'ওয়েটিং বাটনে' ক্লিক করে রাখেন। যাত্রী আসার পর যাত্রীকে বাহনে উঠিয়ে "রাইড স্টার্ট" নামের একটি বাটনে ক্লিক করেন এবং তখনই বাস্তবে রাইড শেয়ারিং অর্থাৎ যাত্রা শুরু হয়। (প্রবন্ধ লেখার সময় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে লেখা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে।)

রাইড শেয়ারিং অ্যাপে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

রাইড শেয়ারিং কোম্পানি বা অ্যাপ কর্তৃপক্ষ মূলত একজন মধ্যস্থতাকারী। তাদের নিজস্ব কোনো গাড়ি নেই। তারা কেবল অ্যাপের মাধ্যমে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। যেখানে এক দিকে রাইডার থাকে, অপর দিকে যাত্রী তার পছন্দানুযায়ী রাইডার পছন্দ করে পরিবহন সেবা গ্রহণ করে। অবশ্য ইদানীং 'ওভাই' কোম্পানি তার নিজস্ব যানের জন্যও মাঝেমধ্যে রাইডার নিয়োগ দিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে রাইডার থেকে অ্যাপ কর্তৃপক্ষ একটা ভাড়া নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ কয়েকটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ/কোম্পানির পরিচয়

উবারঃ উবার (UBER) হলো স্মার্টফোন-মোবাইলের মাধ্যমে অ্যাপ ভিত্তিক পরিবহন সেবার নেটওয়ার্ক। এটি একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন পরিবহন সেবা। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সর্বপ্রথম আমেরিকা থেকে উবারের কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পৃথিবীর ৬৩টি দেশ ও ৭৮৫টিরও বেশি শহরে উবারের সেবা চালু আছে। ২০১৬ সালে ২২ নভেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় বিশ্বখ্যাত অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহন সেবা উবারের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে উবারের রাইড-শেয়ারিং সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইন পরিবহন নেটওয়ার্ক কোম্পানি উবারের নিজস্ব কোনো মোটরযান নেই। উবারের কিছু নির্ণায়ক যোগ্যতা রয়েছে, সেগুলো পূরণ করে ব্যক্তিগত গাড়ি আছে এমন যে কেউ উবার টিমে রাইডার হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। উবারের ফ্রি অ্যাপটির মাধ্যমে একজন যাত্রী নিজের অবস্থান জানিয়ে রাইডারের সাথে যোগাযোগ করে ট্যাক্সি বা অন্যান্য পরিবহন ডেকে আনতে পারেন।[১]

পাঠাও : পাঠাও (Pathao) উবারের মতোই একটি অনলাইন পরিবহন সেবা। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে এর প্রতিষ্ঠা ও সূচনা এবং বাংলাদেশেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান ৩ শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে রাইড শেয়ারিং সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের কিছু উপশহরেও তাদের সেবা পাওয়া যায়। এক তথ্য মতে, সারা দেশে 'পাঠাও'-এর ২০ লাখেরও বেশি নিবন্ধিত যানবাহন আছে। মার্চ ২০১৮ এর হিসাব মতে 'পাঠাও'-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। বর্তমানে সেটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ মিলিয়নেরও বেশি। আর তাদের বর্তমান সফল ট্রিপ বা অর্ডারের সংখ্যা ৭০ মিলিয়নেরও বেশি। অবশ্য সম্প্রতি পাঠাও বাংলাদেশের বাইরে নেপালেও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[২]

---

১. উইকিপিডিয়া থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে
২. UNB (United News Of Bangladesh) ২৪ অক্টোবর ২০২০

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পাঠাও একটি জনপ্রিয় রাইড শেয়ারিং অ্যাপ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'পাঠাও'-ও বাইক, কার দুটি সেবাই প্রদান করছে। পরিবহন সেবার পাশাপাশি তারা ফুড ডেলিভারি, কুরিয়ার সার্ভিস, ফার্মেসি, শপিং ও ই-বাণিজ্য সেবাও প্রদান করে। তবে আমাদের শরয়ী আলোচনা শুধু পরিবহন সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সহজ: সহজ (Shohoz) উবার ও পাঠাও-এর মতোই একটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ। ২০১৪ সাল থেকে অনলাইনে টিকিট সেবা প্রদানের জন্য কাজ শুরু করে "সহজ"। প্রতি বছর বিশেষত ধর্মীয় উৎসবের সময় ঘরমুখো যাত্রীদের টিকিটের জন্য অবর্ণনীয় সমস্যা পোহাতে হয়। এ ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রম উভয়ই সাশ্রয়ের জন্য 'সহজে'র সৃজনশীল সেবাটি বাংলাদেশের গণমানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তারা যাত্রীদের জন্য সেবা বাড়ানোর ক্ষেত্রে রাইড শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেছিল, তবে বর্তমানে তাদের রাইড সার্ভিসটি বন্ধ আছে।[১]

ওভাই: (OBHAI) এটিও একটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ। তবে "ওভাই"-এর মাধ্যমে গাড়ি ও মোটর বাইক সুবিধার বাইরে সিএনজি গাড়ি নির্বাচনেরও সুযোগ আছে। অ্যাপ ভিত্তিক এ কোম্পানিটি শুধু নারীদের জন্য "ওবোন" (OBON) নামে আলাদা একটি সার্ভিসও চালু করেছে। তাছাড়া 'পিংক স্যাম' ও 'লিলি রাইড' নামেও ভিন্ন দুটি পরিবহন সেবা রয়েছে শুধু নারীদের জন্য।[২]

এগুলো হলো বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় অন-ডিমান্ড রাইড শেয়ারিং অ্যাপসমূহ। এ প্ল্যাটফর্মগুলো ছাড়াও ট্যাক্সিওয়ালা, গতি, চলো, আমার বাইক, আমার রাইড, ইজিয়ার, লেটস গো, মুভ, ডাকো, যাবো, গাড়িভাড়া, আসো যাই, যাত্রী, পার্লক্যাব, পিকমিসহ আরও কিছু রাইড শেয়ারিং সেবা রয়েছে।[৩]

এ হলো আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত কয়েকটি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বা কোম্পানির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এক তথ্য মতে বাংলাদেশে ১৬টি রাইড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে রেখেছে।[৪]

পরিসংখ্যান বলছে, বিগত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ঢাকার অর্ধেক রাস্তা দখল করেছে রাইড শেয়ারিং আওতাভুক্ত বাহন। এসব বাহনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর তথা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি (BRTA) থেকে নতুনভাবে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে ১২টি অ্যাপ কোম্পানিকে। সেগুলো হলো- পিকমি লি., কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লি., ওভাইসলিশনস লি., চালডাল লি., পাঠাও লি., ইজিয়ার টেকনোলজি লি.,

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত
৩. UNB (United News Of Bangladesh) ২৪ অক্টোবর, ২০২০
৪. সূত্র: দৈনিক নয়া দিগন্ত, বুধবার, ৬/৩/২০১৯ ইং

আকাশ টেকনোলজি লি., সেজেস্টো লি., সহজ লি., উবার বাংলাদেশ লি., বাডিলি এবং আকিজ অনলাইন লি.।[১] রাইড শেয়ারিং অ্যাপস পরিচালনার জন্য এসব কোম্পানি অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।

BRTA -এর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সালে সারা দেশে নতুন মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রি হয়েছে ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৫৪৫টি। এর মধ্যে শুধু রাজধানীতেই নেমেছে ১ লাখ ৪ হাজার ৬৪ টি। আর ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে সারা দেশে নতুন রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫০টি, যা বছর শেষে ৪ লাখ ১ হাজার ৪৫২-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছর তথা ২০২২ সালের প্রথম ছয় মাস নতুন মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রি হয়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার ২৩৭টি। BRTA- এর তথ্য অনুযায়ী সর্বমোট রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটর সাইকেলের সংখ্যা হলো ৩৭ লাখ ৯০ হাজার ১৪২টি।[২]

বোঝাই যাচ্ছে, অনলাইন পরিবহন সেবা দিন দিন বেড়েই চলছে।

পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা শরয়ী আলোচনা পেশ করব।

শরয়ী পর্যালোচনা

রাইডার ও গ্রাহকের মধ্যকার লেনদেন ও শরয়ী বিধান

এখানে বেশ কিছু বিষয়ে শরীয়াহ্ পর্যালোচনা পেশ করা হবে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আলোচনা করা হলো-

রাইডার ও গ্রাহকের মধ্যকার শরয়ী সম্পর্ক নির্ণয়

গ্রাহক কর্তৃক অ্যাপের সাহায্যে রাইডারকে রিকুয়েস্ট সেন্ড করা ও রাইডার কর্তৃক তা গ্রহণ করার পর তাদের পরস্পর ফোনালাপের মাধ্যমে মূলত ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় পক্ষের মাঝে ইজারা বা ভাড়াচুক্তি সংগঠিত হয়। অর্থাৎ, ভাড়াচুক্তির মাধ্যমে রাইডার গ্রাহককে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মোটরযান বা গাড়ির সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার সেবা প্রদান করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি একটি ইজারা-চুক্তি। এক্ষেত্রে রাইডার হলো 'মুজির' অর্থাৎ ভাড়াদাতা। আর গ্রাহক হলো 'মুসতাজির' অর্থাৎ ভাড়া-গ্রহীতা। আর ভাড়াকৃত বাহনটি হল 'মুসতাজার ফিহি' অর্থাৎ ভাড়াকৃত বস্তু। যেহেতু এটি একটি ইজারা-চুক্তি, তাই ইজারা সংক্রান্ত শরীয়াহ্ মূলনীতির আলোকেই এর শরয়ী বিশ্লেষণ নির্ণীত হবে।[৩]

---

১. BRTA

২. দৈনিক নয়া দিগন্ত, বৃহ., ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং

৩. প্রচলিত রাইডিং সেবায় গাড়ি নির্দিষ্ট হওয়া, না হওয়া দুটির প্রচলনই আছে। 'ইজারাতুত দাওয়াব'-এ এর সুযোগ আছে। (মাজাল্লাতু আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা: ৫৩৮, ৫৩৯)

ইজারা বা ভাড়াচুক্তি কখন সম্পন্ন হয়?

দু'পক্ষের ইজাব-কবুলের মাধ্যমে ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হয়। আর যেকোনো চুক্তিতে দু'পক্ষের যেকোনো একজন থেকে প্রথম প্রস্তাব করাকে 'ইজাব' বলে। প্রস্তাবকারীকে 'ইজাবকারী' বলে। চাই সে ভাড়াদাতা/বিক্রেতা বা ক্রেতা/ভাড়া গ্রহীতা হোক। আর গ্রহীতা কর্তৃক সেই প্রস্তাব গ্রহণকে 'কবুল' বলে। প্রশ্ন হল, রাইড শেয়ারিং অ্যাপস পাঠাও, উবার ইত্যাদিতে ইজাব কবুল কখন সম্পন্ন হয়? এখানে কে প্রস্তাবকারী এবং কে গ্রহীতা? নিম্নে একটু বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো। এর সাথে পরবর্তী অনেক শরীয়াহ্ বিশ্লেষণ জড়িয়ে আছে-

বাস্তব অনুসন্ধানে যা দেখা গেছে, রাইডিং সেবা আদান-প্রদানের জন্য রাইড শেয়ারিং অ্যাপে যাত্রী, অ্যাপ কর্তৃপক্ষ ও রাইডার উক্ত তিন পক্ষ যৌথভাবে কাজ করে থাকে। যার ধারাবিন্যাস এরকম যে, সর্বপ্রথম যাত্রী অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপ কর্তৃপক্ষকে রাইড খুঁজতে রিকুয়েস্ট পাঠায়। অ্যাপ কর্তৃপক্ষ তার পক্ষে ওকীল (এজেন্ট) হয়ে রাইড খুঁজে দেয়।

এরপর যাত্রী ও রাইডার পরস্পর অবস্থান জানিয়ে ফোনালাপের মাধ্যমে ইজারা বা ভাড়াচুক্তি কনফার্ম করে। অর্থাৎ রাইড খুঁজে পাওয়ার পর প্রথমে দুপক্ষের যেকোনো একজন অপর পক্ষকে ফোন করে ইজারা বা ভাড়াচুক্তির প্রস্তাব করে। সাধারণত প্রথমে রাইডার ফোন করে থাকে। শরয়ী দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে রাইডার ফোন করে থাকলে এটি তখন তার পক্ষ থেকে ইজাব বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে প্রথমে যাত্রী ফোন করে থাকলে সেটাই ইজাব বলে বিবেচিত হবে। এরপর অপর পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব গ্রহণ করবে অর্থাৎ যে পক্ষ ফোন রিসিভ করে কনফার্ম করবে, তার পক্ষ থেকে সেটি কবুল ধরা হবে।

সারকথা হলো, ইউজার রাইড রিকুয়েস্ট পাঠানোর পর রাইডার ও ইউজারের পরস্পর ফোনালাপের মাধ্যমেই মূলত ইজাব কবুল সম্পন্ন হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, কখনো রাইডার যাত্রী কর্তৃক প্রেরিত রিকুয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর ফোন করা ছাড়াই যাত্রীর পিক-আপ লোকেশন দেখে তার কাছে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে সরাসরি যাত্রীর সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেন। এক্ষেত্রে রাইডার যাত্রীর নিকট পৌঁছানোর পর তাদের পারস্পরিক আচরণ বা কথার মাধ্যমে ইজাব-কবুল সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে যাত্রীর রিকুয়েস্ট পাঠানোটা ইজাব নয়; এটি মূলত রাইডার খুঁজার জন্য রিকুয়েস্ট করা হয়েছে। সেই রিকুয়েস্ট অনুযায়ী অ্যাপ কর্তৃপক্ষ রাইড খুঁজে দেয়। অ্যাপ কর্তৃপক্ষ যাত্রীর পক্ষ থেকে কেবল একজন এজেন্টের ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ওয়াকালাহ-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পূর্বোক্ত পন্থায় ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার পর রাইডার যখন যাত্রীকে রিসিভ করার জন্য আসেন, অথবা আসার পর চুক্তি করেন, তখন থেকেই মূলত ভাড়াকৃত বস্তুটি

অর্থাৎ, 'মুসতাজার ফিহি' ভাড়াগ্রহীতার কাছে ভোগ করার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হয়।

ফোনালাপে ইজাব কবুল: একটি সংশয় ও উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ইজাব কবুলের জন্য তো একই মজলিস (One spot) হওয়া জরুরি। অথচ রাইড শেয়ারিং অ্যাপে ফোনালাপে ইজাব কবুল সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেখানে বাহ্যত মজলিস বা এক বৈঠক পাওয়া যায় না। বরং ভিন্ন দুটি জায়গা থেকে দুই ব্যক্তি পরস্পর ফোনালাপের মাধ্যমে এ চুক্তি সম্পন্ন করে থাকেন। তাহলে এ চুক্তি সঠিক হয় কী করে?

ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়াচুক্তি ইত্যাদি আর্থিক লেনদেনে ইজাব কবুল সহীহ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সশরীরে একই মজলিসে (One spot) উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। বরং চুক্তির উভয়পক্ষ একই সময়ে ইজাব-কবুল সম্পন্ন করাই যথেষ্ট। একেই এক্ষেত্রে 'মজলিস' ধরা হয়। এক্ষেত্রে স্থান ভিন্ন হলেও কোনো সমস্যা নেই। অতএব ফোনালাপে যেহেতু একই সময়ে দুপক্ষের ইজাব কবুল সম্পন্ন হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে চুক্তির উভয়পক্ষের স্থান ভিন্ন হলেও মৌলিকভাবে চুক্তির মজলিস একই ধর্তব্য হবে এবং চুক্তি সঠিক হবে।

এ বিষয়ে 'ইসলামিক ফিক্হ একাডেমি ইন্ডিয়ার রেজুলেশন নিম্নরূপ:

مجلس سے مراد وہ حالت ہے جس میں عاقدین کسی معاملہ کو طے کرنے میں مشغول ہوں۔ اتحاد مجلس کا مقصد ایک ہی وقت میں ایجاب کا قبول سے مربوط ہونا ہے۔ اور اختلاف مجلس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایجاب وقبول میں ارتباط کا تحقق نہ ہوسکے۔

অর্থাৎ, মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি মুহূর্ত, যে মুহূর্তে চুক্তির উভয় পক্ষ কোনো একটি লেনদেন চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর এটি একই মজলিসে সংঘটিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একই সময়ে ইজাব-কবুল পাওয়া যাওয়া। আর মজলিস ভিন্ন হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একই সময়ে ইজাব-কবুল না পাওয়া যাওয়া।[১]

সারকথা হলো, রাইড শেয়ারিং অ্যাপসে যাত্রী ও রাইডারের কার্যত মজলিস বা বৈঠক ভিন্ন হলেও ইজাব কবুল যেহেতু একই সময়ে হচ্ছে, তাই ইজারা বা ভাড়াচুক্তি একই মজলিসে সংগঠিত হচ্ছে বলেই ধর্তব্য হবে। এতে শরয়ী দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই।

---

১. জাদীদ ফিক্হী মাবাহিস : খ:২১, পৃ. ২১৭

রাইড ক্যান্সেল করা

উবারে রাইড অর্ডার করার পর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তা বাতিল করার সুযোগ থাকে। যেমন, আপনি বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার জন্য উবারে রাইড অর্ডার করে কনফার্ম করেছেন। কিন্তু হঠাৎ কোনো কারণে আপনার অফিসে যেতে বিলম্ব হচ্ছে। তাই রাইডটি ক্যান্সেল করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি রাইড কনফার্ম করার পর থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা বাতিল করতে চান তাহলে কোনো অতিরিক্ত ফি ছাড়াই রাইড বাতিল করার সুযোগ পাবেন। তবে পাঁচ মিনিট অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর রাইড বাতিল করলে, আপনাকে পরবর্তী রাইডে ৩০ টাকা ক্যান্সেলেশন ফি হিসেবে অতিরিক্ত দিতে হবে। অ্যাপ কর্তৃপক্ষ এ টাকার একটি অংশ তখন ওই রাইডারের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়।

এছাড়া পাঠাও বা অন্য কোনো অনলাইন পরিবহন অ্যাপেও রাইড ক্যান্সেল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, বাইকে আরোহণের পর মনে হলো যেখানে যেতে যাচ্ছেন সেখানে আজ গেলে কোনো কাজ হবে না অথবা বন্ধের দিন ইত্যাদি। মোটকথা, বিভিন্ন কারণে রাইড ক্যান্সেল করা যেতে পারে।

লক্ষণীয় হলো, ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে রাইড ক্যান্সেলের অর্থ হচ্ছে ইজারাচুক্তি বাতিল করা। অর্থাৎ, কোনো চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তা রহিত করা। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনার দাবী রাখে। যথা-

ক. ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কোনো কারণবশত তা বাতিল করা যাবে কি না।
খ. রাইড ক্যান্সেলেশন ফি গ্রহণের শরয়ী দৃষ্টিকোণ।
গ. সঠিক শরয়ী বিকল্প।

নিম্নে প্রতিটি বিষয়ের ওপর শরয়ী আলোচনা করা হলো-

ক. ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কোনো কারণবশত তা বাতিল করা যাবে কি না?

ভাড়াচুক্তি যদি বৈধ হয় এবং ভাড়াকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সাধারণত ভাড়াচুক্তি আবশ্যক হয়ে যায়। কিন্তু এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভাড়াচুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া। তার কোনো ক্ষতি না হওয়া। যে উদ্দেশ্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেটা সফল হওয়া। তবে মাঝেমধ্যে এমন হয় যে, ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন উযর (Excuse) বা সমস্যার কারণে গ্রহীতাকে সেটা বাতিল করতে হয়, কখনো এমন সমস্যা উদ্ভূত হয় যে, চুক্তিটি নিজ থেকেই বাতিল হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। পূর্ববর্তী ফকীহগণ উক্ত দুটি বিষয়েই বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার আলোকে আমরা প্রচলিত অ্যাপস ভিত্তিক রাইড কনফার্ম করার পর তা ক্যান্সেল করার শরয়ী বিশ্লেষণ করতে পারি।

প্রথম বিষয়: নিজ থেকে ভাড়াচুক্তি বাতিল হওয়ার পর্যায়ে চলে যাওয়া। এটি সাধারণত তখনই হয় যখন ভাড়া চুক্তিটি একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য করা হয় এবং সেটা চুক্তিতে বলাও হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই উদ্দেশ্য আর বাকি থাকেনি। যেমন, বিয়ের খাবার পাকানোর জন্য বাবুর্চি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তারা দলবল নিয়ে এসেছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন দুলহান মারা গেল। তাহলে সেক্ষেত্রে খাবার পাকানোর চুক্তি নিজ থেকেই বাতিল হয়ে যাবে।[১] তদ্রূপ অনলাইন পরিবহনের মাধ্যমে উবার থেকে কার ভাড়া নেওয়া হলো। এক্ষেত্রে এমন উদাহরণ হতে পারে, ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর, দেখা গেল-গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা সরকারের বিশেষ আদেশে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি ভাড়া নেওয়া হয় এবং সেটা চুক্তিতে বলাও হয়, এরপর সেটা বাকি না থাকার বিষয়টি সুবিদিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়াচুক্তি নিজ থেকে বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয়: ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর এমন কোনো বিষয় উদ্ভূত হওয়া যে, ভাড়াচুক্তি বহাল রাখলে ভাড়াগ্রহীতা বা চালকের ক্ষতি হয়।[২] এক্ষেত্রে সেই ক্ষতি দূর করার জন্য ভাড়াচুক্তি নিজ থেকে বাতিল হবে না, বরং বাতিল করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতি হলো, যদি ক্ষতির বিষয়টি প্রকাশ্য হয় তাহলে গ্রহীতা নিজেই চুক্তি বাতিল করতে পারবে। পক্ষান্তরে তা প্রকাশ্য না হলে অপর পক্ষের সন্তুষ্টচিত্তে বাতিল করা যাবে।[৩]

উদ্ভূত কোনো সমস্যার কারণে যাত্রী কর্তৃক ভাড়াচুক্তি বাতিল করার মৌলিক অধিকারের বিষয়টি সালাফ থেকেও প্রমাণিত। বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত কাতাদাহ রহিমাহুল্লাহ এক ফতোয়ায় বলেছেন-

> فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء.
>
> এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোথাও যাওয়ার জন্য একটি বাহন ভাড়া করেছে, কিন্তু অগত্যা উদ্ভূত কোনো বিষয়ের কারণে সে যেতে অস্বীকার করছে। কাতাদাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, উদ্ভূত বিষয়টি যদি গ্রহণযোগ্য কোনো উযরের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়াচুক্তি বহাল রাখা আবশ্যক হবে না।[৪]

---

১. শরহুল মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসী রহিমাহুল্লাহ্, খ.২, পৃ.৫১৯। ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া খ.৪, পৃ. ৪৯৬। ফতওয়ায়ে কাযীখান : খ.২, পৃ.২৩১

২. আল মুহাল্লা : খ. ৮, পৃ. ১৮৭, মাসআলা নং. ১২৯১২

৩. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : খ. ৪ পৃ. ৪৯৬। ফতোয়ায়ে কাযীখান : খ. ২, পৃ.২৩১

৪. আল মুহাল্লা : ইবনে হাযাম আলী বিন মুহাম্মাদ, মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরী, বৈরুত, দারুল ইফাক্ব আল জাদীদিয়্যাহ : পৃ. ১৮৭, খ. ৮

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

ধরা যাক, যাত্রী বাইকে উঠার পর বৃষ্টি শুরু হলো। অথবা বাইক কনফার্ম করার পর বৃষ্টি শুরু হলো। তাহলে এক্ষেত্রে যাত্রী যদি মনে করে বৃষ্টিতে তার ক্ষতি হবে, তাহলে সে চাইলে নিজ থেকে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। কারণ বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে যাওয়া, ঠাণ্ডা লেগে ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।[১]

তদ্রূপ বাইক কনফার্ম করার পর দেখা গেল হেলমেট নেই। অথবা হেলমেট ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। তাহলে এক্ষেত্রে যাত্রী তা নিজ থেকেই বাতিল করতে পারে। কারণ হেলমেট না থাকার ক্ষতি বা ব্যবহার করতে না পারা স্পষ্ট একটি সমস্যা। আবার হেলমেট ছাড়া বাইকে চড়া আইনতও দণ্ডনীয়।

তদ্রূপ গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল বা চালক ভালো ড্রাইভ করতে পারে না। এসব কারণেও যাত্রী চুক্তি রহিত করতে পারে।[২]

তদ্রূপ আরেকটি কারণেও যাত্রী চুক্তি রহিত করতে পারে। যেমন, যাত্রী বাইক আগে দেখেনি। দেখার পর তার সেটা পছন্দ হয়নি। যেমন, বাইকের পাদান নেই, বসার সিট ভালো নয় ইত্যাদি।[৩]

তদ্রূপ যাত্রী অসুস্থ হয়ে গেল, তাহলেও একাকী চুক্তি রহিত করতে পারবে।[৪]

পক্ষান্তরে সে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যাচ্ছিল। কিন্তু উবারে উঠার পর তার মনে হলো আজ ইন্টারভিউ হবে না। এক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করতে চাইলে যাত্রী একা বাতিল করতে পারবে না। বরং চালকের সন্তুষ্টি লাগবে। কারণ ইন্টারভিউ হওয়া না-হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্য কোনো বিষয় নয়।[৫]

---

১. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, বৈরুত, দারুল ফিকির, খঃ ৪, পৃ. ৪৯৬, । শরহুল মাজাল্লাহ, খঃ ২ পৃঃ ৫১৮-৫২০। ফতোয়ায়ে কাযীখান খ. ২, পৃ. ২৩১

২. শরহুল মাজাল্লাহ : খ. ২ পৃ. ৬০৭

৩. শরহুল মাজাল্লাহ : খ. ২ পৃ. ৬০৬

৪. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : খ. ৪ পৃ. ৪৯৭

ইজারা-চুক্তি বাতিল করা বিষয়ে অন্যান্য মাযহাবঃ আল বায়ান, আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া আল ইয়ামানি আশ শাফেয়ী, মৃত্যুঃ ৫৫৮ হিজরী, জেদ্দা, দারুল মিনহাজ, পৃঃ ৩৬১, খঃ ৭। ও আল মুগনী, মুয়াফফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা হাম্বলী, মৃত্যু : ৬২০ হিজরী, বৈরুত, দারুল ফিকির, পৃ. ৩০, খ. ৬। আল মুহাল্লা, খ. ৮ পৃ. ১৮৭। কাযীখান খ. ২, পৃ. ২৩২

৫. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫; শরহুল মাজাল্লাহ : খ. ২, পৃ. ৫১৮-৫২০; ফতোয়ায়ে কাযীখান : খ. ২, পৃ. ২৩১

চুক্তি রহিত করা ও ভাড়া প্রদান

গাড়িতে উঠার পর বা কিছু দূর যাওয়ার পর চুক্তি রহিত হয়ে গেলে বা রহিত করা হলে সেক্ষেত্রে যতটুকু ব্যবহার করা হয়েছে এর ন্যায্য ভাড়া যাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি রহিত না করা হয়; বরং ক্ষতি বা দোষসহই গন্তব্যে পৌঁছা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লেখিত পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। যেমন, হেলমেট ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছা হলো। তাহলে এ কারণে ভাড়া কম দেওয়া যাবে না।[১]

বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম সুফইয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان؟ قال: له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه.

ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন ভাড়া নিয়েছে। কিছু দূর যাওয়ার পর তার সেই উদ্দেশ্য অন্যভাবে পূরণ হয়ে যায়। এখন লোকটি কী করবে? ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন- ওই ব্যক্তি যতটুকু পথ অতিক্রম করেছে, কেবল ততটুকু পথের ন্যায্য ভাড়া আদায় করবে।[২]

খ. রাইড ক্যান্সেলেশন ফি গ্রহণের শরয়ী দৃষ্টিকোণ

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ভাড়াচুক্তি কখনো নিজ থেকে রহিত হয়, কখনো যাত্রীর অধিকার থাকে নিজ থেকে তা রহিত করার। সুতরাং ব্যাপকভাবে চুক্তি রহিত করলেই এর জন্য ফি ধার্য করা সম্পূর্ণ অন্যায় হবে। এটি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির যেমন পরিপন্থি তেমনি শরীয়াহ্ পরিপন্থিও।[৩] তবে, যেক্ষেত্রে যাত্রী একা তা রহিত করতে পারে না, সেক্ষেত্রে তা রহিত করার জন্য চালকের সন্তুষ্টি লাগবে। অতএব, উবারের আলোচিত 'ক্যান্সেলেশন ফি' নীতি ব্যাপকভাবে সঠিক নয়।

---

১. শরহুল মাজাল্লাহ : খ. ২ পৃ. ৬০৭

২. আল মুহাল্লা : ইবনে হাযাম : আলী বিন মুহাম্মদ : মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরী, বৈরুত, দারুল ইফাক আল জাদীদিয়্যাহ : পৃ. ১৮৭, খ. ৮। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, খ. ৮, পৃ. ২১৩, নং- ১৪৯৩৬

৩. মনে রাখা চাই, শুধু ভাড়াচুক্তির কারণে (পূর্ণ বা আংশিক) ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায় না। বরং ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহারের জন্য অর্পণের পর থেকে। সুতরাং ভাড়াকৃত বস্তু অর্পণ ও ব্যবহারের আগেই চুক্তি রহিত করে দিলে এ জন্য কোনো প্রকার ভাড়া প্রদান আবশ্যক নয়।

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ-এর ৪৬৬ নং ধারায় আছে:

لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق، يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالاً.

আল্লামা খালেদ আতাসী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন:

هذا معنى قولهم: لا تملك الأجرة بالعقد كما في "البحر" والمراد بالعقد المطلق الذي لم يذكر فيه اشتراط تعجيل الأجرة. وإنما لا يلزم تسليم الأجرة حينئذ؛ لأن العقد وقع على المنفعة، وهي تحدث شيئا فشيئا، وشأن البدل أن يكون مقابلا للبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه. انتهى.

গ. সঠিক শরয়ী বিকল্প

এখন প্রশ্ন হলো, অনেক সময় গ্রাহক এমন এমন কারণে চুক্তি রহিত করে যা তার একা রহিত করার অধিকার থাকে না। দেখা গেল- উবার কার কাকরাইল মোড়ে আছে। যাত্রী মালিবাগ রেল গেইটে। চুক্তি কনফার্ম করার পর ড্রাইভার কাকরাইল থেকে মালিবাগ এল। আসার পর যাত্রী এমন কারণে সেটা ক্যান্সেল করে দিল, যা তার একাকী ক্যান্সেল করার অধিকার নেই।

মূলত বর্তমান পরিস্থিতিতে উভয়ে আলোচনা করে ক্যান্সেল করার পরিস্থিতি খুব একটা হয় না। যাত্রীর ক্ষমতা আছে তাই সে দূর থেকেই ক্যান্সেল করে দেয়। এতে ড্রাইভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার ব্যাপকভাবে ক্যান্সেলের অধিকার না থাকায় যাত্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তব উযরের কারণেও ক্যান্সেল করতে গিয়ে তাকে অতিরিক্ত ফি গুণতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের শরয়ী পরামর্শ হলো-

সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার আপডেট করা। তাতে আইডেন্টিফিকেশন মার্কিং-এর অপশন রাখা। ক্যান্সেল করার কারণ কী সেটা যাত্রী মার্ক করে দিবে। অপশনগুলো এভাবে বিন্যস্ত হতে পারে:

- গাড়ি দেখার পর পছন্দ হয়নি।
- হেলমেট নেই বা ভালো মানের নয়।
- সিটবেল্ট নেই।
- সামনের লাইট ভালো না।
- গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি।
- ছুটির দিন।
- বৃষ্টি।
- অসুস্থতা অনুভব করছি।
- ভালো লাগেনি।
- প্রয়োজন নেই। ইত্যাদি।

এরপর পূর্বোক্ত শরীয়াহ্ মানদণ্ডের আলোকে কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, কোন উযরের কারণে তার যাত্রী থেকে ফি নেওয়া যাবে আর কোন উযরের কারণে ফি নেওয়া যাবে না। এখানে যাত্রী যেন মিথ্যার আশ্রয় না নিতে পারে সেজন্য ড্রাইভারের বক্তব্যও নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কর্তৃপক্ষ শুধু ফি ধার্য করার পরিবর্তে অন্যান্য ব্যবস্থাও নিতে পারে। যেমন, বিভিন্ন অফার থেকে উক্ত যাত্রীকে সাময়িক বঞ্চিত করা, রাইডিং সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, শরয়ী দৃষ্টিতে আলোচিত ক্যান্সেলেশন ফি মূলত পরবর্তী রাইডের ভাড়ার অংশ। দ্বিতীয় রাইডে ফির নামে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র। সেই বর্ধিত

অংশটুকু নেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত শরীয়াহ্ স্ক্যানিং কার্যকর করা হলে তাতে ভারসাম্য তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা, সিস্টেমটা এমনভাবে ডেভেলপ করতে হবে যেন কেউ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং ইনসাফ ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

যানজটের কারণে অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ

অনেক সময় গন্তব্যে পৌঁছতে রাইডারকে প্রচণ্ড যানজট পোহাতে হয়। তখন মূল ভাড়ার সাথে কিছু অতিরিক্ত ভাড়া যোগ করা হয়। যেমন, আপনি মালিবাগ থেকে মানিকনগর যাওয়ার জন্য উবার ঠিক করলেন। অ্যাপে ভাড়া দেখানো হয়েছে ১০০ টাকা। কিন্তু মাঝপথে ১৫-২০ মিনিট গাড়ি জ্যামে থেমে রইল। তাহলে এক্ষেত্রে মূল ভাড়া ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরো ১০ টাকা বা কম-বেশি যুক্ত হয়।

শরয়ী বিশ্লেষণ

রাইড শেয়ারিং অ্যাপসে রাইড রিকুয়েস্ট পাঠানোর পূর্বে একটি সম্ভাব্য ভাড়া প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এটি চূড়ান্ত ভাড়া নয়। সময়, দূরত্ব ও কি. মি. ভেদে চূড়ান্ত ভাড়া প্রদর্শিত হয় গন্তব্যে পৌঁছার পর।

তাই যানজটের কারণে অতিরিক্ত সময়ের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ চাইলে অতিরিক্ত ভাড়া যোগ করতে পারে। তবে সেটা ন্যায্য হতে হবে। যাত্রীকে এ ব্যাপারে আগেই বলে নিতে হবে যে, অনাকাঙ্ক্ষিত জ্যামের কারণে ভাড়া কিছু বাড়তে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তো মূল চুক্তিতে ভাড়া নির্ধারিত হলো না। অজ্ঞাত থেকে গেল। এতে কি ভাড়া চুক্তি বৈধ থাকবে?

এর উত্তর হলো, এখানে চুক্তির সময়ই ভাড়া মোটামুটি নির্ধারণ হয়ে যায়। এরপর জ্যামের কারণে যে বেশকমটুকু হয় সেটাতে তেমন সমস্যা হয় না। কারণ তা ঝগড়া পর্যন্ত পৌঁছে না। তাছাড়া উবার কারে প্রতি কি. মি. কত ভাড়া হবে সেটা প্রদর্শিত হয়। সুতরাং এটি সিএনজি মিটারের মতো হয়ে গেল। যাত্রী প্রতি কি. মি. সিএনজি ভাড়া জানে। তবে গন্তব্যে পৌঁছার আগে পুরো ভাড়া জানে না। এতৎসত্ত্বেও তা বৈধ হয় এ জন্য যে, এভাবে ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতিটি সুবিদিত। এতে ঝগড়া-ফাসাদ হয় না। [১]

ওয়েট টাইম ফি গ্রহণ

পাঠাও ও উবারে দেখা যায়, যাত্রী রাইড কনফার্ম করার পর রাইডার যখন যাত্রীকে রিসিভ করার জন্য আসেন, তখন কোনো কারণে যাত্রী যদি গাড়িতে উঠতে নির্ধারিত সময় (৩/৪ মিনিট) থেকে বিলম্ব করে, তাহলে যাত্রীকে প্রতি মিনিটে অতিরিক্ত ০.৩০/০.৪০ পয়সা ওয়েট টাইম ফি গুনতে হয়।

---

১. শরহুল মাজাল্লাহ : খ.২ পৃ. ৫৪৭

শরয়ী বিশ্লেষণ

শরয়ী দৃষ্টিতে ভাড়াচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর ভাড়া গণনা মূলত ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে অর্পণের পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। 'অর্পণ' বলতে তা এভাবে যে, ভাড়াগ্রহীতা ও ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহারের মাঝে কোনোরূপ বাধা না থাকা। ভাড়াগ্রহীতা চাইলেই ব্যবহার করতে পারে। এভাবে ভাড়াকৃত বস্তু অপর্ণের পর থেকেই ভাড়া গণনা শুরু হয়ে যায়।[১]

সুতরাং রাইডার বাহন নিয়ে পিক-আপ পয়েন্টে পৌঁছা ও যাত্রী তা ব্যবহারের জন্য বুঝে পাওয়ার পর থেকেই মূলত ভাড়া গণনা শুরু হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাইডার পিক-আপ পয়েন্টে পৌঁছা ও যাত্রী তা বুঝে পাওয়ার পরও কোনো কারণে যাত্রী বাহনে উঠতে বিলম্ব করলে এ কারণে প্রদর্শিত ভাড়া থেকে ওই পরিমাণ ওয়েট টাইম ফি রাইডার নিতে পারবে। তবে এটি যাত্রীকে অবহিত করে নেওয়া আবশ্যক।

ফ্লাইওভার টোল গ্রহণ

ব্রিজ বা সেতু পার হওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ টোল দিতে হয়। উবার বা পাঠাওয়ে সাধারণত ড্রাইভারই টোল দিয়ে থাকে। জানার বিষয় হলো, যাত্রীদের থেকে এ ধরনের টোল গ্রহণ করা যাবে কিনা?

শরয়ী বিশ্লেষণ

রাইডের শুরুতেই যাত্রী থেকে এ ধরনের টোল গ্রহণের চুক্তি করে থাকলে, কিংবা যাত্রীদের অনুরোধে কখনো ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে রাইড দিতে হলে, সেক্ষেত্রে রাইডার চাইলে যাত্রী থেকে ভাড়ার পাশাপাশি টোলও আদায় করতে পারবে। অন্যথায় সাধারণ রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী রাইডারই টোল আদায় করবে।

নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছার পর অ্যাপে অতিরিক্ত ভাড়া দেখানো

অনেক সময় যাত্রার শুরুতে অ্যাপে ভাড়া দেখানো হয় (উদাহরণস্বরূপ) ১০০ টাকা। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছার পর দেখা যায়, অ্যাপসে ১৩০ টাকা দেখাচ্ছে। জানার বিষয় হলো, এই অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ কি বৈধ হবে?

পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, রাইড শেয়ারিং অ্যাপসে মূলত প্রথমে যে ভাড়া প্রদর্শিত হয় সেটা চূড়ান্ত নয়, মোটামুটি আনুমানিক ভাড়া। চূড়ান্ত ভাড়া প্রদর্শিত হয় গন্তব্যে পৌঁছার পর। এতে মৌলিকভাবে সমস্যা নেই। এভাবে ভাড়া নির্ধারণ প্রক্রিয়া যেহেতু সমাজে পরিচিত, একে কেন্দ্র করে তেমন ঝগড়া সৃষ্টি হয় না, তাই এতে সমস্যা নেই।[২] তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা-

---

১. শরহুল মাজাল্লাহ, মাদ্দাহ : ৪৭৭, খ. ২, পৃ. ৫৬০, ৬৮০
২. শরহুল মাজাল্লাহ : খ.২, পৃ. ৫৪৭

১. রাইড শেয়ারিং কোম্পানিগুলো নানা কারণে ভাড়া বৃদ্ধি করে থাকে। এসবের অনেক কিছুই যাত্রীদের অজানা থাকে। তাই চুক্তির শুরুতেই বিষয়গুলো যাত্রীকে জানানো জরুরি।

২. ভাড়া বৃদ্ধির কারণগুলো যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ হতে হবে। ব্যাপকভাবে ক্যান্সেলেশন ফি'র নামে পরবর্তী রাইডে ব্যাপকভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করা অন্যায়। তাছাড়া অনেক সময় রাইডার এক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন যাত্রীর জন্য কোনো অফার বা ডিসকাউন্টের কারণে ভাড়া কিছুটা কম প্রদর্শিত হলেও সেটা গোপন করে যাত্রী থেকে মূল ভাড়াই আদায় করা হয়। এমনটি হলে যাত্রীর উচিত কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে নেওয়া এবং রাইডারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা।

রাইডার ও অ্যাপস কর্তৃপক্ষের পরস্পর লেনদেন ও শরয়ী বিধান

রেফার করে আয়: (পাঠাও)

ইদানীং পাঠাও কর্তৃপক্ষ রাইডারদের রেফার করে আয়ের সুযোগ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো রাইডার তার রেফারেল কোডের মাধ্যমে একজন নতুন রাইডারকে পাঠাওয়ে জয়েন করালেই নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে রেফারকারী রাইডার ৩০০ টাকা বোনাস পেয়ে যাবে। শর্তগুলো হলো,

ক. রেফারকৃত নতুন রাইডারকে ন্যূনতম ১৫টি রাইড কমপ্লিট করতে হবে।

খ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা কমপ্লিট করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত ১০ থেকে ১৫ দিনের একটি সময় বেঁধে দেওয়া থাকে।

এ দুটি শর্তের কোনো একটি পূরণ না হলে রেফারকারী কোনো বোনাস পাবে না।

জানার বিষয় হলো, রাইডারদের সাথে অ্যাপস কর্তৃপক্ষের এ ধরনের রেফার আয়ের চুক্তি বৈধ কিনা?

শরয়ী বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত শর্তদুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো কারণে রেফারকৃত নতুন রাইডার ১৫টি ট্রিপ কমপ্লিট করতে না পারলে, সেক্ষেত্রে পুরাতন রেফারকারী নতুন রাইডারকে রেফারেল কোড প্রদানের মাধ্যমে শ্রম দিলেও তিনি এর কোনো বিনিময় পাচ্ছেন না। যেমন ধরা যাক, তিনটি রাইড কমপ্লিট হলো। এরপর তিনি আর রাইড কন্টিনিউ করেননি। তাহলে এক্ষেত্রে রেফারকারীর শ্রম পাওয়া গেছে ঠিকই কিন্তু কোনোরূপ পারিশ্রমিক সে পাচ্ছে না। অথচ অ্যাপ কর্তৃপক্ষ ঠিকই লাভবান হচ্ছে। ফিকহের ভাষায় এরূপ অনৈতিক চুক্তি ও লেনদেনকে -عمل بلا أجرة বা 'বিনিময়হীন শ্রম' বলা হয়। এটি নিষিদ্ধ ও অবৈধ লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো, (১) যে লোক আমার নামে অঙ্গীকার করে পরে তা ভঙ্গ করেছে, (২) যে লোক স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খেয়েছে এবং (৩) যে লোক শ্রমিক নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরী প্রদান করেনি।[১]

সুতরাং আলোচিত রেফার পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়।

শরয়ী বিকল্প

এক্ষেত্রে শরয়ী বিকল্প এভাবে হতে পারে যে, নতুন রাইডারের প্রথম ট্রিপেই রেফারকারীকে বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বোনাসের পরিমাণ কমিয়ে ধরা যেতে পারে। তবে এতে বোনাসের পরিমাণ কম হলেও রেফারকারী বেশি বেশি রাইডার বাড়াতে উৎসাহিত হবে নিঃসন্দেহে।

রাইডার ও গাড়ির মালিকের পারস্পরিক লেনদেন ও শরয়ী বিধান

রাইডার ও গাড়ির মালিকের পরস্পর ইজারা বা ভাড়া চুক্তি

অনেক রাইডার আছেন যাদের ব্যক্তিগত কোনো গাড়ি নেই। তারা ভাড়াচুক্তিতে অন্যের গাড়ি নিয়ে উবারে কিংবা পাঠাওয়ে রাইড দিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে কখনো গাড়ির মালিকের সাথে রাইডারদের মাসিক ভাড়ার চুক্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাইডার গাড়ির মালিককে প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া প্রদান করেন। এভাবে গাড়ি ভাড়ায় নিয়ে রাইড শেয়ারিং প্রদান করা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে শর্ত হলো- চুক্তির শুরুতেই গাড়ির ভাড়া নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

অনেক মালিকপক্ষ আছেন, তারা রাইডারদের সাথে সরাসরি মাসিক ভাড়া চুক্তিতে না গিয়ে পার্টনারশিপ চুক্তি করে থাকেন। অর্থাৎ দিনশেষে যা উপার্জন হয় তা সমানহারে ৫০% করে উভয়ের মাঝে বণ্টন হয়ে যাবে। এ ধরনের শিরকত চুক্তি হানাফী ফিকহে বৈধ নয়।

---

১. সহীহ বুখারী : ২২২৭

এক্ষেত্রে ২টি নিয়মে সহীহভাবে চুক্তি করা যায়–

১. নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে গাড়ির মালিক চালকের নিকট গাড়িটি ভাড়া দিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়াই গাড়ির মালিকের প্রাপ্য হবে। আর গাড়ির যাবতীয় আয় পাবে ভাড়াগ্রহীতা চালক।

২. গাড়ির মালিক চালককে নির্ধারিত পরিমাণ পারিশ্রমিক দিবেন। আর গাড়ি থেকে উপার্জিত সকল আয়ের মালিক হবে গাড়ির মালিক। আর চালক শুধু তার নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাবে।[১] গাড়ির মালিক চাইলে এদুটির যেকোনো একটি পদ্ধতিতে চুক্তি করতে পারেন।[২]

ভাড়া চুক্তিতে রাইডার থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ

বেশ কয়েকজন রাইডারের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে যে, ভাড়া চুক্তিতে রাইডারের কাছে থাকাবস্থায় গাড়ির কোনো ক্ষতি হলে এর দায় রাইডারকেই বহন করতে হয়। প্রশ্ন হলো, ভাড়াচুক্তিতে এভাবে ক্ষতির সকল দায় রাইডারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কি না?

শরয়ী বিধান

ইজারা বা ভাড়াচুক্তিতে ভাড়াকৃত পণ্যটি ভাড়াগ্রহীতার কাছে আমানত হিসেবে থাকে। মূল মালিকানা থাকে ভাড়াদাতার। তাই সতর্কতার সাথে গাড়ি চালানোর পরেও রাইডারের অনিচ্ছাকৃত কোনো কারণে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, এর দায় রাইডারের ওপর চাপানো বৈধ হবে না। যেমন, গাড়ি সঠিক স্থানে পার্ক করা থাকাবস্থায় পেছন থেকে আরেকটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে গাড়ির পিছনের লাইট ভেঙ্গে দিল। তাহলে এর ক্ষতিপূরণ কোনোভাবেই ড্রাইভারের ওপর চাপানো যাবে না। তদ্রূপ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গাড়ি চালানোর পরেও গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় ড্রাইভারের ওপর চাপানো যাবে না।

পক্ষান্তরে রাইডারের অসতর্কতা কিংবা চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘনের কারণে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় রাইডারকেই বহন করতে হবে।[৩]

মোটকথা, রাইডারের কর্তব্য হলো, সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে গাড়ি চালানো। গাড়ির যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কারণ গাড়িটি

---

১. ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া : খ. ১৫, পৃ. ১১৬, আল মুহিতুল বুরহানী : খ. ১১, পৃ. ৩৩৬
২. প্রকাশ থাকে যে, হাম্বলী ফিকহে এমন চুক্তি সরাসরি বৈধ। অর্থাৎ একজনের গাড়ি ও অপরজনের ড্রাইভিং শ্রম। লব্ধ অর্থ উভয়ের মাঝে নির্ধারিত হারে বণ্টন করা। ক্ষেত্র বিশেষ বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ করে এভাবেও করা যেতে পারে। (আল-মুগনী : ৫/১১৬, ধারা: ৩৬২২, দারুল ফিকর)
৩. আল মাআ'য়িরুশ শারইয়্যাহ, ধারা: (৫) ৩/২, খ. : ১, পৃ. : ১৩০। জাদীদ মায়াশী নেযাম, পৃ. : ২৯৯

তার কাছে আমানত। এর যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব তার নিজেরই। আর গাড়ির মালিকের উচিত ড্রাইভারের সার্বিক যোগ্যতা যাচাই করেই তার সাথে ভাড়াচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। অন্যায় কোনো চার্জ ড্রাইভারের ওপর আরোপ না করা। অন্যথায় সেটা জুলুম বলে বিবেচিত হবে।

গাড়ির খরচ বহন

গাড়ির খরচ বহনের ক্ষেত্রে নীতি হলো, যেসব খরচ ব্যবহারজনিত যেমন, গাড়ির তেল ইত্যাদি। এগুলো ভাড়াগ্রহীতা বহন করবে। আর যেসব খরচ মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত যেমন, গাড়ির টেক্স, বিমা ইত্যাদি খরচ ভাড়াদাতা অর্থাৎ গাড়ির মালিকই বহন করবে।[১]

গ্রাহক ও অ্যাপ কর্তৃপক্ষের মধ্যকার আচরণ ও শরয়ী বিশ্লেষণ

ইউজারদের রেফার করে আয়

"পাঠাও" যেমন তার রাইডারদের রেফার করে আয়ের সুযোগ দেয়, তেমনি বিভিন্ন সময় তার যাত্রীদেরও রেফার করে আয়ের অফার দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো ইউজার তার রেফারেল কোডের মাধ্যমে নতুন একজন ইউজারকে 'পাঠাও'-এ জয়েন করালেই নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে রেফারকারী ইউজার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বোনাস পেয়ে যাবে। এসব শর্তের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো-

> 'পাঠাও অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করার ২০ দিনের মধ্যে রেফারকৃত নতুন ইউজারকে অবশ্যই ৫টি রাইড কমপ্লিট করতে হবে'।

শরয়ী বিধান

শরয়ী দৃষ্টিতে উপর্যুক্ত শর্তটি বৈধ নয়। কারণ, কোনো কারণে ইউজার পাঁচটি ট্রিপ কমপ্লিট করতে না পারলে, সেক্ষেত্রে রেফারকারী শ্রম দিলেও তিনি এর কোনো বিনিময় পাচ্ছেন না। ফিকহের ভাষায় এটি - عمل بلا أجرة অর্থাৎ 'বিনিময়হীন শ্রম'। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ লেনদেন।[২] পূর্বে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

শরয়ী বিকল্প

এক্ষেত্রে শরয়ী বিকল্প হলো, রেফারকারীকে প্রথম ট্রিপেই বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বোনাসের পরিমাণ কমিয়ে ধরা হলেও রেফারকারী বেশি বেশি ইউজার বাড়াতে উৎসাহিত হবে।

---

১. আল মায়ায়িরুশ শারইয়্যাহ খ. : ১, পৃ. : ২৪৭, স্ট্যান্ডার্ড নং (৯) ৫/১/৫ , (৯) ৭/১/

২. সহীহ বুখারী : ২২২৭

ক্যাশব্যাক অফার

বর্তমানে বিভিন্ন রাইড শেয়ারিং অ্যাপ গ্রাহকদের ক্যাশব্যাক অফার দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রী বিকাশের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করলে তাকে উপস্থিত ক্যাশব্যাক প্রদান করা হয়।

এতে দেখা যায়, ১০০ টাকার ভাড়া অবস্থাভেদে ৫০-৬০ টাকায় চলে আসে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার পর আমরা জানতে পেরেছি, ক্যাশব্যাকের উক্ত অংশটি বিকাশ কোম্পানি ও অ্যাপ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে বহন করে থাকে। শরয়ী দৃষ্টিতে অ্যাপ কর্তৃপক্ষ যে অংশটুকু বহন করে সেটা অবৈধ হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু অ্যাপ কর্তৃপক্ষ তার ইউজার বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় তাদের প্রফিটের একটি অংশ ছেড়ে দিচ্ছে। যদিও রাইডার তার প্রকৃত ভাড়াই পাচ্ছে।

বাকি থাকলো বিকাশ কোম্পানি যে অশংটুকু প্রদান করছে, তাতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত বিকাশের অ্যাকাউন্টে টাকা রাখাটা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে করযের অন্তর্ভুক্ত। যে কারণে বিকাশ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ক্যাশব্যাক গ্রহণ করাটা করযের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। যা গ্রহণ করা বৈধ নয়। দ্বিতীয়ত বিকাশ কোম্পানি তাদের 'ই-ওয়ালেট ইউজার' বৃদ্ধি করার জন্য গ্রাহকদের ক্যাশব্যাক প্রদান করে থাকে। যার সাথে করযের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে সেটি গ্রহণ করতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অসুবিধা নেই। তাই হালাল-হারামের দৃষ্টিতে বিকাশ কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাশব্যাকের অংশটি গ্রহণ করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়াও উক্ত মাসআলাটি উলামায়ে কেরামের নিকট মতভেদপূর্ণ। ফলে একজন সচেতন মুসলিমের জন্য উক্ত ক্যাশব্যাক গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

শেষকথা

প্রচলিত অ্যাপস ভিত্তিক বিভিন্ন সেবার ধরন ও পদ্ধতি দিন দিন আপডেট, পরিবর্তন ও সংযোজন হচ্ছে। এগুলো মূলত পুঁজিবাদী চিন্তাধারাকে সামনে রেখে করা হয়। মানুষকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সেবার নামে টাকা কুক্ষিগত করার বিভিন্ন প্রয়াসের সূত্র ধরেই এগুলো করা হয়ে থাকে। শরীয়াহ্ সামনে রেখে এসব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় না। তাই আমাদের উচিত শুধু রাইড শেয়ারিং সেবাই নয়; বরং বর্তমান যেকোনো অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার আগে তা শরীয়াহসম্মত কি না সে বিষয় জেনে নেওয়া।

পাশাপাশি মুসলিম কোম্পানিগুলোর উচিত তাদের কার্যকলাপ শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালনা করা। কারণ ইসলামী আইন-কানুন আল্লাহ তাআলা এমনভাবে ডিজাইন করে দিয়েছেন, যা সর্বদা মানবকল্যাণের জন্য নিবেদিত। এসব আইন-কানুন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য

করুন।

পুরুষের পোশাক-সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল

কোন ধরনের পোশাক পরা সুন্নত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন। তারা তাদের অভ্যাস এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে যখন যা পেতেন তাই পরিধান করতেন। তাই পোশাকের নির্দিষ্ট কোনো প্রকারকে সুন্নত বলা হয় না। মুফতি আযীযুর রহমান রহ. বলেন,
"পোশাক ও টুপির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে কোনো বিশেষ পদ্ধতির বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং যে দেশে যেমন রীতি-নীতি ও প্রচলন রয়েছে সে দেশে সে অনুযায়ী পোশাক ও টুপি ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয আছে। হাদীস শরীফে আছে-

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ... الحديث.[২]

অর্থাৎ, যা চাও খাও, যা চাও পরিধান করো, কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকো এবং অহংকার ও অপব্যয় পরিহার করো।[৩]

তবে যে ধরনের পোশাকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কিংবা উৎসাহ দিয়েছেন অথবা পছন্দ করেছেন সে ধরনের পোশাক অন্যান্য পোশাকের চেয়ে উত্তম। তদ্রূপ যে ধরনের পোশাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পরিধান করেছেন তার প্রতি মহব্বত এবং ভালোবাসা প্রকাশের

---

১. সুনানে আবু দাউদ : ৪০২২; আবু নাযরাহ রহ. বলেন–

فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى

হাফেয ইবনে হাজার রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাপারে বলেন- أخرجه أبو داود بسند صحيح. (ফাতহুল বারী : ১০/৩৪৪)

২. এই হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. তার মুসান্নাফে (হাদীস: ২৫৩৭৫) এভাবে বর্ণনা করেছেন–

حدثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان: سرف أو مخيلة. اهـ مصنف ابن أبي شيبة (١٢: ٥١٦) وقال الشيخ محمد عوامة تعليقا عليه: وهذا الأثر علقه كذلك البخاري بصيغة الجزم. اهـ

৩. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ : ৪/১০২

উদ্দেশ্যে সেগুলো পরিধান করাও উত্তম। তেমনিভাবে সর্বযুগের নেককার লোকদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক পরাও উত্তম।[১]

পাগড়ি পরিধান করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি পরেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণও পাগড়ি পরেছেন। তাদের অনেকেই অভ্যাসগতভাবে এবং পোশাক হিসাবে প্রায় সবসময়ই পাগড়ি পরা অবস্থায় থাকতেন। আল্লামা লখনবী রহ. বলেন, সর্বদা পাগড়ি পরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসগত সুন্নত। তাই এটা ছাড়লে মাকরূহ হবে না। তবে কেউ যদি কোনো অভ্যাসগত এবং প্রথাগত আমল নবীজীর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে পালন করে; তাহলে তাতে সওয়াবের আশা করা যায়। কারণ, এর মাধ্যমে নবীজীর প্রতি তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অনুসরণে পাগড়ি পরাই উত্তম।[২]

পাগড়ির দৈর্ঘ্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ির দৈর্ঘ্য কতটুকু ছিলো, তা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো কিতাবে সাত হাত, বার হাত ইত্যাদি পরিমাপ লেখা থাকলেও মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেন, এগুলো বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন, পাগড়ির সুনির্দিষ্ট পরিমাপ কোনো হাদীস থেকে জানা যায় না।[৩]

পাগড়ির রং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা-তাবেয়ীগণের মাঝে কালো, সাদা, সবুজসহ বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরার প্রচলন ছিলো। হযরত সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন, আমি প্রথম যুগের মুহাজিরদের দেখেছি, তারা কালো, সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের পাগড়ি পরতেন।[৪]

---

১. মোল্লা আলী কারী রহ. মিরকাতুল মাফাতীহে (৮/১৫৫) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

(وعنه) أي: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم) أي: من شبه نفسه بالكفار، مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، (فهو منهم) أي: في الإثم والخير.

২. নাফউল মুফতী ওয়াস সায়েল, পৃষ্ঠা: ১১; ইমাম লখনবী রহ.-এর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:

إن المواظبة النبوية التي هي دليل السنية، إنما هي المواظبة في باب العبادات دون العادات، كما في "شرح الوقاية" وغيره، ومواظبته على العمامة من قبيل الثاني (أي: العادات)، فلا يكون تركه مكروها، نعم يكون الأولى الاقتداء به.

৩. আলহাওয়ী লিল ফাতাওয়ী, ইমাম সুয়ূতী রহ. কৃত : ১/৭৩

৪. ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. তার মুসান্নাফে (হাদীস : ২৫৪৮৯) বর্ণনা করেন–

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَائِمَ كَرَابِيسَ سُودٍ، وَبِيضٍ، وَحُمْرٍ، وَخُضْرٍ، وَصُفْرٍ. اهـ

তাই পোশাকের মূলনীতি ঠিক রেখে যেকোনো রঙের পাগড়ি পরার অবকাশ রয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পরতে উৎসাহ দিয়েছেন।[১] তাই কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম সাদা পাগড়ি পরাকে উত্তম বলেছেন।[২] আবার কোনো কোনো আলেম কালো পাগড়ি পরাকে উত্তম বলেছেন। কারণ, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাককে উত্তম বলেছেন; কিন্তু পাগড়ির ক্ষেত্রে কালো পাগড়ি পরেছেন।[৩]

পাগড়ির শামলা কেমন হবে?

পাগড়ির শামলা[৪] রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো, শামলাকে মাঝ পিঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত করে রাখা।[৫] তবে পাগড়ির প্রান্ত চার আঙ্গুল রাখার কথাও হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।[৬] তদ্রূপ প্রান্ত বের না করেও পাগড়ি পরা যায়।[৭]

মোটকথা, পাগড়ি পরা যেহেতু সুন্নতে আদিয়া, তাই পোশাকের মূলনীতি ঠিক রেখে যে-কোনো ধরনের, যেকোনো রঙের এবং যেকোনোভাবেই পাগড়ি পরার অবকাশ আছে।

---

১. ইমাম তিরমিযী রহ. তার 'সুনানে' (হাদীস: ৯১৪) হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم.

২. জামউল ওসায়েল, পৃষ্ঠা: ২০৪

৩. আওনুল মা'বুদ : ১১/৮৭; জামউল ওসায়েল, পৃ. ২০৪

৪. শামলা হলো, (মাথার পেছন দিকে) পাগড়ির ঝুলন্ত অংশ। দ্রষ্টব্য: ফারহাঙ্গে কাসেমী।

৫. ইমাম মুনাওয়ী রহ. কৃত শরহুশ শামায়েল : ১/২০৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়ায় আছে (৫/৩৮৩):

نُدِبَ لُبْس السَّوَادِ وَإِرْسَالُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ إِلَى وَسَطِ الظَّهْرِ.

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত-

قال: كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى أن قال: ثم أمر ابن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقضها، فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن. رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. مجمع الزوائد (١٤٨:٥)

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২৫৪৮৭; যাদুল মাআদ : ১/৭২; জামউল ওয়াসায়েল : ১/২০৭; আল্লামা শাওকানী রহ. নাইলুল আওতারে (২/৪৬৭) বলেন,

قال النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره. انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوًا من ذراع.

পাগড়ির ফযীলত বিষয়ক জাল হাদীস

পাগড়ির ফযীলতকে কেন্দ্র করে লোকমুখে হাদিস নামে কিছু কথার প্রচলন রয়েছে। তন্মধ্যে "পাগড়ি পরে নামাজ পড়লে সত্তর গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়"- এই কথাটি অন্যতম। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। বরং তা বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এটি একটি মিথ্যা ও বাতিল কথা। তদ্রূপ পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে-এই মর্মেও একটি কথা লোকমুখে শোনা যায়। সেটিও বাতিল এবং ভিত্তিহীন।[১]

টুপি পরিধান করা

টুপি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরেছেন। সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণও পরেছেন। এবং পরবর্তীতে সব যুগেই মুসলিমগণ তা পরিধান করেছেন। টুপি পাগড়ির মতোই একটি ইসলামী লেবাস। হাদীস, আছার ও ইতিহাসের কিতাবে এই বিষয়ে বহু তথ্য রয়েছে। হযরত হাসান ইবনে মেহরান রহ. এক সাহাবী (ফারকাদ রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَة بَيْضَاء.

অর্থ : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবার খেয়েছি এবং তার মাথায় সাদা টুপি দেখেছি।[২]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ فِي السَّفَرِ ذَوَاتِ الْآذَانِ، وَفِي الْحَضَرِ الْمُشَمَّرَةِ يَعْنِيْ الشَّامِيَة.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অবস্থায় কানটুপি পরতেন, আর আবাসে পরতেন শামী টুপি।[৩]

---

১. আলমাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ৩৪৬; আলমাছনূ' : ১৭৭; পৃ. ১১৮-১১৯; প্রচলিত জাল হাদীস, ১/১২৯

২. আলইসাবাহ গ্রন্থে (৩/১) এ হাদীসটি ইমাম ইবনুস সাকান তার কিতাবুস সাহাবায় সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তবে তার এ বর্ণনায় সাহাবীর নাম আসেনি। তা এসেছে তার অন্য বর্ণনায় এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু হাতেমের বর্ণনায় তার নাম ফারকাদ। (দ্রষ্টব্য: আততারীখুল কাবীর : ৭/১৩১; কিতাবুল জারহি ওয়াত তাদীল : ৭/৮১) উল্লেখ্য, ইবনে হাজার আসকলানী রহ. ইমাম ইবনুস সাকানের উপর্যুক্ত বর্ণনার দ্বারা আবু নুআইম আল-আসফাহানী রহ. এ দাবি খণ্ডন করেছেন যে, ফারকাদ সাহাবী আল্লাহর নবীর দস্তরখানে খাবার খাননি। বরং হাসান ইবনে মেহরান খাবার খেয়েছেন সাহাবী ফারকাদের সাথে। (মারেফাতুস সাহাবা ৪/১০৪) হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এক্ষেত্রে আবু নুআইমই ভুলের শিকার হয়েছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি ইমাম ইবনুস সাকানের উপর্যুক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। এতে প্রমাণিত হয় এ বর্ণনা সহীহ। অন্যথায় প্রমাণ গ্রহণ শুদ্ধ হতো না এবং আবু নুআইমের মতো ইমামের কথাকে খণ্ডন করা যেত না। তাছাড়া সাহাবী ফারকাদ রা.-এর আল্লাহর নবীর দস্তরখানে খাবার খাওয়ার কথা ইমাম বুখারী, ইমাম হাতেম ও ইবনু আবদিল বারও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (আলকাউসার, নভেম্বর ২০১৩)

৩. আল জামে লিআখলাকির রাবী, পৃষ্ঠাঃ ২০২; আখলাকুন নবুওয়াহ : ২৯৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (৭/২৮৮)-এ হাদীসের সকল রাবী সিকাহ। (আল কাউসার, নভেম্বর ২০১৩)

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন,

وَكَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُوْنَ عَلَى العِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ.

অর্থ : তারা (সাহাবায়ে কেরাম রা. গরমের দিনে) পাগড়ি ও টুপির ওপর সেজদা করতেন।[১]

এ ছাড়াও টুপি পরিধানের ব্যাপারে আরো বহু হাদীস এবং আসার রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি পরতেন এবং পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন। তিনি কখনো পাগড়ি ছাড়া টুপি পরতেন। কখনো টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন।[২] তাই যারা বলেন, হাদীস আসারে টুপির কথা নেই তাদের কথা সঠিক নয়।

কোন ধরনের টুপি পরবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের টুপি পরিধান করেছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অবস্থায় কানটুপি পরতেন, আর আবাসে পরতেন শামী টুপি।[৩] হযরত আবু হাইয়ান রহ. বলেন,

كَانَتْ قَلَنْسُوَةُ عَلِيٍّ لَطِيْفَةً.

অর্থ : হযরত আলী রা.-এর টুপি ছিল পাতলা।[৪]

হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন,

رأيت أنس بن مالك، وعليه قَلَنْسُوَةٌ بَيْضاءَ مَزْرُوْرَةٌ.

অর্থ : আমি আনাস রা.-এর মাথায় বোতাম লাগানো সাদা টুপি দেখেছি।[৫]

হযরত আইয়ুব রহ. বলেন,

رأيت على القاسم بن محمد قلنسوة من خَزٍّ خَضْراءَ.

অর্থ : আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ.-এর মাথায় পশমের সবুজ টুপি দেখেছি।[৬]

হযরত আবদুল্লাহ সাঈদ ইবনে আবি হিন্দ রহ. বলেন,

رأيت على علي بن حسين قلنسوة بيضاء لَاطِئَةً.

অর্থ : আমি আলী ইবনে হুসাইন রহ.-এর মাথায় একটি সাদা টুপি দেখেছি, যা তার মাথার সাথে মিলিত ছিলো।[৭]

---

১. সহীহ বুখারী ১/৫৬
২. যাদুল মা'আদ ১/৭২
৩. আখলাকুন নবুওয়াহ : : ২৯৯
৪. তবাকাতে ইবনে সাদ ৩/৩০
৫. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : : ৭৪৫
৬. তবাকাতে ইবনে সাদ ৫/১৮৯
৭. তবাকাতে ইবনে সাদ ৫/২১৮

ইমাম আবু হানীফা রহ. উঁচু টুপি পরতেন।[১]

فَدَعَا بِطَوِيْلَتِهِ، فَلَبِسَهَا.[২]

অর্থ : তিনি তার উঁচু টুপিটি আনতে বললেন। অতঃপর তা পরিধান করলেন।

তাই টুপির নির্দিষ্ট কোনো ধরন নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। বরং পোশাকের মূলনীতি ঠিক রেখে যেকোনো ধরনের টুপি পরার অবকাশ আছে। মুফতি আযীযুর রহমান রহ. বলেন, পোশাক ও টুপির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে কোনো বিশেষ পদ্ধতির বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং যে দেশে যেমন রীতি ও প্রচলন রয়েছে, সে দেশে সে অনুপাতে পোশাক ও টুপি ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয আছে।[৩]

মাথায় রুমাল ব্যবহার করা

মাথায় রুমাল ব্যবহার করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো চাদর বা অন্য কোনো কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখতেন। হযরত আনাস রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদরের প্রান্ত দিয়ে মাথা ঢেকে বের হয়েছেন। এ ছাড়া হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে হযরত আবু বকর রা. এর কাছে এসেছিলেন।[৪]

শার্ট-প্যান্ট পরা

শার্ট পাশ্চাত্যের অমুসলিম সম্প্রদায় থেকে আমাদের মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। তবে বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মাঝে এর ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। কোনো ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ নেই। তাই এর ব্যবহার অবৈধ নয়।[৫]

শার্টের মতো প্যান্টও পাশ্চাত্যের অমুসলিম সম্প্রদায় থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। তবে বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম সবার মাঝেই এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেহেতু বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ নেই। তাই নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্যান্ট পরার অবকাশ রয়েছে, তবে অনুত্তম-

---

১. আলইনতিকা, পৃষ্ঠা: ৩২৬

২. উক্ত বর্ণনায় আলোচিত طويلة-এর ব্যাখ্যায় আলইনতিকা-এর টীকায় (পৃষ্ঠা: ৩২৬) শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন,

الطويلة: قلنسوة تشبه في ارتفاعها وطولها نصف مُعَيَّن هكذا.

৩. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ : ৪/১০২

৪. হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে (১০/৩৩৭) বলেন-

فصار (الطيلسان) داخلا في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الاخلال بالمروءة، كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون لقوم وتركه بالعكس، ومثل ابن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان. اهـ

৫. কিতাবুন নাওয়াযিল : ১৫/৩৩২

১. প্যান্টের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সতর (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) ঢাকা থাকতে হবে।

২. এমন টাইট হতে পারবে না, যা শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে, ফলে সতরের আকৃতি বুঝা যায়।

৩. প্যান্টের নিম্নাংশ সর্বদা টাখনুর ওপর থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, অনেককে দেখা যায়, নাভির নিচে প্যান্ট পরে। ফলে সতর পূর্ণভাবে ঢাকা হয় না। কখনও এমনও হয় যে, নুয়ে কোনো কাজ করার সময় কিংবা নামাজে রুকু সিজদা করার সময় নিতম্বের উপরের দিক অবমুক্ত হয়ে যায়। এগুলো যেমন সুস্থরুচিবোধের পরিপন্থি, তেমনি গুনাহও বটে। এমনকি বর্তমানে যেভাবে টাইট প্যান্ট পরার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, এতে সতরের অবয়ব ফুটে উঠে। প্যান্ট পরতে চাইলে উপরে পাঞ্জাবি বা লম্বা শার্ট বা লম্বা গেঞ্জি পরা উচিত। অথবা ঢিলে-ঢালা প্যান্ট পরা উচিত। যেন সতরের অবয়ব প্রকাশ না হয়ে যায়।[১]

গলায় টাই পরা

প্যান্ট-শার্টের মতো টাইও মূলত অমুসলিম সম্প্রদায়ের পোশাক, যা আমাদের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। টাইয়ের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, এটি ক্রুশের চিহ্ন। কিন্তু এ কথাটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, আমি যথেষ্ট অনুসন্ধান করেও এর বাস্তবতা খুঁজে পাইনি।[২]

তবে মুফতি ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. বলেন, আমি কোনো এক কিতাবে পড়েছি, 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'র প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন তাতে লেখা ছিলো, ক্রুশের আলামত হিসাবেই খ্রিষ্টানরা এটি গলায় পরিধান করে। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এ কথা বদলে ফেলা হয়। যদি ওই বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এর মর্ম হচ্ছে, পৈতা যেমন হিন্দুদের ধর্মীয় নিদর্শন, টাই তেমনি খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন। কোনো ধর্মের নিদর্শনকে ব্যবহার করা কেবল নাজায়েযই নয়; বরং তা দীনি গায়রাত বা ঈমানী মর্যাদাবোধেরও পরিপন্থি।[৩]

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. বলেন, টাই একসময় খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন ছিলো। তখন এর বিধানও কঠোর ছিলো। বর্তমানে অন্যরাও এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। ফলে এর বিধানে শিথিলতা এসেছে। একে শির্ক বা হারাম বলা যাবে না। তবে মাকরূহ

---

১. কিতাবুন নাওয়াযিল : ১৫/৩৩২
২. দরসে তিরমিযী : ৫/৩৩২
৩. আপ কে মাসায়েল : ৮/৩৭১

তো অবশ্যই। কম বা বেশি। যেখানে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে সেখানে জোরালোভাবে নিষেধ করা যাবে না।[১]

মোটকথা, টাই ক্রুশের আলামত হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু সন্দেহ রয়েছে, তাই মুসলমানদের জন্য এধরনের সন্দেহযুক্ত পোশাক পরা থেকে বেঁচে থাকাই উচিত। এছাড়াও টাই যেহেতু অমুসলিম সম্প্রদায় থেকেই মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে সে দৃষ্টিকোণ থেকেও এর থেকে বেঁচে থাকা কাম্য।

পুরুষের লাল ও গোলাপি রঙের পোশাক পরা

লাল পোশাকের ব্যাপারে জায়েয-নাজায়েয উভয় ধরনের হাদীস রয়েছে। তাই এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতভিন্নতা রয়েছে, তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল, পুরুষের জন্য নিরেট লাল বর্ণের পোশাক পরিধান করা অনুত্তম। ডোরাকাটা বা অন্য রঙ মিশ্রিত লাল বর্ণের পোশাক পরিধান করাতে কোনো অসুবিধা নেই।[২] আর পুরুষের জন্য গোলাপি রঙের কাপড় পরা বৈধ।[৩]

ঈদের দিন নতুন কাপড় পরা

যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য ঈদের দিন নতুন কাপড় পরা মুস্তাহাব।[৪]

নারীদের পোশাক-সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল

শাড়ি পরার হুকুম

শাড়ি এক সময় হিন্দু নারীদের পোশাক ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এটি মিশ্র পোশাকে পরিণত হয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম সব নারীই পরছে। সুতরাং সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী এটি পরিধান করলে বিধর্মীদের সাদৃশ্যের গুনাহ হবে না। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়–

ক. শাড়ি যেন এমনভাবে পরা হয় যাতে সতরের কোনো অংশ অনাবৃত না থাকে।

খ. শাড়ির সাথে সাধারণত ব্লাউজ পরা হয়। এক্ষেত্রে অনেকেই এমন ব্লাউজ পরে থাকেন, যা পরিধানের পরও পেট ও পিঠের একটা অংশ অনাবৃত থাকে। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে এধরনের পোশাক পরে যাওয়া জায়েয নয়।

---

১. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১৯/২৮৯

২. ইলাউস সুনান : ১৭/৩৫৫-৩৫৬; ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া : পৃষ্ঠা: ৫৭৪-৫৭৫; কিফায়াতুল মুফতী : ১২/৩০৯; ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ : ১৬/১৪৭-১৪৮; আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/৬২

৩. আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/৬২

৪. যাদুল মাআদ : ১/২৬৪; রদ্দুল মুহতার : ২/১৬৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদে (হাদীস: ৩২০৮) রয়েছে-

وفي مجمع الزوائد (٣٢٠٨) عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء.
رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات.

যেকোনো পোশাক এতটুকু বড়ো হওয়া আবশ্যক, যা দ্বারা পূর্ণ সতর ঢাকা যায়। তাই ব্লাউজ এমনভাবে বানানো উচিত যাতে পেট-পিঠ, বাহুসহ সতরের কোনো অংশই অনাবৃত না থাকে।[১]

গ. শাড়ি এমন পাতলা না হওয়া, যাতে শরীর দেখা যায়। এমন শাড়ি পরে স্বামী ছাড়া অন্য করো সামনে যাওয়া জায়েয নয়।[২]

মেয়েদের জন্য প্যান্ট-শার্ট এবং গেঞ্জি পরা

প্যান্ট-শার্ট এবং গেঞ্জি মূলত পুরুষের পোশাক। আর পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরা নারীদের জন্য হারাম এবং লা'নতের কারণ। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীর ওপর লা'নত করেছেন।[৩] তাই নারীদের জন্য প্যান্ট-শার্ট বা গেঞ্জি পরা জায়েয নয়। অবশ্য নারীদের জন্য তৈরিকৃত গেঞ্জি জামার ভিতরে পরা হলে অসুবিধা নেই।

জাঁকজকমপূর্ণ বোরকা পরিধান করা

বোরকা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য নয়। বরং সৌন্দর্য আবৃত রাখার জন্য। সুতরাং এমন বোরকাই পরতে হবে যা এই উদ্দেশ্য পূরণ করে। কিন্তু আমাদের সমাজে কোনো কোনো নারী এমন জাঁকজমকপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় প্রিন্টের বোরকা ব্যবহার করেন, যা অন্যের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ ধরনের বোরকা পরা কিছুতেই উচিত নয়। বোরকা সাদাসিধা হওয়া চাই, যাতে বোরকার উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

আল্লামা আলূসী রহ. বলেন, আমি মনে করি, কুরআন মাজীদে সৌন্দর্য প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এ সময়ের বিলাসী নারীদের বোরকাও অন্তর্ভুক্ত। তারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এমন ঝলমলে রেশমের এবং স্বর্ণ-রুপার কারুকাজ করা বোরকা পরিধান করে, যা মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এটা তাদের স্বামী এবং অভিভাবকদের গায়রতহীনতা যে, এভাবে তাদেরকে বাইরে বের হওয়ার এবং পরপুরুষের সামনে হাঁটা-চলা করার সুযোগ দেয়। এটি এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।[৪]

---

১. আপ কে মাসায়েল : ৮/৩৬৬

২. ইমাম মালেক রহ. মুওয়াত্তায় (পৃষ্ঠা : ৩৬৬) হযরত আলকামা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة، وكستها خمارا كثيفا.

৩. সহীহ বুখারী : ৫৮৮৫

৪. রূহুল মাআনী : ১৮/১৪৬; আল্লামা আলূসী রহ.-এর মূল ভাষ্য হল এই-

ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك.

রক্তদান

রক্ত মানুষের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নানা রোগের কারণে মানুষের মাঝে রক্তশূন্যতা দেখা যায়। যেমন, থ্যালাসেমিয়া রোগ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে অন্য মানব দেহ থেকে যথা নিয়মে রোগীর দেহে রক্ত প্রদান করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাছাড়া নানা অপারেশনের চিকিৎসায়ও রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা জগতে এই প্রয়োজনীয়তা একটি স্বীকৃত বিষয়। শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনে রক্ত আদান-প্রদান বৈধ।[২]

রক্ত ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান

রক্ত ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। অবশ্য ক্রয় ব্যতীত রক্ত পাওয়া না গেলে প্রয়োজনের সময় ক্রয় করা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য এর বিনিময় নেওয়া কিছুতেই বৈধ

---

১. শরহুন নববী : ১৪/২১৩-২১৪ (দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, বৈরুত); মিরকাতুল মাফাতিহ : ৮/৩৯৩ (আশরাফিয়া); তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম : ১০/৩২৩-৩২৫ (আশরাফিয়া)

২. সহিহ বুখারী : ২২৩৮ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ফাতহুল বারী : ৪/৫৩৭, তাতে আছে-

الحكم الخامس ثمن الدم واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة وقيل هو على ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعا.

ফিকহুল বুয়ূ : ১/৩০৮; আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়াহ : পৃ. ৫৮৩

হবে না।[1] হ্যাঁ, রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, তা গ্রহীতার কাছ থেকে নিতে পারবে।[2]

মুসলিমের জন্য অমুসলিমের রক্ত গ্রহণ

প্রয়োজন দেখা দিলে অমুসলিমের রক্ত গ্রহণ করাও জায়েয। তবে রক্ত যেহেতু শরীরেরই একটি অংশ এবং শরীরের ওপর এর প্রভাবও রয়েছে।[3] তাই সম্ভব হলে অমুসলিমের বা ফাসেক ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই ভালো।[4]

ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার শরয়ী বিধান

ইমার্জেন্সি বা জরুরি মুহূর্তে রক্তের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা বৈধ। এর কার্যক্রম চলবে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। রক্তের ব্যবসা করা ও মুনাফা লাভের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষের যে খরচ হয়েছে তা গ্রহীতার কাছ থেকে নেওয়া যাবে। তবে তা যেন প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশি না হয়। কারণ বেশি হলে তা রক্তের বিনিময় হয়ে যাবে, যা বৈধ নয়।[5]

প্রকাশ থাকে যে, প্রয়োজনের সময়ে স্বেচ্ছায় মানব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে রক্ত দান করা উচিত। এটি পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের রক্ত গ্রহণ করার বিধান

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে রক্ত দিতে সমস্যা নেই। এতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা ইসলামে বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য মৌলিকভাবে তিনটি সম্পর্ককে নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ

---

১. আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়াহ পৃ. ৫৮৩ :

ويجوز للإنسان المحتاج للدم أن يأخذه من الغير بعوض مالي إذا لم يجد متبرعًا، والإثم على الآخذ.

২. ফাতহুল বারী : ৪/৫৩; ফিকহুল বুয়ূ : ১/৩০৪

৩. ইনসানি আযা কা পাইওয়ান্দকারী (মুফতী শফী রা. কৃত) পৃ. ২৮

৪. আমরা রক্ত বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সরাসরি কথা বলার পর জানতে পেরেছি যে, মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন রক্ত বিশুদ্ধ ও গ্রহীতার জন্য উপযোগী হয় তখন রক্ত দাতা কে? সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো কাফের বা ফাসেকের রক্ত অন্যের শরীরে দেওয়ার দ্বারা এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ওই ব্যক্তির শরীরে পড়ে না

৫. মজলিসু হাইআতি কিবারিল উলামা, কারার নং ৬৫ :

يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على ألا يأخذ البنك مقابلًا ماليًا من المرضى أو أولياء أمورهم عوضًا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

১. বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন,
২. দুধ পান (শিশুর বয়স দুই বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)
৩. বংশ।

স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ের কোনোটিই পাওয়া যায় না। তাই তারা একে অপরের রক্ত দিতে কোনো সমস্যা নেই।[১]

সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা অটুট রাখার জন্য কসমেটিক সার্জারী করার বিধান

চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা অটুট রাখার লক্ষ্যে যে কসমেটিক সার্জারি করা হয়, এর দ্বারা দেখতে মনে হয় যেন চেহারার অবয়ব সৃষ্টিগতভাবেই এমন ছিল। এতে কৃত্রিম ও আসল রূপের মাঝে তফাত করা যায় না। একারণে এটা মানুষকে বিভ্রমে ফেলা ও আল্লাহ্র সৃষ্টিগত সৌন্দর্যে পরিবর্তনের নামান্তর। হাদীসে এসেছে-

> عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.
>
> **অর্থ :** সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে ও করায়, যে নারী ভ্রু উপড়ায় ও উপড়াতে বলে এবং যে নারী দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক বানায়। যে কাজগুলো দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়, এদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন।[২]

উক্ত হাদীসে সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্ট অবয়বে পরিবর্তন সাধনকারীর ওপর অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অতএব সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কসমেটিক সার্জারী করা শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে বৈধ নয়।[৩] তবে প্রয়োজনে কসমেটিক সার্জারী করা যাবে। যেমন, কারও আগুনে শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেছে। তাহলে তা কমমেটিক সার্জারীর মাধ্যমে ঠিক করা যাবে।[৪]

---

১ জাওয়াহিরুল ফিক্হ, আযায়ে ইনসানি কী পাইওয়ান্দকারী (মুফতী শফী রা. কৃত) পৃ ৪৯; ফাতাওয়া আশ শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরা : পৃ. ৮১৬

২. সহিহ মুসলিম : ৫৬৯৫

৩. আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়াহ পৃ. ১৯৩; কিতাবুন নাওয়াযিল-১৬/২২৬; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-৪/১৬৯ (আশরাফিয়া) :

والحاصل : أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغييرمنهي عنه. وأما ما تزينت به المرأة من تحمير الأيدي، أو الشفاه أو العارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلاً في النهي عند جمهور العلماء.

শরহুন নববী : ২/২২৫ :

وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه اشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلابأس.

৪. শরহুন নববী : ২/২২৫; তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম : ৪/১৬৯

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত আঙ্গুল কেটে ফেলা

অতিরিক্ত আঙ্গুল বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলা জায়েয আছে। এটা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন হিসেবে বিবেচিত হবে না।[১]

আঁকাবাঁকা অস্বাভাবিক দাঁত চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা

কারো দাঁত যদি অস্বাভাবিক বড়ো কিংবা সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে বা আঁকাবাঁকা থাকে তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে সেগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে।[২]

কাটা ঠোঁট অপারেশনের মাধ্যমে জোড়া লাগানো

কাটা ঠোঁট শরীরের মাঝে একটি ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব অস্ত্রপোচারের মাধ্যমে তা জোড়া দেওয়া শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ।[৩]

ক্লোনিং এর শরয়ী বিধান

সংশ্লিষ্টদের ভাষ্যমতে পুরুষ মহিলার শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণ ছাড়াই ক্লোনিং এর মাধ্যমে সন্তান হতে পারে। যেকোনো জীব থেকে কোষ সংগ্রহ করে নির্ধারিত নিয়মে পরিচর্যা করার মাধ্যমে ক্লোন শিশু জন্ম হয়। ক্লোন শিশু মূলত ফটোকপির মতো। অর্থাৎ যার কোষ সংগ্রহ করা হয়েছে তার অবিকল আকৃতি সে ধারণ করবে। তার মধ্যে যেসব গুণাবলি থাকবে ক্লোনের মধ্যেও সেগুলো থাকবে। তবে এই বিষয়টি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। পৃথিবীতে এখনো কোনো ক্লোন মানব এসেছে কি না তা আদৌ প্রমাণিত নয়। ক্লোনিং মানুষ ছাড়াও গাছপালা ও জীবজন্তুর মাঝেও হয়ে থাকে। তবে এখানে আমরা ক্লোনিং-এর মৌলিক শরয়ী বিধান বর্ণনা করব।

গাছপালা ও পশু-পাখির ক্লোনিং

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ ছাড়া এ দুনিয়ায় যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সবই করেছেন মানুষের কল্যাণে এবং সবকিছুর ওপর মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

---

১. তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম : ৪/১৬০ (মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচি); ফাতহুল বারী : ১০/৩৭৭ (দারুল মারিফা, বৈরুত); ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়াহ : ১৮/৩৩৪; ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম : ১৬৮৭; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ : ৫/৩৬০

إذا أراد الرجل أن يقطع اصبعا زائدة او شيئا آخر، قال نصير: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك، فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة، فهو في سعة من ذلك.

২. ফাতহুল বারী : ১০/৩৭৭ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত) :

ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الاكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة.

৩. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ : ৫/৩৬০

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ.

অর্থ : আর যা কিছু আসমান সমূহে ও ভূপৃষ্ঠে আছে তিনি সবকিছুই তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন নিজের পক্ষ থেকে।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[২]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত শর্ত স্বাপেক্ষে গাছ-গাছালি ও পশু পাখির মধ্যে ক্লোনিং জায়েয:

ক. ক্লোনিং-এর উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। অর্থাৎ মানব কল্যাণের জন্যই হতে হবে। নিছক কৌতুহল মেটানোর জন্য অথবা চিত্তবিনোদনের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে তামাশা করা যাবে না।

খ. অকারণে যেন কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ. ক্লোনিং করতে গিয়ে নিজেকে স্রষ্টা ভাবা যাবে না। বরং আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান সৎকাজে লাগাতে পেরে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

মানব ক্লোনিং

মানব ক্লোনিং সম্পূর্ণরূপে হারাম। ক্লোনমানব সৃষ্টির জন্য গবেষণা করা, এ ব্যাপারে অর্থ, সময় ও মেধা ব্যয় করা শরীয়াহ্ বিরোধী কাজ। কারণ:

১. আল্লাহ মানুষ প্রজননের একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি ও ধারা প্রথম মানব হযরত আদম আ. থেকে শুরু করেছেন। তিনি মানুষকে দিয়েছেন বিবাহের বিধান। মা-বাবার মাধ্যমে মানব শিশু জন্ম নিয়ে তাদের আদর-মমতা ও ভালোবাসায় বড়ো হয়েই মানুষ পরিণত হয়েছে সামাজিক জীবে। অথচ ক্লোনিং পদ্ধতিতে এর কোনোটিই নেই।

২. শরীয়তে পিতৃত্ব তথা নসবের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ ক্লোনিংয়ে এসবের কোনো বালাই নেই।

৩. পৃথিবীতে সকল মানুষ চেহারা ও আকৃতিতে কোনো না কোনো দিক থেকে অন্যজন থেকে ভিন্ন। এমনকি একজনের আঙ্গুলের ছাপও অন্যজন থেকে ভিন্ন। কিন্তু যদি ক্লোনিং-এর মাধ্যমে একই আকৃতি ও প্রকৃতির মানুষ হতে থাকে, তাহলে স্বভাবতই

---

১. সূরা জাসিয়া, আয়াত : ১৩
২. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯

ব্যক্তি পরিচয় নিয়ে চরম বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এটা থেকে বেঁচে থাকা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরি।[১]

টেস্ট টিউব (TEST TUBE BABY)

টেস্টটিউব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্মদানে অক্ষম মা-বাবাদের জন্য মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভের একটি আধুনিক পদ্ধতি বা বন্ধ্যাত্ব রোগের আধুনিক চিকিৎসা। সাধারণত এ পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে যেসকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. স্বামী যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার শুক্রাণু স্ত্রীর বাচ্চাদানিতে পৌছাতে অক্ষম হয়, তখন তার বীর্য ও তার স্ত্রীর ডিম্বাণু সংগ্রহ করে যন্ত্রের সাহায্যে স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে স্ত্রী সন্তানদানে সক্ষম হয়।

২. একজন মহিলার ডিম্বাণুর মধ্যে সন্তান জন্মদানের উপাদান রয়েছে, তার স্বামীও এ ব্যাপারে সুস্থ, কিন্তু মহিলার কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে তার বাচ্চাদানিতে ডিম্বাণু এসে পৌঁছায় না; ফলে মহিলার সন্তান হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ ওই মহিলার ডিম্বাণু এবং তার স্বামীর শুক্রাণু বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় একটি মেয়াদ পর্যন্ত টিউবে রাখে। এরপর ওই টিউব মহিলার জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। এবং এভাবে সে সন্তান জন্মদান করে।

৩. স্ত্রীর ডিম্বাণু ঠিক আছে কিন্তু স্বামীর বীর্য শুক্রকীট শূন্য; অর্থাৎ সে সন্তান জন্মদানে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে অন্য কোনো পুরুষের শুক্রাণু সংগ্রহ করে উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বনে ক্ষেত্রবিশেষে মহিলা সন্তান প্রসব করে থাকে।

৪. স্ত্রীর ডিম্বাণুতে সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো উপাদান নেই; কিন্তু স্বামী সুস্থ। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মহিলার ডিম্বাণু সংগ্রহ করে ওই মহিলার স্বামীর শুক্রাণুর সাথে মিলিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর তা এ মহিলার বাচ্চাদানিতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

৫. কোনো মহিলার স্বামী নেই অথবা স্বামীর সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা নেই। কিন্তু মহিলা মা হতে আগ্রহী, এক্ষেত্রে অন্য কোনো পুরুষের শুক্রাণু সংগ্রহ করে টেস্টটিউব পদ্ধতিতে মহিলাকে মা বানানো হয়।

৬. একজন মহিলার বাচ্চাদানি সন্তান ধারণে সক্ষম নয়। কিন্তু মহিলাটির ডিম্বাণু এবং তার স্বামীর শুক্রাণু ঠিক আছে এবং মহিলাটি মা হতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তাদের উভয়ের উপাদান নিয়ে টেস্টটিউব পদ্ধতিতে অন্য কোন মহিলার বাচ্চাদানিতে স্থাপন করে সন্তান জন্ম দেওয়া হয়।

---

১. কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা (কারার নং ৯৪/২/১০); ইন্ডিয়া ফিক্‌হ একাডেমি (রেজুলেশন সমগ্র-২৪-২৭ অক্টোবর, ১৯৯৭); জাদিদ ফিকহি মাসায়েল : ৫/১৬৭

৭. একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী রয়েছে। তাদের একজন সন্তান জন্মদানে সক্ষম অপরজন অক্ষম; কিন্তু তার ডিম্বাণু ঠিক আছে। আবার সে মা হতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার উপাদানগুলো নিয়ে টেস্টটিউবের মাধ্যমে মহিলার সতীনের বাচ্চাদানিতে স্থাপন করা হয়। এভাবে এক সতীন অন্য সতীনের জন্য সন্তান জন্মদান করে থাকে।

প্রক্রিয়াগুলোর শরয়ী বিশ্লেষণ

টেস্টটিউবের উপর্যুক্ত সাতটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু আপত্তি রয়েছে। যেমন:

ক. এটা সন্তান জন্মদানে চিরাচরিত প্রক্রিয়ার বাইরে অস্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া।

খ. এতে চিকিৎসক ও তার সহকর্মীদের মহিলার সতর দেখা হয়। এ দুটি বিষয় তো সবগুলো পদ্ধতির মাঝেই পাওয়া যায়।

গ. এই প্রক্রিয়ার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন পরপুরুষের সাথে একজন নারীর একান্তে অবস্থান করতে হয়।

ঘ. স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ বা মহিলার উপাদান দিয়ে মা-বাবা হওয়া।

ঙ. সতীনের গর্ভে নিজ সন্তান প্রসব করানো।

চ. এই চিকিৎসা যে ক্লিনিকে দেওয়া হচ্ছে সেখানে ভুলক্রমে একজনের শুক্রাণু বা ডিম্বাণু অপরজনের ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর সাথে মিশে যেতে পারে। যার কারণে বংশ পরিচয় ঠিক থাকবে না।

একজোড়া দম্পত্তির মা-বাবা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক এবং এটা বিবাহের মূল উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে অন্যতম। কিন্তু এরপরেও অনেক দম্পত্তি বিভিন্ন কারণে নিঃসন্তান থেকে যায়; এটিও বাস্তব সত্য। টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে শরয়ী যে সমস্যা ও খারাবী সৃষ্টি হয় এসব কারণে একটি মুসলিম দম্পত্তির জন্য সর্বোত্তম ও নিরাপদ হলো এ প্রক্রিয়ায় সন্তান গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করে ধৈর্য ধারণ করা। তথাপি যদি কেউ টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান ধারণে আগ্রহী হয় এবং বাস্তবেই তার ওজর থাকে তবে শুধু প্রথম দুটি ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেখানে শুধু স্বামী-স্ত্রীর উপাদানই নেওয়া হয়। এবং স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।) নিম্নোক্ত শর্তগুলো পালন সাপেক্ষে তা জায়েয:

১. একান্ত ওযরের ক্ষেত্রেই তা করবে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান ধারণ হয় না, দম্পত্তিটি নিঃসন্তান এবং তারা মা বাবা হতে খুবই আগ্রহী।

২. টেস্টটিউবের পুরো প্রক্রিয়াটিতে চিকিৎসক শুধু এতটুকু কাজে অংশগ্রহণ করবে যা স্বামী-স্ত্রী নিজ হাতে করা সম্ভব না।

৩. রোগিণীর শরীরের নিম্নাঙ্গের শুধু এতটুকুতে দৃষ্টি দিবে যতটুকু দেখা তার জন্য খুবই জরুরি।

৪. সম্ভব হলে মহিলা ডাক্তার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে পুরুষ চিকিৎসকের সাথে মহিলাটি একান্তে অবস্থান করবে না, বরং সেখানে মহিলার স্বামীকে রাখতে হবে; তাও সম্ভব না হলে ডাক্তারের মাহরাম অন্য কোনো মহিলাকে রাখবে। তবে সে সতরের দিকে তাকাবে না।

প্রথম দুটি পদ্ধতি ছাড়া অন্য পাঁচটি পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ ওই পাঁচটি পদ্ধতির মাঝে স্বামী-স্ত্রী দুজনের একজন অথবা উভয়ের বাইরে তৃতীয়জনের উপাদান সন্তান ধারণের সাথে যোগ হয়ে থাকে। যা শরীয়াহ্ সম্পূর্ণ হারাম। কেননা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো উপাদান বা অন্যের গর্ভে স্বামী-স্ত্রীর উপাদান সংরক্ষণ করে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি একের ক্ষেতে অন্যের শষ্য রোপণের নামান্তর। এটি অভিশপ্ত কবীরা গুনাহ। এছাড়া এতে বংশ-পরিচয় নির্ধারণেরও একটি দুরূহ সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ দিক থেকেও এ পন্থা অবলম্বন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ।[১]

জন্ম নিয়ন্ত্রণ (birth control)

বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিছু স্থায়ী পদ্ধতি। আর কিছু অস্থায়ী পদ্ধতি। স্থায়ী পদ্ধতি বলতে বুঝায়, এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যার কারণে পুরুষ বা নারীর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে এতে যৌন ক্ষমতা নষ্ট হয় না। নিম্নে কয়েকটি স্থায়ী পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো-

স্থায়ী পদ্ধতি

১. ভ্যাসেক্টমি (vasectomy) (পুরুষের জন্য)। এই পদ্ধতিতে পুরুষের শুক্রবাহী দু'টি নালী কেটে নালীর মুখ সুতা দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে দেওয়া হয়।

২. টিউবাল লাইগেশন (tuval ligation) (মহিলাদের জন্য)। অর্থাৎ অপারেশনের মাধ্যমে (ফেলোপিয়ন টিউব) ডিম্ববাহী নালি কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব জরায়ুতে আসতে পারে না। (তবে এ কারণে যৌন ক্ষমতা ও মাসিকে কোনো সমস্যা হয় না)

প্রকাশ থাকে যে, ভ্যাসেক্টমি ও টিউবাল লাইগেশনের ক্ষেত্রে যদি শুক্রবাহী ও ডিম্ববাহী নালি না কেটে শুধু নালীর মুখ বেঁধে দেওয়া হয় এবং এ পদ্ধতি অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথা অনুযায়ী অস্থায়ী পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এর বিধান

---

১. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা (কারার নং ১৬/৪/৩, ৫/৫/২); জাদীদ ফিকহি মাসায়েল: (৫:১৫১)

কোনো বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। মুফতি সাহেব সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সমাধান বলে দিবেন।

৩. হিসটারেকটমি (Hysterectomy) (জরায়ুচ্ছেদ)। এই পদ্ধতিতে জরায়ু কেটে ফেলা হয়।

৪. কোনো ঔষধ বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো পন্থায় প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া।

বিধান

স্বাভাবিক অবস্থায় উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতি বা অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করা হারাম।[১] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করার পদ্ধতি ছিল খাসি হয়ে যাওয়া; অর্থাৎ, অণ্ডকোষ কেটে ফেলা। হাদীসে একে নিষেধ করা হয়েছে,

> عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا اَلَا نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.
>
> **অর্থ :** হযরত কায়েছ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে যেতাম, আর আমাদের সাথে জৈবিক চাহিদা মিটানোর কোনো কিছু থাকতো না (এতে আমরা যৌন পীড়নে ভুগতাম)। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খাসি হওয়ার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাদের এটা করতে নিষেধ করেছেন।[২]

অবশ্য জরায়ুতে ক্যান্সার বা এমন কোনো রোগ যদি হয়, যার কারণে জরায়ু কেটে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, সেক্ষেত্রে জরায়ু কেটে ফেলা জায়েয আছে। (যদিও এর

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ২/২০৭ (দারুল জীল, বৈরুত)

وكذلك جريان الرسم بقطع أعضاء النسل و استعمال الأدوية القامعة للباه والتبتل وغيرها تغيير لخلق الله واهمال لطلب النسل.

২. সহীহ বুখারী : ৫৯৭৫

কারণে সন্তান ধারণের ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়)।[1] কিংবা অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য মুসলিম ডাক্তার যদি সিদ্ধান্ত দেন যে, সন্তান ধারণ করলে প্রাণহানি বা কোনো অঙ্গহানির প্রবল আশঙ্কা আছে; তাহলে সেক্ষেত্রেও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ।[2]

অস্থায়ী পদ্ধতি

মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্যই অস্থায়ী পদ্ধতি রয়েছে। যেমন:

১. আযল (with drawl)। অর্থাৎ যৌন মিলনে যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করা।

২. সেফ পিরিয়ড (safe period) বা সহবাস নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ যে দিনগুলোতে ডিম্বাণু বের হয় সে দিনগুলো মিলন থেকে বিরত থাকা। এটি জানার সহজ পদ্ধতি হলো, প্রথমে জানুন, মাসিক নিয়মিত কি না? যদি নিয়মিত না হয় তথা কখনো বেশি দিন পর হয়, কখনো অল্প দিন পর হয়, তাহলে সবচেয়ে কম যতদিন পর মাসিক হয় তা থেকে ১৮ দিন বাদ দিতে হবে। আর সবচেয়ে বেশি যত দিন পর হয় তা থেকে ১০ দিন বাদ দিতে হবে। যেমন: কারো ২৮-৩০ দিন পর মাসিক হয়, তাহলে এখানে ২৮ হলো সবচেয়ে কম দিন। সুতরাং ২৮-১৮= ১০ দিন। এর অর্থ মাসিক শুরুর পর থেকে প্রথম ৯ দিন নিরাপদ। (অর্থাৎ মাসিক বন্ধ হওয়ার পর ৯ দিনের আর যে কয়দিন বাকী থাকবে তা নিরাপদ)। ১০ তম দিন থেকে অনিরাপদ দিন শুরু। আবার ৩০ দিন হলো সবচেয়ে বড়ো দিন। সুতরাং ৩০-১০= ২০ দিন। এর অর্থ ২১ তম দিন থেকে আবার নিরাপদ দিন শুরু হবে মাসিক শুরুর আগ পর্যন্ত।[3]

৩. কনডম ব্যবহার করা।

৪. স্পার্মিসাইড। এই পদ্ধতিতে জেলি, ফোম, ক্রিম, ফ্লিম ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে শুক্রাণু নষ্ট করে দেওয়া হয়।

৫. ডায়াফ্রাগাম ব্যবহার করা। এটি রাবারের তৈরি একটি ডোম বা গম্বুজ বিশেষ যা যৌনসঙ্গমের পূর্বে সারভিক্সে লাগিয়ে নিতে হয়। এর সাথে স্পার্মিসাইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬. ঢুস: অর্থাৎ পানির পিচকারী দিয়ে জরায়ু ধুয়ে ফেলা হয়।

---

১. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা- ৩৯/১/৫-

يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعانيها الشرعية.

২. ফতোয়ায়ে রহিমিয়া : ১০/১৮১; ফতোয়া মাহমুদিয়া : ১৮/২৯০; আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল : ৮/৪৮৯

৩. জন্মনিয়ন্ত্রণের সঠিক নিয়ম, ডা. সুমন চৌধুরী

৭. পিল বা জন্ম নিয়ন্ত্রক ঔষধ। এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। তবে এক্ষেত্রে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, রক্তজমাট বাঁধা, মুখ বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ পড়া ইত্যাদি।[১]

৮. ইঞ্জেকশন গ্রহণ করা।

বিধান

উপর্যুক্ত আটটি পদ্ধতির মাঝে ২য় পদ্ধতিটি গ্রহণ করা জায়েয। এছাড়া বাকি সাতটি পদ্ধতি শরীয়াহ্সম্মত কারণ ছাড়া গ্রহণ করা অনুত্তম।[২]

যেসব ক্ষেত্রে অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু ওযর আছে, যা শরীয়াহ্ সমর্থন করে। আর কিছু ওযর আছে, যা শরীয়াহ্ সমর্থন করে না। শরীয়াহ্ সমর্থিত ওযরগুলোর জন্য যদি নিয়ত সহীহ রেখে সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে তা বৈধ। নিয়ত সহীহ না থাকলে নিয়তের কারণে বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যেসকল ওযর শরীয়াহ্ সমর্থন করে না সেগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ত সহীহ হলেও তা বৈধ হবে না। নিম্নে কিছু শরীয়াহ্ সমর্থিত ওযর উল্লেখ করা হলো:

১. মহিলা অধিক দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণে সক্ষম না হওয়া বা প্রসবের ক্ষমতা না থাকা।[৩]
২. সন্তান ধারণ করলে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির আশঙ্কা থাকা।[৪]
৩. গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকিয়ে গেলে পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দেখা দেওয়া এবং দুধের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সামর্থ্য না থাকা।[৫]
৪. মা সফরে থাকা, যেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছা নেই।[৬]
৫. স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া, এ অবস্থায় বাচ্চা নিলে তার লালন-পালন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকা।[৭]

---

১. জাদিদ ফিকহি মাবাহিস : ৭/২৬৬
২. শরহুন নাববী : ১/৪৬৪-

ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام.

৩. জাওয়াহিরুল ফিক্হ : ৭/৮৮; ইন্ডিয়া ফিক্হ একাডেমি (রেজুলেশন সমগ্র-১৫৬, ২৩-২৫ শাবান ১৪০৯); ফিকহুল নাওয়াযেল : ৪/১৮; জাদীদ ফিকহি মাবাহিস : ১/৩১৪, ৩১৮, ৩২৭
৪. প্রাগুক্ত
৫. ইন্ডিয়া ফিক্হ একাডেমি-(রেজুলেশন সমগ্র,পৃ. ১৫৬) সেমিনার: ১-৩ এপ্রিল ১৯৮৯ খ্রি.; ফতোয়ায়ে ইবাদুর রাহমান-৭/১৪০
৬. জাওয়াহিরুল ফিক্হ ৭/৮৮
৭. প্রাগুক্ত

৬. মা বংশগত (জেনেটিক) কোনো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া যা বাচ্চার মাঝে সংক্রমিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।[১]

৭. প্রত্যেক সন্তানকে যথাযথ লালন-পালনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে দুই সন্তানের মাঝে পর্যাপ্ত বিরতি দেওয়া, যা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমবেশি হতে পারে।[২]

৮. মায়ের মানসিক অসুস্থতা থাকা। যেমন: পাগল বা অস্বাভাবিক হওয়া, মানসিক ভারসাম্য না থাকা।[৩]

৯. অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকা, যা সহ্য করার মতো নয়।[৪]

১০. কোনো কারণে মা সন্তান লালন-পালনে অক্ষম হওয়া এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা।[৫]

১১. অভিজ্ঞ ডাক্তারদের ভাষ্যানুযায়ী মা স্বাভাবিক প্রসবে অক্ষম হওয়া। বাচ্চা ধারণ করলে সিজারে বাধ্য হওয়া।[৬]

১২. মা 'দারুল হরব' বা কাফের রাষ্ট্রে অবস্থান করা এবং সন্তানের ব্যাপারে কুফরির আশঙ্কা করা।[৭]

এসব ক্ষেত্রে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সহীহ হলে অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, নিয়ত সঠিক হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র খালেক ও রিযিকদাতা জ্ঞান করা। সন্তান গ্রহণ করলে রিযিক কমে যাবে এমন ভ্রান্ত ধারণা না করা।

---

১. জাদিদ ফিকহি মাবাহিস : ১/৩১৭, ৩২৭

২. ফতোয়ায়ে কাসিমীয়াহ :২৩/২৮৯; মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা : ৩৯/১/৫

يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر.

৩. জাদীদ ফিক্‌হী মাবাহিস : ১/৩১৪-৩১৮

৪. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ : ৩০/৩৫

৫. জাদীদ ফিক্‌হী মাবাহিস : ১/৩১৪-৩৩১

৬. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা-রবিউস সানী ১৪০০ হি.; কারারাতু হাইআতি কিবারিল উলামা- রবিউস সানী ১৩৯৬ হি.

৭. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ : ৩০/৩৫

যেসব ক্ষেত্রে অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ নয়

নিম্নে এমন কিছু ওযর উল্লেখ করা হলো যা শরীয়াহ্ সমর্থন করে না। নিয়ত সহীহ হলেও এসব পদ্ধতি গ্রহণ করা নাজায়েয। যেমন:

১. সন্তান নিলে দরিদ্র হওয়ার কল্পিত আশঙ্কা করা।
২. অধিক সন্তান নেওয়াকে লজ্জার কারণ মনে করা।
৩. কন্যা সন্তান হওয়ার ভয়ে, যাতে পরবর্তীতে এদের বিয়ে-শাদীর ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৪. গর্ভ থেকে নিয়ে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। এরপর বড়ো হওয়া এমনকি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সন্তানের পেছনে সীমাহীন মেধা, সময় ও অর্থ ব্যয়ের ঝামেলায় না জড়ানো।
৫. মহিলার সৌন্দর্য দীর্ঘায়ত করার লক্ষ্যে সন্তান না নেওয়া।
৬. গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব বেদনা, নিফাস, (সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরবর্তী স্রাব) দুধ পান করানো এবং এর সেবা-যত্ন ইত্যাদির কষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য সন্তান না নেওয়া।
৭. "ছোট ফ্যামেলি" একটি ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। এই ফ্যাশন গ্রহণের ইচ্ছায় বাচ্চা না নেওয়া।[১] মনের রাখতে হবে, ফ্যাশন বা অধিক সন্তান লজ্জার বিষয় ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নয়; বরং হাদীসে অধিক সন্তানগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ.

অর্থ : তোমরা এমন নারীদের বিবাহ করো, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর গর্ব প্রকাশ করবো।[২]

অতএব জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর্যুক্ত কারণগুলো শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

সিজার (cesarean section)

'সিজার' মায়ের পেট ও জরায়ুর দেওয়াল কেটে বাচ্চা প্রসব করানোর একটি পদ্ধতি। এটা দুইভাবে হতে পারে। এক, প্ল্যানড সিজার। দুই, ইমার্জেন্সি সিজার।

---

১. জাদিদ ফিকহি মাবাহিস (সেজুলেশনসমগ্র ১/৩৯০)
২. আবু দাউদ : ২০১০; মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/৩৩৬-
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح، و قال الهيثمي: إسناده حسن.

প্ল্যানড সিজার

আমাদের সমাজে বিত্তবান নারীরা ছাড়াও অনেকে প্রসবের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় না গিয়ে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই সিজার করে থাকেন। কোনো কোনো মহিলা প্রসব ব্যথাকে ভয় পান এ কারণে সিজার করে থাকেন। অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ.

অর্থ : অতঃপর তিনি তার পথকে সহজ করে দেন।[১]

প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত ইবনে আব্বাস রা. সহ অনেক মুফাস্সিরে কেরাম এই আয়াতের অর্থ করেন যে, আল্লাহ বাচ্চাকে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথকে সহজ করে দিয়েছেন।[২]

এটা ওই মহান প্রভুর কুদরতের কারিশমা। সুতরাং এ নিয়ে দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই ধরনের সিজারে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশি এবং অনেক ফায়দা থেকে নারী এক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। যেমন:

১. এই প্রসব ব্যথার কারণে গুনাহ মাফ হয়।
২. এটা দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, যদি সে এই ব্যাথার ওপর ধৈর্যধারণ করে এবং এটাকে সওয়াবের কারণ মনে করে।
৩. এর মাধ্যমে সে তার মায়ের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয় যে, তিনিও এমন কষ্ট পেয়েছেন।
৪. যেহেতু এতে অনেক কষ্ট হয়, এ কারণে কষ্টের মাধ্যমে যে সন্তান লাভ করেছে তার প্রতি স্নেহ মমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. সিজারের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ সিজারে জরায়ু ও পেটের পর্দা দুর্বল হয়ে যায়।
৬. অধিক সন্তান নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ একাধিকবার কাটার কারণে পেট দুর্বল হয়ে যায়, ফলে পরবর্তীতে গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।
৭. প্রয়োজন ছাড়া এই সিজার এক ধরনের বিলাসিতা।

---

১. সূরা আবাছা, আয়াত : ২০
২. তাফসিরে ইবনে কাসীর : ৮/৩২৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)-
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، قالَ العَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ثُمَّ يَسَّرَ عَلَيْه خُرُوجَهُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، وكَذا قالَ عِكْرِمَةُ والضَّحّاكُ وأبُو صالِحٍ وقَتادَةُ والسُّدِّيُّ واخْتارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

অতএব প্রসবের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে প্রয়োজন ছাড়া সিজারের অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা বৈধ হবে না।[১]

---

১. লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ-৮৬/২৮ (শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন কৃত):

السؤال: فضيلة الشيخ ! يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس : (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) عبس/٢٠ ، فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود ، ويلاحظ كثيرٌ من الناس من الرجال والنساء الاستعجال للقيام بعملية ما تسمى بالقيصرية، فهل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى ؟.

{فأجاب: } أرى - بارك الله فيك - أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن عندما تحس المرأة بالطلْق تذهب إلى المستشفى ، ويصنع لها عملية قيصرية : أرى أن هذا من وحي الشيطان ، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه ؛ لأن المرأة لابد أن تجد ألماً عند الطلق ، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد:

الفائدة الأولى : أنه تكفير للسيئات.

الثاني : أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت.

والثالث : أن تعرف المرأة قدْر الأم التي أصابها مثلما أصاب هذه المرأة.

والرابع : أن تعرف قدر نعمة الله تعالى عليها بالعافية.

والخامس : أن يزيد حنانها على ابنها ؛ لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق ، وإليه أحن.

والسادس : أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من مخارجه المعروفة المألوفة ، وفي هذا خير له وللمرأة.

والسابع : أنها تتوقع بذلك ضرر العملية ؛ لأن العملية تضعف غشاء الرحم وغير ذلك ، وربما يحصل له تمزق ، وقد تنجح ، وقد لا تنجح.

والثامن : أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي ؛ لأنه لا يمكنها ، وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات.

والتاسع : أن في إجراء العمليات تقليلاً للنسل ، وإذا شق البطن ثلاث مرات من مواضع مختلفة وهَنَ وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيراً.

والعاشر : أن هذه طريقة من طرق الترف ، والترف سبب للهلاك ، كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال : (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ) الواقعة/٤٥. فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب ، وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية ؛ فإن ذلك خير لها في الحال ، وفي المآل ، وعلى الرجال أيضاً هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر.

السائل : ما مفهوم الترف ؟

الشيخ : الترف : أن فيه اجتناب ألم المخاض الطبيعي ، وهذا نوع من الترف ، والترف إذا لم يكن معيناً على طاعة الله : فهو إما مذموم ، أو على الأقل مباح.

ইমার্জেন্সি সিজার

ইমার্জেন্সি সিজার। অর্থাৎ যখন সিজার না করলে মা বা বাচ্চার বড়ো ধরনের ক্ষতি বা প্রাণহানির আশঙ্কা হয়। এক্ষেত্রে মা ও বাচ্চার অবস্থাভেদে সিজারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন:

১. মা মৃত কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা যেমন: আল্টাসনোগ্রাফ বা অন্য কোনো উপায়ে যদি জানা যায় যে, মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা জীবিত; তাহলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা বের করে আনবে।[১]

২. বাচ্চা মৃত মা জীবিত, এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা বের করা সম্ভব না হলে এবং সিজার ছাড়া অন্য কোনো ভাবে বাচ্চা বের করা সম্ভব না হলে সিজারের মাধ্যমে বের করবে।

৩. মা ও বাচ্চা জীবিত, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রসবে বাচ্চা বা মা মারা যাওয়ার আশঙ্কা। এ অবস্থায়ও সিজার করে বাচ্চা বের করে আনবে।

৪. বাচ্চা ও মা উভয়েই যদি মৃত হয় তাহলে সিজার করে বাচ্চা বের করার প্রয়োজন নেই। পেট কাটা ছাড়াই বাচ্চাসহ মাকে দাফন করে দিবে।[২]

৫. অবস্থা যদি এমন হয় যে, মা ও বাচ্চা জীবিত আছে, কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে বাচ্চাকে মেরে বের না করলে মা ও বাচ্চা উভয়েই মৃত্যুবরণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাচ্চার বয়স যদি ছয় মাস বা তার অধিক হয় তাহলে জীবিত থাকার ক্ষেত্রে মা ও বাচ্চা উভয়জন সমান। এ কারণে একজনের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যজনের জীবননাশ করা যাবে না।[৩] আর যদি বাচ্চার বয়স ছয় মাসের কম হয়, তাহলে এক্ষেত্রে মাকে জীবিত রাখার জন্য বাচ্চাকে মেরে ফেলার অবকাশ রয়েছে।[৪]

সিজার থেকে বেঁচে থাকার উপায়

বর্তমানে সিজার একটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। বিশেষকরে শহরগুলোতে দেখা যায়, অধিকাংশ বাচ্চাই সিজারে জন্ম নিচ্ছে। অনেক মা বাধ্য হচ্ছেন সিজার করতে। এর থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী হতে পারে?

---

১. ফাতহুল কাদির : ২/১৫০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত); আদ্দুররুল মুখতার-৩/১৪৫ (যাকারিয়া)
২. আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়্যাহ (শায়খ মুহাম্মাদ আশ শানক্বীতি কৃত) পৃ. ১৫৫-১৫৮, ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ১৫৫-১৫৭
৩. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ১৫৮; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ৫/৩৬০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)-
إذا اعْتَرَضَ الوَلَدُ فِي بَطْنِ الحامِلِ ولَمْ يَجِدُوا سَبِيلًا لِاسْتِخْراجِ الوَلَدِ إلّا بِقَطْعِ الوَلَدِ إرْبًا إرْبًا ولَوْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ يَخافُ عَلَى الأُمِّ قالُوا إنْ كانَ الوَلَدُ مَيِّتًا فِي البَطْنِ لا بَأْسَ بِهِ وإنْ كانَ حَيًّا لَمْ نَرَ جَوازَ قَطْعِ الوَلَدِ إرْبًا إرْبًا كَذا فِي فَتاوى قاضِي خانْ.
৪. রদ্দুল মুহতার : ৯/৬১৫ (যাকারিয়া); ফতোয়ায়ে কাসিমীয়াহ : ২৩/২৮৩

আসলে এর জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এটি মাসআলার বিষয় নয়। তবে সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে প্রসবের জন্য কিছু আমলের কথা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলে থাকেন। তা হলো, সূরা ইনশিক্বাক: ১-৫, সূরা নাযিআত: ৪৬, ও সূরা ইউসূফ: ১১১ নং আয়াতগুলো চীনা মাটির প্লেটের ওপর লিখে পানির মধ্যে তা ধুয়ে নিবে। অতঃপর ওই পানি গর্ভবতী মহিলাকে পান করাবে এবং কিছু পানি মহিলার পেটের ওপর ছিটিয়ে দিবে।

অথবা নিম্নোক্ত দুআটি চীনা মাটির প্লেটের ওপর লিখে পানির মধ্যে তা ধুয়ে নিবে। অতঃপর ওই পানি গর্ভবতি মহিলাকে পান করাবে এবং কিছু পানি মহিলার পেটের ওপর ছিটাবে। আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ, এ আমলের বরকতে সন্তান সহজে ভূমিষ্ট হবে।[১]

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش
العظيم الكريم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ.

অঙ্গ প্রতিস্থাপন (ORGAN DISPLACEMENT)

নিজ দেহের কোনো অঙ্গ অন্য স্থানে স্থানান্তর

নিজ দেহের কোনো অঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংযোজন করা নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বৈধ ও জায়েয:

১. অঙ্গ সরানোর দ্বারা যে ক্ষতি হবে তা অন্য জায়গায় সংযোজন করলে ওই ক্ষতির তুলনায় অধিক উপকার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকা।

২. কোনো অঙ্গ নষ্ট কিংবা অকেজো হয়ে যাওয়া। যেমন: দেহের কোনো জায়গায় চামড়া নষ্ট অথবা অকেজো হয়ে গেছে, তাই অন্য জায়গা থেকে রগ বা চামড়া কেটে এনে এখানে জোড়া দেওয়া।

৩. কোনো অঙ্গের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই অন্য জায়গা থেকে কিছু গোশত কেটে এনে বিকৃত আকৃতিকে ঠিক করে দেওয়া।

৪. কোনো দোষ তথা বিশ্রী অবস্থা দূর করার জন্য। যেমন: পচন ধরা কিংবা পুড়ে যাওয়ার কারণে কোনো অঙ্গ বিকৃত হয়ে গেছে। তাই অন্য স্থান থেকে গোশত কিংবা চামড়া এনে ওই বিশ্রী অঙ্গ সুশ্রী করে দেওয়া।

৫. কোনো অঙ্গ এমন কুৎসিত হওয়া যা অন্যের জন্য ঘৃণা অথবা কষ্টের কারণ হয়। যেমন: একজিমা কিংবা পুঁজ পড়া ইত্যাদি। তাই দূষিত অঙ্গটি কেটে ফেলে দিয়ে অন্য স্থান থেকে কিছু অংশ কেটে এনে লাগিয়ে দেওয়া। যাতে করে আর কুৎসিত বা ঘৃণিত না থাকে।[২]

---

১. মেরে ওয়ালিদে মাজিদ আওর উনকা মুজাররাব আমালিয়্যাত, মুফতী শফী রহ. কৃত : পৃ. ১০৩
২. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা : কারার নং ২৬/১/৪; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ১৬৩

একজনের অঙ্গ অন্য জনের দেহে সংযোজন

কারো দেহের কোনো অংশ অন্য জনের দেহে স্থানান্তর ও প্রতিস্থাপন কয়েকভাবে হতে পারে। যথা:

ক) অঙ্গটি এমন হওয়া যার ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। এ ধরনের অঙ্গ আবার দুই প্রকার যথা:

১. এমন অঙ্গ যা একজনের একটিই থাকে। যেমন: হার্ট, কলিজা ও ব্রেন ইত্যাদি। এ ধরনের অঙ্গ স্থানান্তরের জন্য অস্ত্রোপচার ও স্থানান্তর করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। কারণ এতে যার অঙ্গটি নেওয়া হবে সে মারা যাবে। একজনের জীবন বাঁচানোর জন্য আরেকজনের জীবন নষ্ট করা বৈধ নয়।

২. এমন অঙ্গ যা দেহে একাধিক থাকে। যেমন: কিডনি ও ফুসফুস ইত্যাদি। শরীয়াহ্ নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে এর জন্য অস্ত্রোপচার ও এ ধরনের অঙ্গ স্থানান্তর করা জায়েয ও বৈধ।[১] শর্তগুলো হলো:

- অঙ্গ সংযোজন না করলে রোগী মারা যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হওয়া।
- অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলা যে, এতে রোগীর জীবন বেঁচে যাবে। আর অঙ্গদাতার তেমন মারাত্মক কোনো ক্ষতি হবে না।
- মৃত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ নিতে হলে তার জীবদ্দশায় এর অনুমতি দিয়ে যেতে হবে। কেননা সে এক হিসেবে নিজের দেহের মালিক।
- তার ওয়ারিশদেরও অনুমতি থাকতে হবে। কেননা মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ তার লাশের অভিভাবক। এজন্যই তো তাদের ঘাতকের কিসাসের দাবির অধিকার রয়েছে।

---

১. বিশ্বের বিভিন্ন শরীয়াহ কাউন্সিল/ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত উক্ত মতের উপর গৃহীত হয়। যেমন:

قررات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة لرلبطة العالم الإسلامي-الدورة الثامنة المنعقدة في ٢٧ ربيع الآخر ١٤٠٥ ه – ٨جمادى الأولى ١٤٠٥

-قرارت مجمع الفقه الإسلامي بالهند – المنعقدة في ٩-١١ جمادى الأولى ١٤٣٦ ه

-قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية – المنعقدة في شوال ١٣٩٨ ه

-قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة –رقم القرار ٤/١/٢٦

- لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى رقم ٤٩١

-مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت برقم ٩٧ ع/٨٤ في ٢٢ ربيع الآخر عام ١٤٠٥ ه

- فتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١١/ ١٩٨٤/٤ م الموافق ١/ ١٤٠٤/٧ ه

আরো দ্রষ্টব্য: আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়াহ : পৃ. ১৯৩; জাদিদ ফিকহি মাসায়েল ৫/৮৮-৮৯; ফিকহুন নাওয়াযিল : ১/২২৮।

- জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ নিতে হলে তার অনুমতি আবশ্যক এবং এতে বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি না হতে হবে। কারণ এক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তার সমপরিমাণ কিংবা এর চেয়েও বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া বৈধ নয়।[১]

খ) এমন অঙ্গ যার ওপর জীবন নির্ভরশীল নয়। তবে অঙ্গটি মানুষের মৌলিক কাজে ব্যবহার হয়। যেমনঃ চক্ষু। এ ধরনের অঙ্গ অন্যকে দিয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

গ) অঙ্গটি এমন হওয়া যা সরিয়ে নিলে পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমনঃ রক্ত ও চামড়া ইত্যাদি। এগুলো স্থানান্তর শর্তসাপেক্ষে জায়েয ও বৈধ।

ঘ) ওই সমস্ত অঙ্গ যা কারো দেহ থেকে এমনিতেই পৃথক হয়ে গেছে অথবা কোনো কারণবশতঃ পৃথক করা হয়েছে, তবে তা আর পুনরায় ওই দেহে লাগানো হবে না। এমন অঙ্গ অন্যের দেহে সংযোজনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বৈধ।[২]

মুসলমানের দেহে অমুসলিমের অঙ্গ সংযোজন

প্রয়োজন হলে মুসলমানের দেহে অমুসলিমের অঙ্গ-ও সংযোজন করা বৈধ।[৩] তবে কাফের-মুশরিক ও ফাসেক-ফাজেরের মধ্যে কদর্যতা ও অশুভ চরিত্রের যে কু-প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা গ্রহীতার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। এজন্যই বুজুর্গানে দীন ফাসেক মহিলার দুধ পান করাকে পছন্দ করেন না। অতএব কাফের-ফাসেকদের অঙ্গ দীনদার, মুত্তাকী মুসলিমের দেহে সংযোজন থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকা চাই।[৪]

ডাক্তারি বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে মৃতদেহে অস্ত্রোপচার

ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের শারীরিক গঠন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বা ক্রিয়া বুঝার জন্য অস্ত্রোপচার জায়েয কিনা এ ব্যাপারে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়:

প্রথম অভিমত: ভারত উপমহাদেশের একদল উলামায়ে কেরাম তা নাজায়েয মনে করেন। তাঁদের মধ্যে মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.,[৫] মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী,[৬] হযরত মাওলানা মুফতি নিজাম উদ্দিন রহ.[৭] (মুফতিয়ে আযম, দারুল উলূম দেওবন্দ), মুফতি শাব্বির আহমদ কাসিমী[৮] প্রমুখ উলামায়ে কেরাম উল্লেখযোগ্য।

---

১. জাদিদ ফিকহি মাসায়েল : ৫/৮৮-৮৯; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ১৬৪
২. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা : কারার নং ২৬/১/৪
৩. জাদিদ ফিকহি মাসাইল : ৫/৮৩,৮৯; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা পৃ.১৬৪
৪. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ.১৭৪
৫. ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়াহ : ১৮/৩৪৩
৬. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল : ৪/৩৩৬
৭. মুনতাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৪১২-৪১৩
৮. ফতোয়ায়ে কাসিমিয়াহ : ১০/১০৭

দ্বিতীয় অভিমত: আরব বিশ্বের অধিকাংশ আলেমগণ ও ভারত উপমহাদেশের একদল উলামায়ে কেরাম তা জায়েয বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতি মাহদী হাসান রহ., মুফতি আজম পাকিস্তান আল্লামা রফী উসমানী রহ., শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.,[১] মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী দা.বা.[২] প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেন, যেহেতু জীবিত ব্যক্তির কারণে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির অস্ত্রোপচার জায়েয আছে (যেমন পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে) তাই বহু জীবিত রোগীর উপকারার্থে মৃত ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করা তো আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত।[৩]

বিশ্বের বিভিন্ন শরীয়াহ্ কাউন্সিল/ ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তবলী উক্ত মতের ওপর গৃহীত হয়।[৪] সমকালীন মুফতিয়ানে কেরামের অনেকেই উক্ত মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

মরণোত্তর চক্ষুদান

নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মরণোত্তর চক্ষুদান বৈধ:

১. দাতার জীবদ্দশায় অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের অনুমতি থাকা। কেননা মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ তার লাশের অভিভাবক।

২. তার চক্ষু জীবিত ব্যক্তির চোখে স্থাপন করলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার প্রবল ধারণা থাকা।

৩. বিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলা যে, এমন করলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।[৫]

কিডনি দান: শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ

স্বাভাবিক অবস্থায় কিডনি দান বৈধ নয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কিডনি দান বৈধ আছে :[৬]

---

১. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. : ১৭৬

২. জাদিদ ফিকহি মাসাইল : ১/৩২৮-৩২৯

৩. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. : ১৭৬

৪. বিশ্বের বিভিন্ন শরীয়াহ কাউন্সিল/ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত। যেমন-

(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة) (ص ٢١١) الدورة العاشرة - صفر ١٤٠٨

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الدورة التاسعة عام ١٣٩٦ هـ/١٩٧٦ م رقم القرار ٤٧ تاريخ ١٣٩٦/٨/٢٠ هـ

لجنةُ الفتوَى بالأزهرِ فتوى رقم (٤٩٠) بتاريخ ١٩٧١/٢/٢٩ ، ونُشِرَت بمجلة الأزهر عدد نوفمبر ١٩٦٢م.

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. ص ١٣٣٣_

لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية -صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ ١٩٧١/٢/٢٩ م

৫. জাদিদ ফিকহি মাসাইল : ৫/৮৮-৮৯; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা পৃ. ১৮১

৬. মুনতাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৩৮৫,৩৮৬

১. ডাক্তারদের মতে কোনো ব্যক্তির দুটি কিডনির একটি দিয়ে দিলে স্বাভাবিকভাবে দাতার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না।[১]
২. রোগীর অবস্থা এমন হওয়া যে, তার নষ্ট কিডনি পরিবর্তন করে ভালো কিডনি প্রতিস্থাপন না করা হলে তার মৃত্যু ঘটবে।
৩. কিডনি প্রতিস্থাপন করা ছাড়া চিকিৎসার বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা।
৪. দাতার অনুমতি থাকা।
৫. অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনা থাকা।[২]

উল্লেখ্য, কোনো অবস্থাতেই কিডনি বিক্রি করা এবং এর মূল্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।[৩]

চিকিৎসা পেশা ও আর্থিক লেনদেন

মেডিকেল টেস্টে ডাক্তারদের কমিশন: একটি শরয়ী পর্যবেক্ষণ

বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি ব্যবসা হলো কমিশন বাণিজ্য। ডাক্তারদের সাথে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবগুলোর সাথে আন্তযোগাযোগ/চুক্তি থাকে। বিভিন্ন টেস্টের জন্য রোগী প্রেরণ বাবদ ডাক্তারগণ ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো থেকে পেয়ে থাকেন ক্ষেত্রভেদে ৩০%, ৪০%, ৫০% বা তারও বেশি অঙ্কের কমিশন। অর্থাৎ যেখানে একজন রোগী বিভিন্ন টেস্টের জন্য ফি বাবদ ১০০০/= প্রদান করে থাকে সেখানে প্রেরণকারী ডাক্তারের অংশ থাকে ৩০০-৪০০ টাকা।

প্রশ্ন হলো, প্যাথলজি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো টেস্টের জন্য ডাক্তারদের পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী যে কমিশন দিয়ে থাকে এর বিধান কী?

প্রথমেই জেনে নেই, ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক। মূলত ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক ইজারা (ভাড়া চুক্তি) চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একজন রোগী নির্দিষ্ট ফিতে একজন ডাক্তার থেকে ব্যবস্থাপত্র আনতে যাওয়ার অর্থ হলো-এক্ষেত্রে ডাক্তার হলেন আজীর (শ্রমিক) এবং রোগী হলেন মুস্তা'জির (নিয়োগদাতা)। রোগীর দায়িত্ব হলো ডাক্তারকে তার অবস্থা জানানো এবং নির্ধারিত ভিজিট প্রদান করা। আর ডাক্তারের দায়িত্ব হলো রোগীর জন্য প্রযোজ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। বাস্তবে হয়েও থাকে তাই।

---

১. মারকাযুল ফাতাওয়া : (ইসলাম ওয়েব) ফতোয়া নং ১১৬৬৭

العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.

২. জাদিদ ফিকহি মাসাইল : ৫/৮৮
৩. আহাম ফিকহি ফায়সালে : পৃ. ১৩; কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী-কারার নং ২৬/১/৪

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বিজ্ঞানে নব প্রযুক্তি যোগ হওয়ার পর এখন চিকিৎসকগণ রোগীর ব্যাধি নিরূপণের জন্য বিভিন্ন মেশিনারি ও কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য নিয়ে থাকেন। এরকম পরীক্ষাকেন্দ্র তথা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত, উপরের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল, মেডিকেল টেস্টগুলো ডাক্তারগণ করিয়ে থাকেন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব (রোগ নিরূপণ করে সঠিক প্রেসক্রিপশন দেওয়া) যথাযথভাবে আদায়ের সুবিধার্থে। তদ্রূপ কোনো ল্যাবে পরীক্ষা করালে ভালো হবে সেটাও বলে দেওয়া ডাক্তারের দায়িত্ব।

তিনটি ধাপে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের পর এবার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টের চার্জে রোগী প্রেরণকারী ডাক্তারের কমিশন গ্রহণের সুযোগ নেই।[১] কারণ, এক্ষেত্রে কমিশন গ্রহণের অর্থ হল, ডাক্তার সাহেব নিজ দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যই রোগী থেকে ডাবল অর্থ গ্রহণ করছেন, যা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ নয়।[২]

কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, ডাক্তার সাহেব তো কমিশন নিচ্ছেন ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে। রোগী থেকে নয়। তিনি উভয়ের মধ্যে মিডিয়া হিসাবে কাজ করছেন। এটি তার মধ্যস্থতার পারিশ্রমিক।

এর জবাব হলো, ক. ডাক্তার রোগীকে কোনো সেন্টারে প্রেরণ করবেন তা তিনি কমিশন নিয়ে নয়, বরং তার সর্বোচ্চ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে কমিশন লাভের ভিত্তিতে সেন্টার নির্বাচন তার পেশা ও দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

খ. আর একথা কি সত্য যে, ডাক্তারগণ এই কমিশন রোগী থেকে গ্রহণ করেন না? যদিও সরাসরি রোগী থেকে নেওয়া হয় না, বরং ল্যাব থেকে গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রকারান্তরে এ টাকাগুলো যে ভোক্তা তথা রোগীরই তা কি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে!

সারকথা, যে সকল কারণে এ কমিশন প্রথা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বর্জনীয় তা নিম্নরূপ-

---

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/৪১০-

سوال: حکیم و عطار میں جو چهارم کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، یعنی حکیم عطار سے یوں کہتا ہے کہ جس قدر ہم تمہارے یہاں نسخہ جات بذریعۂ مریض روانہ کریں اس میں جو قیمت وصول ہو اس میں سے چہارم ہم کو دینا، چنانچہ اسکو عطار تسلیم کرلیتا ہے، تو اب فرمائے کہ یہ چہارم عطار کو دینا اور حکیم کو لینا درست ہے یا نہیں الجواب: درست نہیں، انتہی

২. রদ্দুল মুহতার : ৫/৩৬২-

(قوله: أخذ القضاء برشوة) ....وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يري....

وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.

ক. ডাক্তার তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এমন অনিবার্য কাজের জন্য একই ব্যক্তি থেকে অতিরিক্ত ফী নিচ্ছেন। যা অবৈধ।

খ. কমিশন ভাগাভাগির কারণে এ দেশের গরিব অসহায় রোগীদের প্রায় দ্বিগুণ অর্থ গুণতে হচ্ছে।

গ. চড়া কমিশন প্রদান করে রোগী পেয়ে যাওয়ার সুবাদে অনেক নিম্নমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। পক্ষান্তরে যদি এই কমিশন প্রথা উঠে যেত তবে সেন্টারগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি হতো। সাধারণ মানুষ আরো ভালো সেবা পেত। আর চূড়ান্তরূপে লাভবান হতেন ডাক্তারগণ। কারণ স্বল্প খরচে অনেক রোগী পেয়ে যেতেন।

ঘ. উক্ত কমিশন গ্রহণের কারণে ডাক্তার স্বাধীনভাবে সেন্টার নির্বাচনে বাধাগ্রস্ত হন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করবেন ডাক্তারগণ?

এখন পরিস্থিতি এমন যে, সেন্টারগুলো কমিশন দিবেই। না করলেও পাঠিয়ে দেয়। এর থেকে উত্তরণের উপায় নিম্নরূপ-

ক. টেস্টকারী প্রতিষ্ঠানকে রোগীর বিল থেকে সে টাকা লেস্ করে দেওয়ার কথা বলে দিবেন।

খ. কমিশন বাবদ প্রাপ্য টাকা রোগীকে রিটার্ন দিয়ে দিবেন। কারণ, এটি মূলত তার হক।

ঔষধ কোম্পানি কর্তৃক ডাক্তার সাহেবদের প্রদেয় উপহার সামগ্রী

বিভিন্ন মেডিসিন প্রস্তুতকারকগণ ডাক্তারদের সময়ে সময়ে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে থাকেন। এসব উপহার সামগ্রী বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যথা-

এক. স্টেশনারি সামগ্রী। যেমন, কলম, খাতা, প্যাড, স্ট্যাপলার, স্লিপবক্স ইত্যাদি। এসকল পণ্যে কোম্পানির ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনেম ছাপানো থাকে। এগুলো প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, কোম্পানির প্রচার-প্রসার। এগুলো যে টেবিলেই রাখা হোক তা বিজ্ঞাপনের কাজ দেয়। এমন উপহারের বিধান হলো, উক্ত উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান ও গ্রহণ বৈধ।[১] কারণ, এর মাধ্যমে চিকিৎসকের ওপর কোনোরূপ প্রেসার ক্রিয়েট করার সুযোগ নেই। বরং সেটা নিছক প্রচারণার মাধ্যম। যা অন্য দশজনকেও দেওয়া যেতে পারে। তবে যদি এগুলো দেওয়ার দ্বারাও তাদের নিয়ত থাকে তাদের ঔষধ প্রেসক্রাইব করা, তাহলে তা বৈধ হবে না। (এক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা দ্বারা বুঝা যাবে, উক্ত উপহার প্রদানের পিছনে তাদের কী উদ্দেশ্য।)

দুই. আবার কখনো অতি মূল্যবান গিফট, প্রি-পেইড মোবাইল রিচার্জ কার্ড, নগদ অর্থ ও আসবাবপত্র সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এসব মূল্যবান গিফট, নগদ অর্থ ও

---

১. দুরারুল হুক্কাম : ২/২১৭, মাসিক আল কাউসার-জুলাই, ২০০৫

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পিছনে অন্তর্নিহিত কারণ থাকে যে, তিনি ওই কোম্পানির ঔষধ প্রেসক্রাইব করবেন। এ বিষয়ে লিখিত চুক্তি না থাকলেও অঘোষিত (প্রচ্ছন্ন) চুক্তির মাধ্যমে এ কাজটি হয়ে থাকে। কোনো কোনো ডাক্তার তো কোম্পানির সাথে সরাসরি চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েয নয়।[১] এটা দৃশ্যত উপহার হলেও কার্যত উৎকোচের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, ডাক্তার যদি উক্ত কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা না করে, তাদের ঔষধ নিয়মিত প্রেসক্রাইব না করে, তাহলে মূল্যবান হাদিয়া-উপঢৌকন ও গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা কোনো কোম্পানি এমনিতেই দিবে না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ডাক্তারের প্রেসক্রাইবের ফলে কোম্পানি আর্থিক লাভবান হওয়ার কারণেই ডাক্তারকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, উপহার ইত্যাদি দিচ্ছে।[২]

সেম্পল ঔষধ গ্রহণ

ঔষধ কোম্পানির পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের যে সকল ঔষধ দেওয়া হয় তা যদি এমন হয় যে ঔষধটি সম্প্রতি বাজারে এসেছে এবং চিকিৎসককে এটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এই ঔষধের সাথে পরিচিতি এবং এর গুণগত মান ও কার্যকারিতা যাচাই করা তাহলে চিকিৎসকের জন্য ঔষধটি নেওয়া জায়েয হবে।[৩] এমন ঔষধ চিকিৎসক নিজেও ব্যবহার করতে পারবেন এবং নিজের পরিবারের লোকদেরও দিতে পারবেন। তেমনি অন্য যেকোনো রোগীকেও বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিতে পারবেন।

---

১. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দাইমাহ : ২৩/৫৭১-

لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليها دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى. اه

দারুল দেওবন্দের ফাতাওয়া : (ওয়েব সাইটে প্রাপ্ত) ফতোওয়া নাম্বার-১৬০২৭৪:

آج کل معالجین ڈاکٹروں کی طرف سے مختلف بہانوں سے کمیشن لینے کا رواج ہوگیا ہے جس کی وجہ سے علاج گراں سے گراں تر ہوتا جارہا ہے اور عوام سخت پریشانی میں ہیں جب کہ مریض کے مفید تر اور مناسب دوا تجویز کرنا معالج ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بلاوجہ اور بے ضرورت مہنگی دوا لکھنا جائز نہیں بہرحال صورت مسئولہ میں اگر آپ مجبوراً ڈاکٹر کو کمیشن دیتے ہیں تو آپ کے حق میں تو دینے کی گنجائش ہے مگر ڈاکٹر کے لیے کمیشن لینا جائز نہیں۔ باقی اگر ڈاکٹر کا مطالبہ کچھ نہ اور وہ پوری دیانت وامانت سے مفید ومناسب دوا مریض کے لیے لکھے اور آپ اس کو بطور انعام کے کچھ دیدیں تو صورت جواز کی ہے، انتہی۔

২. বানূরী টাউনের ফাতাওয়া- (ফতোয়া নং ১৪৪০১২২০০৭৪৩); মালে হারাম আওর উসকে মাসারিফ ও আহকাম : পৃ. ১০৮

৩. দুরারুল হুক্কাম : ২/২১৭

রোজা সংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল (MODERN PROBLEMS ABOUT FAST)

স্রাব আসার পূর্বে ঔষধ খেয়ে স্রাব বন্ধ করে রমযানের রোজা রাখা

চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী ঔষধের মাধ্যমে স্রাব বন্ধ করা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। তাই এর থেকে বেঁচে থাকাই শ্রেয়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঔষধের মাধ্যমে পূর্ণরূপে স্রাব বন্ধ করে, তাহলে তার ওপর যথারীতি নামাজ রোজার বিধান বর্তাবে।[১]

মস্তিষ্ক অপারেশন

রোজা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও মস্তিষ্কে কোনো তরল কিংবা শক্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোনো ছিদ্র ও পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোনো কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছেনা। পূর্ব যুগে ছিদ্রপথ আছে ধারণা করেই এতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ হয়েছে।[২]

কানে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

কানে ড্রপ, ঔষধ, তেল ও পানি ইত্যাদি দিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ কান থেকে গলা পর্যন্ত কোনো রাস্তা নেই। তাই এখানে কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। আদি যুগে ছিদ্রপথ আছে বলে ধারণা করা হতো, বিধায় সে যুগের কিতাবাদিতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৩] তবে কানের পর্দা যদি ছিদ্র থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

চোখে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

চোখে ড্রপ, সুরমা, মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয়। কারণ চোখে কিছু দিলে রোজা না ভাঙ্গার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৪] হাদীস শরীফে এসেছে,

عن عائِشَةَ قالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وهُوَ صائِمٌ.

---

১. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, আছার নং ১২১৯:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ تَطُوفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَإِذَا هِيَ رَأَتْ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ الْأَبْيَضَ فَلَا.
হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী- পৃ.৭৫; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০৮; রদ্দুল মুহতার -১/৩০৮; আল বাহরুর রায়িক -১/৩৩২ (যাকারিয়া)
২. কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা : কারার নং ৯৩ (১-১০); ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা- পৃ. ৩৩৯
৩. আল মাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ -১/১২৪, (মুফতি রফী উসমানী হাফি.); ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা- পৃ.৩৩৯
৪. হেদায়া ৩/৩৩৫(ফাতহুল কাদীর সহ) মাকতাবায়ে যাকারিয়া; কিতাবুন নাওয়াযিল-৬/৩৫৬; ফতোয়ায়ে কাসিমিয়াহ-১১/৪৮৩,৪৮৪

অর্থ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাবস্থায় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন।[১]

নাকে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

নাকে ড্রপ, পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ নাক রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা। নাকে ড্রপ ইত্যাদি দিলে গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[২]

অক্সিজেন (Oxyzen) ব্যবহার

নাকে শুধু অক্সিজেন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ অক্সিজেন দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু নয়। রোজা ভঙ্গ হতে হলে দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে হবে।[৩]

মুখে ঔষধ ব্যবহার

মুখে কোনো ঔষধ ব্যবহার করে তা যদি মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, গলার ভিতরে না যায় তাহলে এর কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সে ঔষধ গলার ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। চাই তা যতই কম হোক।[৪]

সালবুটামল (Salbutamol), ইনহেলার (Inhaler) ব্যবহার

সালবুটামল, ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৫] শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ঔষধটি মুখের ভেতরে স্প্রে করা হয়। এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় ওই জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে আর কোনো কষ্ট থাকে না। ঔষধটি যে শিশিতে যে পরিমাণে থাকে ওই শিশির মুখ একবার টিপলে শিশির আকারভেদে ওই পরিমাণের একশত কিংবা দুইশত ভাগের একভাগ বেরিয়ে আসে। অতি স্বল্প পরিমাণে গ্যাসের ন্যায় বের হওয়ার কারণে কেউ ঔষধটিকে বাতাস জাতীয় মনে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয়, বরং ঔষধটি দেহবিশিষ্ট। কার্ড ইত্যাদি কোনো বস্তুতে স্প্রে করলে দেখা যায় যে, এই বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই এতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৬]

রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম

কোনো কোনো চিকিৎসক বলেন, সাহরিতে এক ডোজ ইনহেলার নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত ইনহেলার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৬৭৮
২. আদ্দুররুল মুখতার : ৩/৩৭৬ (যাকারিয়া); কিতাবুন নাওয়াযিল-৬ /৩৮১
৩. কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা কারার নং ৯৩ (১/১০); ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ৩৪০
৪. কিতাবুন নাওয়াযিল : ৬ /৩২১; ফতোয়ায়ে কাসিমীয়্যাহ-১১/৪৯৮; নাফাইসুল ফিক্হ : ৩/২২১
৫. কিতাবুল ফাতাওয়া : ৩/৩৯৪; ফতোয়ায়ে কাসিমীয়্যাহ- ১১/৪৯৩; নাফাইসুল ফিক্হ : ৩/২২২
৬. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ৩৪০

করে রোজা রাখা চাই। যদি কারো বক্ষব্যাধি এমন জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তীতে রোজার কাযা করে নিবে। আর কাযা সম্ভব না হলে ফিদিয়া আদায় করবে।[১]

রক্ত দেওয়া নেওয়া

রক্ত দিলে অথবা নিলে কোনো অবস্থাতেই রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলে তো কোনো বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে না। তাই এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর রক্ত নিলে যদিও তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। এমনিভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়েও প্রবেশ করে না। বিধায় এতে রোজা ভঙ্গ হবে না।[২]

ইঞ্জেকশন (Injection)

ইঞ্জেকশন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। চাই তা মাংসে নেওয়া হোক কিংবা শিরায়। কারণ যে রাস্তায় ইঞ্জেকশন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ওই রাস্তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়।[৩]

স্যালাইন (Saline)

স্যালাইন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্যালাইন নেওয়া হয় রগে। আর রগ রোজা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোজার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরূহ ।[৪]

ইনসুলিন (Insuline)

ইনসুলিন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ ইনসুলিন রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায়ও পৌঁছে না।[৫]

পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ব্যবহার (Urinary Tract)

পুরুষের পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ পেশাবের রাস্তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনিভাবে পেশাবের রাস্তা দিয়ে

---

১. কিতাবুল ফাতাওয়া : ৩/৩৯৩; নাফাইসুল ফিক্‌হ- ৩/৩২২; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. : ৩৪১
২. কিতাবুল ফাতাওয়া : ৩/৪০০; ফতোয়ায়ে কাসিমীয়্যাহ : ১১/৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৬
৩. কিতাবুন নাওয়াযিল : ৬/৩৬৬; কিতাবুল ফাতাওয়া : ৩/৩৯১; ফতোয়ায়ে কাসিমীয়্যাহ- ১১/৪৭৯, ৪৮১
৪. ফতোয়ায়ে কাসিমীয়াহ : ১১ /৪৮২, ৪৮৭; কিতাবুন নাওয়াযিল : ৬/৩৬৭
৫. ফতোয়ায়ে কাসিমীয়াহ : ১১ /৪৮২, ৪৮৭; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. : ৩৪৪

কোনো বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা মূত্রথলিতে পৌঁছেমাত্র, আর মূত্রথলি রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।[১]

মহিলার যোনিদ্বারে ঔষধ ব্যবহার (Vagina)

মহিলার যোনিদ্বারের বহির্ভাগে ঔষধ ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি যোনিদ্বারের অভ্যন্তরে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।[২]

ডুস (Douche) ব্যবহার

ডুস নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ডুস মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। মলদ্বার রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা এবং ডুস যে জায়গায় প্রবেশ করে ওই জায়গাও রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি স্থান।[৩]

- تمت بالخير النافع الكثير -

■ মাওলানা আবদুর রহমান (১৪৩৭হি. শিক্ষাবর্ষ)

■ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন হুসাইন (১৪৪৩-৪৪হি. শিক্ষাবর্ষ)

---

১. নাফাইসুল ফিক্‌হ : ৩/২৩৭; কিতাবুন নাওয়াযিল- ৬/৩৮৪; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. ৩৪৪

২. কিতাবুন নাওয়াযিল : ৬/৩৮৪; নাফাইসুল ফিক্‌হ : ৩/২৩৭; বানূরী টাউনের ফাতাওয়া- (ফতোয়া নং ১৪৩৯০৮২০০৯৪৬) নিম্নে ফতোয়া উল্লেখ করা হলো-

عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصہ میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اندر کے حصہ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

দারুল দেওবন্দের ফাতাওয়া (ওয়েব সাইটে প্রাপ্ত) ফতোওয়া নাম্বার-১৫৩২১৫

৩. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা : পৃ. : ৩৪৭; কিতাবুন নাওয়াযিল : ৬/৩৮৩

৪. যে খেলা পর্দার ফরজ আদায়ে অন্তরায় হয়, ওই খেলা হারাম। যেমন, গাইরে মাহরাম পুরুষদের সামনে মহিলাদের টেনিস খেলা।[১]

৫. যে খেলা সতর রক্ষায় অন্তরায় হয়, ওই খেলা হারাম। যেমন, ফুটবল খেলায় সাধারণত সতর ঢাকার ইহতেমাম করা হয় না।[২]

৬. যে খেলায় দীনি বা দুনিয়াবী কোনো উপকারিতা নেই, ওই খেলা নাজায়েয। কারণ এতে অনর্থক কাজে সময় ও শক্তি নষ্ট হয়।[৩]

ঘুড়ি ওড়ানো এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে উল্লেখযোগ্য খারাপি হলো, সময় নষ্ট হওয়া।

৭. খেলা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য না হওয়া। যেমনটা বর্তমানের ক্রীড়া ক্লাব ও আন্তর্জাতিক দলগুলোর খেলোয়াড়দের হয়ে থাকে।

৮. যে খেলা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বা অন্য কোনো দীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, ওই খেলা ৪ , ৫ ও ৬ নং শর্তসাপেক্ষে জায়েয।

এ হলো খেলাধুলা সংক্রান্ত ইসলামের মৌলিক কিছু নীতিমালা। এবার আমরা উপর্যুক্ত নীতিমালার আলোকে, নিম্নে প্রচলিত কিছু খেলাধুলার শরয়ী বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্তমানে প্রচলিত খেলাধুলায় শরীয়াহ্ পরিপন্থি বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে 'কিমার' বা 'জুয়া'। এর পরিচিতি ও বিধান সম্পর্কে জনসাধারণের অনেকেই অনবগত। অথচ, এটি সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের বিশেষত প্রচলিত খেলাধুলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাধুলা হবে অথচ তা কেন্দ্র করে জুয়ার আসর বসবে না, এটা কেমন জানি এখন কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে এর পরিচিতি, বিধান ও বাস্তব জীবনে কোথায় কোথায় এর প্রয়োগ হয়, এ বিষয়ে সকলের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই প্রচলিত খেলাধুলার শরয়ী বিধান নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে নিম্নে 'জুয়া' বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি।[৪]

---

১. তাকমিলা (মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি) : ৪/৪৩৫; আহকামুল কুরআন, থানবী (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া) : ৩/২০০; মাআরিফুল কুরআন (রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী) : ৭/২৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. উল্লেখ্য, 'জুয়া' বিষয়ক নিম্নোক্ত লেখাটি উস্তাযে মুহতারাম, মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম সাহেবের একটি প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত ও ঈষৎ সংক্ষেপিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরতকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন

কিমার (Gambling) : পরিচিতি ও তাৎপর্য

বর্তমান ফিকহুল মুআমালার একটি আলোচিত বিষয় হলো, 'কিমার'। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লেনদেনে তা পাওয়া যায়। সাধারণত বাংলায় এর তরজমা করা হয়, 'জুয়া'। জুয়া বলতে সাধারণ মানুষ বুঝে- তাস খেলা। অথচ 'কিমার' বাংলা জুয়া থেকেও ব্যাপক বিষয়। যেমন 'রিবা' সুদ থেকেও ব্যাপক। এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ার কারণে দৈনন্দিন এমন অনেক লেনদেনে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে, যার মধ্যে আমাদের অজান্তেই কিমার লুকিয়ে থাকে।

ফিকহুল মুআমালায় কিমার একটি বিস্তৃত বিষয়। শুধু এ বিষয়ে আরবীতে ৫০০-এর অধিক পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণাধর্মী বই লেখা হয়েছে। ড. সুলাইমান ইবনে আহমদ আল-মুলহিম কর্তৃক লিখিত আরবী ভাষায় আল কিমার হাকীকাতুহু ওয়া আহকামুহু[১] বইটি এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে মোটা দাগের কিছু কথা তুলে ধরা হলো-

কিমার

'কিমার' শব্দটি আরবী (القمار)। শব্দটির মূল হলো, 'কামরুন' (قمر) (ক্বাফ, মীম, রা)। এর মূল অর্থ : يدل على بياض، ثم يفرع منه অর্থাৎ শুভ্রতা যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বা কমে বাড়ে। এর থেকে চাঁদকে 'আল-কামার' (القمر) বলা হয় তার শুভ্রতার কারণে। তদ্রূপ এখান থেকেই 'কিমার' বলা হয়। কারণ, জুয়াড়ীর সম্পদ কখনো এক অবস্থায় থাকে না। কখনো বাড়ে কখনো কমে।[২] এ শব্দটি হাদীসে এসেছে।

মাইসির

'কিমারের' পাশাপাশি এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আরেকটি আরবী শব্দ হলো, 'মাইসির'। শব্দটির মূল অর্থ : التجزئة তথা ভাগ-বণ্টন করা। ভাগ-বণ্টনকারীকে বলা হয়, 'ইয়াসির' (الياسر)। আর যে বস্তু বণ্টন করা হয় (জাহেলী প্রথানুযায়ী উট) তাকে বলা হয়, 'মাইসির'।[৩]

---

১. প্রকাশক: কুনূয ইশবিলিয়া, প্রকাশনার সময়: ১৪২৯হি.। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ্ অনুষদ অধীনে সম্মানিত লেখক এটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ পত্র হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩৪।

২. মাকায়িসুল লুগাহ, পৃ. : ৭৫০। উল্লেখ্য, ফিকহের কিতাবে লেখা আছে, কিমার শব্দটি 'আলকামার' (القمر) বা চন্দ্র থেকে এসেছে। চাঁদ আরবী মাসের শুরু থেকে বৃদ্ধি হয়। আবার শেষের দিকে হ্রাস পায়। 'কিমার'কে 'কিমার' বলা হয় এ জন্য যে, প্রত্যেক জুয়ারীর অবস্থা মূলত চাঁদের মতো। কখনো হারে। কখনো জেতে। (রদ্দুল মুহতার : (সায়ীদ) খ.: ৬, পৃ. : ৪০৩)

৩. আহকামুল কুরআন : জাস্সাস রহ., খ. ১, পৃ. : ৩২৯; 'মাইসির' শব্দটি মাসদার ও ইসম দুটিই। (লুগাতুল কুরআন : খ. ৫, পৃ. : ৪৯৩)

'মাইসির' (الميسر) শব্দটির উৎস : ইয়ুসরুন (يسر) থেকে। **অর্থ :** সহজ। জুয়ার মাধ্যমে যেহেতু সহজে সম্পদ অর্জন হয়, তাই একে 'মাইসির' বলা হয়[১]। অথবা 'ইয়াসার' (يسار) থেকে।[২] **অর্থ :** ধনাঢ্যতা। এর মাধ্যমে যেহেতু পরিশ্রম ছাড়াই ধনী হওয়া যায়, তাই একে 'মাইসির' বলে।

কিমার ও মাইসির

কিমার বলতে যা বোঝায় সবই 'মাইসির'। অর্থাৎ, মাইসির মানেই কিমার। সালাফ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., মুজাহিদ রহ. প্রমুখ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।[৩]

বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহ., আতা রহ., তাউস রহ. বলেছেন-

كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

অর্থ : কিমার বলতে যা বুঝায় যাবতীয় বিষয় 'মাইসির'। এমনকি বাচ্চারা আখরোট ফল দিয়ে যে হারজিত খেলা করে সেটাও 'মাইসির'।[৪]

কাতাদাহ রহ. বলেছেন, الميسر فهو القمار كله

অর্থ : মাইসির হল যাবতীয় কিমারের নাম।[৫]

মোটকথা, কিমারের যত সূরত ও পদ্ধতি আছে সবই মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে সকল সাহাবি ও তাবেয়ি একমত।[৬]

অবশ্য সালাফের কেউ কেউ মাইসিরকে ব্যাপক বলেছেন। তাদের মতে 'মাইসির' দু'ভাবে হতে পারে। যথা :

ক. অবৈধ খেলা। যেমন, তাস খেলা, দাবা খেলা। এর সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পৃক্ত নয়; বরং কাসেম রহ. বলেছেন,

---

১. আল-মুফরাদাত : পৃ.: ৫৫২, লুগাতুল কুরআন : খ. ৫, পৃ. : ৪৯৩
২. আল-কাশশাফ : খ. ১, পৃ. : ৩৫৯
৩. ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী মাসায়েল : খ.: ৩, পৃ. : ৩৫৪ সালাফে সালেহীন থেকে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ., মুজাহিদ রহ., সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ., সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রহ., কাতাদা রহ., হাসান বসরী রহ., তাউস রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ছুদ্দী রহ. ও দাহহাক রহ. প্রমুখ সালাফে সালেহীন 'মাইসির' ও 'কিমার'কে এক মনে করতেন। দেখুন, তাফসীরে তাবারী : খ. ২, পৃ. : ৩৫৮
৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. : ৩, পৃ. : ১৬১, আহকামুল কুরআন, জাসসাস : খ. ১, পৃ. : ৩২৯, আল-ক্বিমার ওয়া আহকামুহু : পৃ. : ৮০
৫. তাফসীরে তাবারী : খ. ৪, পৃ. ৩২৪
৬. তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতী শফী রহ. : খ. : ১, পৃ. : ৫৩২

كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.

অর্থ : প্রত্যেক এমন কাজ যা আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফেল করে রাখে সেটাই 'মাইসির'।[১]

খ. কিমারযুক্ত আর্থিক লেনদেন। সেটা খেলায় হতে পারে। অন্য কোনো লেনদেনেও হতে পারে।

অপরদিকে 'কিমার' বলতে কেবল, কিমারযুক্ত আর্থিক লেনদেনকে বোঝায়। খেলাকে নয়।[২] মোটকথা, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সব কিমার অবশ্যই মাইসির। তবে সব মাইসির কিমার হওয়া জরুরি নয়।[৩]

ইংরেজিতে কিমারের প্রতিশব্দ হলো : Wagering, Gambling, Bet ইত্যাদি।

বাংলা জুয়া ও কিমার

বাংলা ও উর্দূতে এর অক্ষম তরজমা করা হয়, 'জুয়া'। বাংলা অভিধানে জুয়ার অর্থ করা হয়েছে, 'খেলায় বাজি ধরা'। এর মানে জুয়া খেলার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। এটি শরয়ী কিমারের অক্ষম তরজমা। কারণ, কিমার শুধু খেলায় নয়; বিভিন্ন লেনদেনেও হতে পারে। তাই বলি, প্রচলিত জুয়া-ই একমাত্র কিমার নয়। জুয়াও কিমার। তদ্রূপ কিমার মানেই জুয়া নয়। মূলত কিমার একটি শরয়ী পরিভাষা। এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা খেলায় হতে পারে, অন্য কোনো লেনদেনেও হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিমারকে কিমার বলাই শ্রেয়। জুয়া নয়।

কিমারের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহতা

কুরআনুল কারীম থেকে

কুরআনুল কারীমে কিমারের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

---

১. তাফসীরে তাবারী : ৪/৩২৪, আল কিমার ওয়া আহকামুহু : পৃ. : ৮৫
২. এ ব্যাখ্যাটি ইমাম মালেক রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী : খ. ৩, পৃ. : ৫৩
৩. আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা : খ. ৩৯, পৃ. : ৪০৬

অর্থ : হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও লটারির তির এসবই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?[১]

সহীহ হাদীস থেকে

হাদীসে কিমার পরিহার বিষয়ে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু কিমারযুক্ত লেনদেনকেই হারাম করা হয়নি; বরং কিমারের শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করাকেই গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।[২] আর কেউ যদি কাউকে কিমারের দিকে শুধু দাওয়াত দেয়, তবে তাকে আদেশ করা হয়েছে, শুধু এই দাওয়াতের কারণে গুনাহের কাফ্ফারা হিসাবে কিছু সদকা করতে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, مَن قالَ لصاحبِهِ تَعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتصدَّقْ

অর্থ : যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডেকে বলে, আসো, তোমার সাথে কিমারের লেনদেন করব। তাহলে আহ্বানকারীর উচিত, উক্ত গুনাহের কারণে কিছু সদকা করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৮৬০)

মোটকথা, উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে কিমারের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহতা স্পষ্ট। ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. লিখেছেন,

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار.

'ওলামাদের মাঝে কিমার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত নেই।'[৩]

কিমারের পারিভাষিক পরিচিতি

ইসলামী ফিকহে কিমার বলতে বোঝায়, অনিশ্চিত কোনো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এভাবে টাকা লাগানো যে, হয় তা বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে আসবে নতুবা ওই টাকা হারাবে। ফকীহগণের নিকট এর প্রসিদ্ধ পরিচিতি হলো,

تعليق التمليك بالخطر و المال من الجانبين.

অর্থ : কোনো কিছুর মালিক হওয়াকে অনিশ্চিত কিছুর ওপর শর্তযুক্ত করে দেওয়া। আর উভয় পক্ষ আগেই অর্থ প্রদান করা।

ইমাম জাস্সাস রহ.এর পরিচিতি পেশ করেছেন এভাবে,

---

১. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯০
২. ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল : খ. : ৩, পৃ. : ৩৫৪
৩. আহকামুল কুরআন : খ. : ১, পৃ. : ৩২৯

حقيقته أي الميسر تمليك المال على المخاطرة.

অর্থ : মাইসিরের মূল কথা হলো, কোনো সম্পদের মালিকানা অর্জনকে অনিশ্চিত কিছুর (Risk) সাথে সম্পৃক্ত করা। যাতে লাভ হতে পারে, নাও হতে পারে।[১]

'আল-মুখাতারাহ' বলা হয়, এমন লেনদেন, যা লাভ-লোকসানের মাঝামাঝিতে থাকে। অর্থাৎ এও সম্ভাবনা আছে যে অনেক লাভ হবে, আবার এও সম্ভাবনা আছে যে, পুরোই লস হবে। যেমনটি আজকাল লটারিতে পাওয়া যায়।[২]

মুফতি শফী রহ.-এর কিমারের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ পরিচিতি

বিচারপতি শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ 'সুপ্রিম কোর্ট অব পাকিস্তানের' শরীয়াহ্ এফিলিয়েট বেঞ্চের লটারি বিষয়ক এক লিখিত রায়ে বলেছেন, উর্দূ ভাষায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে কিমারের পরিচিতি পেশ করেছেন মুফতি শফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে*। তিনি তাতে লিখেছেন :

'যে কোনো লেনদেন বা কারবারে কেউ কোনো কিছুর মালিক হওয়াটাকে এমন শর্তের ওপর কিংবা এমন বিষয়ের ওপর মওকুফ রাখা, যা হওয়া না-হওয়া দুটিই বরাবর। আর এরই ভিত্তিতে লেনদেনের উভয়পক্ষ হয় কখনো লাভবান হবে, কিংবা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই লাভ-লসের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ বরাবর। উদাহরণস্বরূপ : এরও সম্ভাবনা আছে যে, লস যায়েদ বহন করবে। আবার এরও সম্ভাবনা আছে যে, অপর পক্ষ তথা খালেদ লস বহন করবে। এর যত প্রকার পূর্ববর্তী যামানায় প্রচলিত ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হবে সবই মাইসির, কিমার ও জুয়া।[৩]

বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-এর কিমারের পরিচয় দান

বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানী সাহেব তাঁর পূর্বোক্ত রায়ের ১৬ নং ধারায় লিখেছেন, যদি আমরা কিমারের যাবতীয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনের পরিমিত শব্দে এর সংজ্ঞা করতে চাই তাহালে তা হবে এরকম-

'কিমার একাধিক লোকের মধ্যে সংঘটিত এমন একটি লেনদেনের নাম, যাতে প্রত্যেকেই এক অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের সম্পদ (হয় শুরুতেই আদায় করবে অথবা আদায়ের ওয়াদা করবে) এভাবে খাটায় যে, হতে পারে এই সম্পদ কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া অন্যের হয়ে যাবে অথবা অন্যের সম্পদ কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া নিজের হয়ে যাবে।'[৪]

---

১. আহকামুল কুরআন, খ. : ২ ,পৃ. : ৪৬৫
২. মারেফুল কুরআন, মুফতী শফী রহ. : খ. : ১, পৃ. : ৫৩২
৩. মাআরেফুল কুরআন : ১ : ৫৩২
৪. ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল : খ. : ৩, পৃ. : ৩৫৮

সারকথা

উপরের আলোচনা থেকে যা প্রতিভাত হয় তা হলো,

১. কিমার একটি 'আকদুল মুআওয়া' বা বিনিময়মূলক চুক্তি।

২. এতে অংশগ্রহণকারী অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের সম্পদকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দিবে। এ সম্পদ হয় শুরুতেই দিয়ে দিবে বা পরে দেওয়ার ওয়াদা করবে। (উদাহরণ আসছে)

৩. এতে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়টি অনিশ্চিত থাকবে।

৪. এতে অংশগ্রহণকারী হয় বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে বিনিময়হীন অনেক বেশি লাভ করবে, নাহয় নিজের সম্পদ পুরোটাই কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া খোয়া যাবে।

কিমারের মৌলিক উপাদান

বর্তমান ইসলামী বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক স্কলার, আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির Pioneer বলে খ্যাত, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের শরীয়াহ্ এফিলিয়েট বেঞ্চের সাবেক বিচারপতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, শরীয়াহ্ এফিলিয়েট বেঞ্চের লটারি বিষয়ক এক লিখিত ফায়সালায়, ধারা ১০-এ লিখেছেন:

'কিমারের সকল সংজ্ঞা ও ধরন-প্রকার সামনে রাখলে এটি স্পষ্ট হয় যে, কিমারের মৌলিক উপাদান (Necessary Ingredients) মোট ৪ টি। যথা-

১. কিমার মূলত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত একটি মুআমালা বা বিনিময়মূলক চুক্তি (Transaction)।

২. উক্ত লেনদেনে একজন অপরজনের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের কিছু সম্পদ অনিশ্চিয়তার মুখে ফেলে দেওয়া।

৩. কিমারের মধ্যে অন্যের যে সম্পদটা হাতিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, সেটা অর্জন হওয়াটা এমন অনিশ্চিত ও নিজ ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যা বাস্তবে হওয়া না-হওয়া দুটি দিকই বরাবর।

৪. উক্ত লেনদেনে যে সম্পদটা রিস্কের ওপর পেশ করা হয়, তা হয়তো কোনো বিনিময় ছাড়া অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। অথবা অন্যের সম্পদ কোনো বিনিময় ছাড়া নিজের হয়ে যাবে।

যেকোনো লেনদেনে উক্ত চার উপাদান পাওয়া গেলে সেটা নিষিদ্ধ কিমার বলে গণ্য হবে এবং হারাম হবে।'[১]

---

১. ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী মাসায়েল : ৩/৩৫৬; বুহুস : ২/১৫৭

কিমারের প্রকার

কিমারের অনেক ধরন ও প্রকার হতে পারে। তবে এর তিনটি প্রকার গুরুত্বপূর্ণ। যথা :

১. কিমারের উল্লেখযোগ্য একটি প্রকার হলো, লেনদেনের প্রারম্ভে কোনো পক্ষ কোনো সম্পদ বা টাকা আদায় করে না; বরং প্রত্যেকেই একে অপরকে দেওয়াটা এমন বিষয়ের ওপর মওকুফ রাখা হয়, যা হওয়া না-হওয়া বরাবর। যেমন– দুই প্রতিযোগী এভাবে চুক্তি করল যে, যে হারবে সে অপরপক্ষকে এত টাকা দিবে। এটি হারাম।

   ইমাম মালেক রহ. উক্ত উপাদানের একটি চুক্তির ব্যাপারে বলেছেন, এটি সবচেয়ে বড়ো কিমার।[১]

   তদ্রূপ অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর অর্থ প্রদানের যেসব শর্ত করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যায়েদ উমরকে বলল, অমুক খেলায় কামাল যদি জিতে যায়, তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিবো। আর যদি রাশেদ জিতে যায়, তাহলে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দিবে। এটিও উক্ত প্রকার কিমারের অন্তর্ভুক্ত।

   মনে রাখতে হবে, অর্থ প্রদানের শর্তারোপ যদি একপক্ষীয় হয়, তবে সেটা কিমার হবে না।

২. লেনদেনের শুরুতে একপক্ষ সম্পদ ব্যয় করাটা নিশ্চিত। তবে অপরপক্ষের সম্পদ ব্যয়টা নির্ভর করে এমন বিষয়ের ওপর, যা ঘটা না-ঘটা উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যয় করল, সে আশায় থাকে, হয় তা বিনিময়হীন বহু সম্পদ নিয়ে আসবে নতুবা গচ্ছা যাবে।

   এটি হলো, Casino জুয়ার ঘর বা ক্লাব। ফি দিয়ে ঢুকতে হয়। তবে এর বিপরীতে সম্পদপ্রাপ্তি অনিশ্চিত। তদ্রূপ লটারির কুপন বিক্রি।

৩. লেনদেনের শুরুতেই উভয় পক্ষ অর্থ ব্যয় করে। এরপর কোনো একজন সেটা পুরোপুরি পেয়ে যায়। এটিও হারাম।[২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে কিমারের মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এবার কিমারের উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেকটির কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

---

১. আল মুদাউওয়ানাতুল কুবরা : ৩/২৫৪
২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খ. : ৫, পৃ. : ৩৭৫

প্রচলিত কিছু খেলাধুলায়-কিমারের উপস্থিতি

বাচ্চাদের খেলা

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা শিশার গুলি দিয়ে খেলা করে। তাদের মাঝে চুক্তি হয় এভাবে যে, খেলায় যে বিজয়ী হবে সে অপরপক্ষ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ গুলি নিয়ে নেবে। আর হারলে উল্টো সে নির্ধারিত পরিমাণ গুলি তাকে দেবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. থেকে আসার উল্লিখিত হয়েছে যে, বাচ্চাদের এধরনের খেলাও মাইসির।[১]

ঘুড়ি কাটা

গ্রাম ও শহরে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। চুক্তি হয়, একজন অপরজনের ঘুড়ি কাটতে পারলে যারটা কাটা যাবে সে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা–যে কাটল তাকে–দিয়ে দিবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[২]

ভিডিও গেম

বর্তমানে ভিডিও গেম, ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলায় এ ধরনের চুক্তি পরিলক্ষিত হয় যে, যে হেরে যাবে, সে অপরপক্ষকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এ শর্তারোপের কারণে এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোথাও এ প্রচলনও আছে যে, মূল চুক্তিটি হয় ভিডিও গেম ব্যবসায়ী বা দোকানদারের সাথে। এটি তিন ভাবে হয়ে থাকে। যথা :

ক. যারাই গেম খেলবে চাই সে হেরে যাক বা বিজয়ী হোক, সকলে দোকানদারকে নির্ধারিত ফি দিতে হবে।

খ. যে হারবে কেবল সেই উভয়ের নির্ধারিত ফি শোধ করবে।

গ. কখনো দু'জন গেম খেলোয়াড়ের মধ্যে চুক্তি হয় যে, যে হারবে সে পুরো ফি শোধ করবে, সাথে সাথে বিজয়ীকেও নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে।

উক্ত তিনটি সুরতের মাঝে প্রথম সুরতটি কিমার নয়। এটি মূলত গেম মেশিন ব্যবহারের ভাড়া প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সুরতটি কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিজয়ীর ফি পরিশোধ করাটা কিমার। তদ্রূপ তৃতীয় সুরতটিও কিমার।[৩]

---

১. জাওয়াহিরুল ফিক্হ : খ. : ৪, পৃ. : ৫৬৬
২. প্রাগুক্ত
৩. মালি মুআমালাত পর গারার কি আসারাত, ড. ইজায আহমদ সামদানী : পৃ. : ৩৯৩-৩৯৪

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সুরত কিমার নয়-এর অর্থ এ নয় যে, এসব খেলা বৈধ। কারণ কিমার না হলেও এসব খেলায় সময় নষ্টের মতো ভয়াবহ পাপ আছে। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরি।

১. **ষাঁড়ের লড়াইয়ে বাজি ধরা**

এ ধরনের খেলা তো এমনিতেই অবৈধ। এর ওপর এর সাথে যুক্ত হয় মাইসির। আগেই চুক্তি হয়, যার ষাঁড় হারবে তার নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিতে হবে।

আবার একে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষও বাজি ধরে। যার কাছে মনে হয় যে ষাঁড়টি বিজয়ী হবে, সে এর ওপর বাজি ধরে। যেমন, নির্দিষ্ট একটি ষাঁড়ের ওপর দুই হাজার টাকা বাজি ধরা হলো। যদি এটি জিতে যায় তাহলে বাজির দিগুণ অর্থ তথা চার হাজার টাকা লাভ হবে। আর হেরে গেলে দুই হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু খেলাধুলা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিযোগী থেকে শুরুতেই একটি নির্ধারিত হারে চাঁদা ওঠানো হয়। এটিও কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এতে শুরুতেই প্রত্যেকের অর্থ ব্যয় নিশ্চিত।[১]

অবশ্য যদি শুধু ব্যবস্থাপনা-সম্পৃক্ত খরচ নেওয়া হয়, তবে এতে দোষ নেই। সেক্ষেত্রে পুরস্কার ব্যয় বহন করবে কর্তৃপক্ষ।

খেলায় ম্যাচ বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

অনেক সময় দেখা যায়, খেলায় ম্যাচ বিজয়ীদের লটারির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। এ পুরস্কার প্রদানের জন্য যারা খেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের সকলের থেকে প্রথমেই চাঁদা নেওয়া হয়। এরপর উক্ত টাকা দিয়ে কেবল বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এটিও কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কিমারের সাথে সাদৃশ্য খেলাধুলা, তবে কিমার নয়

আমাদের সমাজে প্রচলিত খেলাধুলায় কিছু লেনদেন এমন, যা বাহ্যত মনে হয় কিমার, তবে বাস্তবে কিমার নয়। এখানে এমন কিছু লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

---

১. *বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা*, খ. : ২, পৃ. : ১৫৬

১. একাধিক লোকের মাঝে কোনো কিছুর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যে জিতবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এই পুরস্কার প্রদান করবে আয়োজক বা তৃতীয় পক্ষ। প্রতিযোগিদের থেকে শর্ত করে আদায়কৃত কোনো অর্থ দিয়ে নয়। এটি বৈধ।[১]

২. এমন নিয়ম করা হলো যে, যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজন বা একাধিকজনের জন্য কোনো ফি থাকবে না। বাকিদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফি দিতে হবে। এই ফি দিয়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। এভাবে সবাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। যদি তৃতীয়জন সফল হয় তাহলে সেই সব পুরস্কার নিয়ে যাবে। আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না। এভাবে হয়ে থাকলে, তা বৈধ হবে।[২]

৩. পত্রিকায় মস্তিষ্ক শাণিত করার জন্য কিছু খেলা দেওয়া হয়। যেমন 'শব্দঘর', 'সুডুকো' শব্দ ও সংখ্যা মিলানোর জন্য এ দুটি খেলা বেশ প্রসিদ্ধ। যারা এই ঘরগুলো পূরণ করে কুপনটি পাঠিয়ে দিবে তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত করে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এটি বৈধ। কারণ এতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে পুরস্কার প্রদানের জন্য অগ্রিম কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয় না। যদি এমন নিয়ম থাকে যে, এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে ফরম বাবদ বা কুপন বাবদ নির্ধারিত টাকা প্রদান করতে হবে। তাহলে তখন আর বৈধ হবে না। তবে, কুপন বা ফরম বাবদ কেবল বাস্তবভিত্তিক ন্যায্য খরচ গ্রহণ করা হলে এতে সমস্যা নেই।

এই সমস্ত খেলাধুলার শরয়ী বিধান

এই সমস্ত খেলাগুলো মৌলিকভাবে অবৈধ নয়। তবে এই সমস্ত খেলাধুলাতেও খেলাধুলা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করতে হবে। বিশেষত-

১. খেলা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়তে হওয়া ।
২. খেলা নামাজ, পর্দা, ইত্যাদি কোনো শরয়ী বিধান পালনে অন্তরায় না হওয়া ।
৩. সতর ঢাকা।
৪. তাতে শরীয়াহ্ পরিপন্থি কোনো বিষয় না থাকা। যেমন মদ, জুয়া, নাচ ও গান ইত্যাদি।
৫. খেলা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য না হওয়া। যেমন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের হয়ে থাকে।

৬. ছেলে-মেয়ে একত্রে না খেলা, তদ্রূপ পুরুষদের সামনে মেয়েদের না খেলা।

উপর্যুক্ত শর্তগুলো সাপেক্ষে এই সমস্ত খেলাধুলা জায়েয।[১]

দাবা খেলা

দাবার পরিচয় ও ইতিহাসঃ

১৬টি করে গুটি দ্বারা ৬৪ বর্গক্ষেত্রের একটি বোর্ডে দুইজন খেলোয়াড়ের খেলা। এই ১৬ টি ঘুটির ১টি রাজা, ১টি মন্ত্রী, ২টি ঘোড়া, ২টি হাতি, ২টি নৌকা ও ৮টি বোড়ে (সৈন্য)।

আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার সদস্য এবং তারা আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে চলে। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করে।[২]

দাবা খেলার শরয়ী বিধান

দাবা খেলায় মৌলিক কিছু মন্দ বিষয় আছে। যথাঃ

১. দাবা খেলার গুটি সাধারণত মূর্তির আকৃতি বিশিষ্ট হয়। আর ইসলামে কোনো প্রাণীর ছবি–তা যে আকৃতিই হোক না কেন–নিষিদ্ধ।

হযরত আলী রা. দাবা খেলায়রত একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন,

---

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া (মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি) : ৪/২৫৬; কিফায়াতুল মুফতী (ইদারাতুল ফারুক করাচি) : ১৩/১০৩; আপকে মাসায়েল (কুতুব খানায়ে নাঈমিয়া) : ৮/৪০৬। জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, অন লাইন ফতোয়া (কাবাডি বিষয়ে), ফতোয়া নম্বরঃ ১৪৪১০৭২০০৮০১
২. বাংলা পিডিয়া (বাংলদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি) : ৪/৩৩৭

عن ميسرة النهدي قال: مَرَّ عَلِيٌّ عَلى قَوْمٍ وهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقالَ: ما هَذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عاكِفُونَ.

অর্থ : এই মূর্তিগুলো কী? তোমরা যার সামনে ধর্না দিয়ে বসে থাক।[১]"

২. দাবা খেলা গভীর মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘ সময় খেলতে হয়। যার ফলে নামাজ কাযা হয়ে যায়।

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদকে বলা হলো, আপনারা পাশা খেলাকে অপছন্দ করেন, তাহলে দাবা খেলার হুকুম কী? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকির এবং নামাজ থেকে গাফেলকারী প্রত্যেক জিনিস জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[২]

৩. দাবা খেলায় শারীরিক উপকার তো দূরের কথা, উল্টো এর দ্বারা মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। গভীর মনোযোগ দিয়ে খেলার কারণে দেমাগের ওপর চাপ পড়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অনুপকারী। এছাড়া দাবা খেলায় প্রাসঙ্গিক আরো অনেক খারাপি পাওয়া যায়। যেমন, বাজি ধরা ইত্যাদি।

মোটকথা, উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলোর উপস্থিতির কারণে দাবা খেলা নাজায়েয। তাই এর থেকে বিরত থাকতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এই মত পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. স্বাভাবিক অবস্থায় মাকরূহ বলেন।[৩]

তাস খেলা

তাস খেলার পরিচয় ও ইতিহাস

অতি প্রাচীন কালে এই অবসরবিনোদনমূলক খেলাটি ভারতবর্ষে খেলা হতো। এই খেলার উৎপত্তিস্থান নিয়ে মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। ভারতবর্ষে বহু পূর্বে গোল আকারের তাস ব্যবহৃত হতো। চীনদেশে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা সি উন হো তাস খেলা প্রবর্তন করেন। আরবদের কাছ থেকে এই খেলা ইতালির লোকেরা শিখে নেয় চৌদ্দশ শতাব্দীতে। প্রথমে তাসে ঘন্টা, পাতা, ওক গাছের ফল ইত্যাদি আঁকা থাকত। পরে জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের ছবি আসে। সাহেব তাসের ছবি রাজা অষ্টম হেনরির ছবি। বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে, ক্লাবে ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাস খেলা হয়ে থাকে। এ দেশে

১. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া) ১৩/৩৫১, আসার-২৬৬৮২
২. শুআবুল ইমান, বায়হাকী, আসার- ৬৫১৯); কিফায়াতুল মুফতী (ইদারাতুল ফারুক করাচি) ১৩/১০২; মাহমুদিয়া (ইদারাতুল ফারুক করাচি) : ১৯/৫৩৭; আপকে মাসালে (কুতুব খানায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ) ৮/৪০৬; ফয়জুল কাদির (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া) : ৪/৫৩
৩. শরহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম (ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাদেশ) : ২/২৪০

তাস ফেডারেশন গঠিত হয়েছে ১৯৭৭ সালে। অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয় বলে তাস খেলাকে উৎসাহিত করা হয় না। বাংলাদেশে প্রবাদ আছে, 'তাসে নাশ' অর্থাৎ তাস বেশি খেললে ক্ষতি হয়।[১]

তাস খেলার শরয়ী হুকুম:

তাস খেলা জায়েয নয়। এতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু আপত্তি রয়েছে। তা হলো:

১. তাস খেলার কাগজে সাধারণত মানুষের ছবি থাকে। আর ইসলামে প্রাণীর ছবির ব্যবহার নিষিদ্ধ।[২]

২. তাস খেলায় শারীরিক উপকার তো দূরের কথা, বরং এর দ্বারা মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এতে সহীহ কোনো মাকসাদ থাকে না।

৩. এ খেলায় অত্যধিক নিমগ্নতার কারণে অনেক সময় নামাজ কাযা হয়ে যায়।

এছাড়াও বাজি ধরা, সময় অপচয় ইত্যাদি আপত্তিকর বিষয় বিদ্যমান। মোটকথা, এসব কারণে তাস খেলা নাজায়েয। তাই এর থেকে বিরত থাকতে হবে।[৩]

ভিডিও গেমস

আধুনিক খেলার মধ্যে এ খেলাটির প্রচলন দিন দিন বেড়ে চলেছে। আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমস দেখা যায়। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ মানুষরাও বর্তমানে এ জাতীয় ভিডিও গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে এবং অনেক জরুরি কাজ-কর্মে বিঘ্নতা ঘটছে। এসমস্ত গেমসের মাধ্যমে বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলিম সন্তানদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রুক্ষতা, হিংস্রতা ও আক্রমণাত্মক হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এগুলোতে রয়েছে প্রচুর অপচয়। উপরন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে এই সমস্ত গেমস খেলার পর উদ্যম ও বিনোদনের পরিবর্তে ক্লান্তি অনুভূত হয়। আর এর প্রভাব অন্যান্য কাজে গিয়ে পড়ে। অথচ খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তর ও মন-মস্তিষ্ককে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখা। যাতে অন্যান্য কাজ নতুন উদ্যমে আঞ্জাম দেওয়া যায়।

এ সমস্ত খারাপির কারণে ভিডিও গেমস খেলা বৈধ নয়। এর থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। পরিবার ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য।

---

১. শিশু বিশ্বকোষ (তৃতীয় খন্ড, পৃ. : ৮৬)

২. সহীহ বুখারী (ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাদেশ) : ২/৮৮০, হাদীস- ৫৯৫০

৩. ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ (ইদারাতুল ফারুক করাচি) : ১০/৭৯; আপকে মাসায়েল (কুতুব খানায়ে নাঈমিয়া) : ৮/৪০৯; কিফায়েতুল মুফতী (ইদারাতুল ফারুক করাচি) ১৩/৯৬; ফাতওয়া মাহমুদিয়া (ইদারাতুল ফারুক করাচি) : ১৯/৫৩৩, ৩২৪/৪১৭; কিতাবুল ফাতাওয়া (কুতুব খানায়ে নাঈমিয়া) : ৬/১৫৭

লুডু খেলা

লুডো একটি ঘরোয়া খেলা। সাধারণ মানুষের জন্য নামমাত্র খরচে বিনোদনের জন্য যেসব খেলা রয়েছে, লুডো খেলা তার মধ্যে অন্যতম। ষোল ঘুটির খেলা, বাঘ বন্দি, ছক্কা, পঁচিশি, পাশা খেলা, এমন ধরনের বহু খেলা বাংলাদেশে থাকলেও লুডো যেকোনো বয়সে যেকোনো সময়ে খেলা যেতে পারে। এই খেলার উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে এই খেলাটি মধ্যযুগে মোঘল দরবারে পাশা, শতরঞ্জ বা দাবা খেলার সহজ বিকল্প হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল বলেই ক্রীড়া গবেষকরা মনে করেন। লুডো দুই ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণ লুডো চারজন একত্রে, প্রত্যেকের জন্যে চারটি করে গুটি নিয়ে খেলে থাকে। এতে যার চারটি গুটি সবার আগে নিজ ঘরে এসে পাকা হবে সেই খেলায় জয় লাভ করবে। অন্য ধরনের লুডো হলো সাপ ও মই লুডো। এই লুডো খেলায় প্রত্যেকের একটি করে গুটি থাকে। এই লুডোতে ছক্কা চেলে লুডোতে লেখা ১০০ ঘরে যে আগে পৌছাতে পারবে সেই জয় লাভ করবে। তবে লুডোতে সাজানো ১০০টি ঘর পেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কারণ এই ঘরগুলিতে অসংখ্য সাপ ও মই দেওয়া আছে। সাপের মুখে পড়লে সোজা সাপের লেজে এসে পড়তে হবে। আবার মইয়ের সাহায্যে ঝটপট ওপরে ওঠা যায়।[১]

লুডো খেলার শরয়ী বিধান

লুডো খেলা নাজায়েয। এতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু আপত্তি আছে। তা হলোঃ

১. লুডো খেলার কাগজে সাধারণত বিভিন্ন প্রাণীর ছবি থাকে। আর ইসলামে প্রাণীর ছবির ব্যবহার নিষেধ।

২. লুডো খেলায় শারীরিক উপকার তো দূরের কথা, এর দ্বারা মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এতে সহীহ কোনো মাকসাদ থাকে না ।

৩. এ খেলায় অত্যধিক নিমগ্নতার কারণে অনেক সময় নামাজ ছুটে যায়।

এ ছাড়া সময়ের অপচয়, বাজি ধরা, ইত্যাদি বিষয় বিদ্যমান।

মোটকথা, এসব কারণে লুডো খেলা নাজায়েয। এর থেকে বিরত থাকা জরুরি।[২]

ঘুড়ি ওড়ানো

সাধারণত কাগজ, সিল্কের কাপড়ও অন্য কোনো পাতালা জিনিস দিয়ে তৈরি সমদ্বিবাহু আকৃতির আকাশে উড়ানোর একটি খেলনা। এটি অর্ধবৃত্তাকার কাঠামোর ওপর তৈরি করা হয় এবং উড়ার সময় যাতে ভারসাম্য থাকে সে জন্য এতে একটি লেজ জুড়ে দেওয়া হয়। এর লেজ ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও ঘুড়িকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্থিরভাবে উড়তে সহায়তা করে।

---

১. দেখুন-শিশু বিশ্বকোষ (বাংলাদেশ শিশু একাডেমি) : ৫/১১০
২. আহসানুল ফাতাওয়া (যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ) : ৮/২৪৩

নারীদের জন্য খেলাধুলার বিধান

নারীর জন্য ইসলাম ওই খেলাধুলা অনুমোদন করে যা তার জন্য উপযুক্ত। যাতে পর্দাহীনতার কোনো সুযোগ নেই। বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই তার সম্ভ্রমহানীর। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বালিকাদের সাথে খেলতাম। আমার কিছু বান্ধবী ছিল। যারা আমার সাথে খেলা করত।

পাশ্চাত্যের, ভোগবাদী ও নোংরা সভ্যতার অন্ধ বিশ্বাসীরা নারীদের তাদের বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে, নিজেদের ভোগবাদী মানসিকতা বাস্তবায়নের হাতিয়ার বানাতে চাচ্ছে। 'পুরুষদের সাথে সমান তালে চলা'র আপাত শ্রুতিমধুর, অপরিণামদর্শী ও বাস্তবতাবিরোধী স্লোগান দিয়ে তাদের স্বীয় কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে আনার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আর তাদের এই ষড়যন্ত্র আঁচ করতে না পেরে আমাদের অনেক সরলমনা নারী নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস করছে। এই ফাঁদে পা দিয়ে নারীরা, পশ্চিমাদের দেখানো কাল্পনিক সফলতার পিছনে দৌড়াতে গিয়ে, নিজেদের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের দায়-দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে। আর এটা জানা কথা যে, যখন কোনো জাতির নারী সমাজ পরিবার ও সংসার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে আসবে তখন ওই জাতির ধ্বংস অত্যাসন্ন।

পশ্চিমাদের আপাত শ্রুতিমধুর তবে অবাস্তব ও কাল্পনিক মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। খেলাধুলাও এর ব্যতিক্রম নয়। ছেলেরা যেখানে খেলাধুলা করে সারা দুনিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করছে তাহলে মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে। তারাও 'বীরদর্পে' টেনিস, সাঁতার, হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করছে। সংক্ষিপ্ত পোশাকে খেলার নামে অঙ্গ প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। নারীদের এ জাতীয় খেলায় অংশগ্রহণ করা শুধু শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতেই হারাম নয় বরং মানব সভ্যতা ও সুস্থ বিবেক বিবর্জিত এবং সমাজ বিরোধী কাজও বটে। যেখানে এ জাতীয় খেলা পুরুষদের জন্য বৈধ নয় সেখানে নরীদের বেলায় তো প্রশ্নই উঠে না।

হ্যাঁ, মেয়েরা যদি পর্দা-পুশিদাহ বজায় রেখে এবং উপরে বর্ণিত খেলাধুলার মৌলিক নীতিমালাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে, বৈধ খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য, পরিমিত খেলাধুলা একটি উপকারী বিষয়। এটা যেমনিভাবে ছেলেদের জন্য উপকারী তদ্রূপ মেয়েদের জন্যও উপকারী। তবে আমাদের দেশে মেয়েদের খেলাধুলার জন্য স্বতন্ত্র কোনো জায়াগা নির্ধারিত থাকে না। তাই সরকার এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের উচিত হলো, প্রত্যেক এলাকায় এমন একটি জায়াগার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেখানে মেয়েরা তাদের পর্দা-পুশিদা বজায় রেখে স্বাচ্ছন্দে খেলাধুলা করতে পারবে।

বর্তমানে প্রচলিত খেলাগুলোর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জরিপ

১. উক্ত খেলাগুলোকে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনে করা হচ্ছে। খেলা যদি উদ্যম ও প্রফুল্লতা অর্জনের বিপরীতে জীবনের মাকসাদ বা মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, তাহলে তা যুক্তির দৃষ্টিতেও অত্যন্ত গর্হিত এবং নিন্দনীয়। আর বর্তমান খেলাগুলোতে এমনই হচ্ছে।

২. খেলাগুলোতে খেলোয়াড় এবং খেলার প্রতি আগ্রহীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমনকি জরুরি কাজসমূহের ওপর পর্যন্ত খেলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যার ফলে অনেক সময় বান্দার হক নষ্ট হয়।

৩. এ খেলাগুলো খেলতে গিয়ে সাধারণত ফরজ নামাজের ওয়াক্ত, পবিত্র জুম'আর দিন এবং রমজানুল মুবারকের ফরজ রোজার দিনগুলোর খেয়াল রাখা হয় না। অথচ এগুলো একজন মুসলমানের জন্য ফরজে আইন এবং অবশ্যকর্তব্য।

৪. সাধারণত এ খেলাগুলোতে বহু সময় নষ্ট হচ্ছে, যা জাতির প্রতিটি বিবেকবান মানুষের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

৫. উক্ত খেলাগুলোতে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের যেভাবে 'হিরো' বানিয়ে পেশ করা হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মের সন্তানরা মুজাহিদীন, আলেম-উলামা, বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ ও জাতির সেবকদের নিজেদের আইডল বানানোর পবির্তে যেভাবে খেলোয়াড়দের নিজেদের আইডল মনে করছে, সেটাও জাতির প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে চিন্তিত এবং বিচলিত করার বিষয়।

৬. অধিকাংশ খেলায় সতরের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অর্থাৎ শরীরের সেই অংশকে ঢাকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, যা ঢাকা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ পুরুষের জন্য এমন প্যান্ট পরে খেলা জায়েয নেই, যাতে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ খোলা থাকে। পক্ষান্তরে মহিলাদের তো পুরো শরীরই 'সতর'।

৭. অধিকাংশ খেলায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয়। আর যেহেতু এই নারী-পুরুষ শুধু চিত্তবিনোদন এবং খেলা দেখার উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়, এজন্য শোরগোল, গানবাদ্য, নাচ ও অন্যান্য অশালীন কাজ একেবারে খোলামেলাভাবে হতে থাকে। আর একারণেই বর্তমানে এ ধরনের অনুষ্ঠানে কোনো ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যাওয়া মানে নিজের অসম্মান ডেকে আনা।

৮. এ খেলাগুলো যেখানে শুধু মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য হওয়া উচিত ছিলো সেখানে এতে এখন দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়ে গেছ, যার দ্বারা খেলাসমূহের উদ্দেশ্যই খতম হয়ে যায়। বর্তমানে খেলার মাঠকে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করা হয়। এর হারজিতকে জাতীয় জয়-পরাজয় বলে ব্যক্ত করা হয় এবং এর ম্যাচগুলোর জন্য এমনভাবে দু'আ ও মান্নত করা হয় যেন বাইতুল মুকাদ্দাসের

স্বাধীনতা অথবা কাশ্মীরের জিহাদের সময় এসে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কর্তা দেশসমূহ এ ব্যাপারে শুভেচ্ছা এবং শোকপত্র পর্যন্ত প্রকাশ করে! হায় আশ্চর্য! সম্প্রতি এ ধরনের সংবাদও শোনা যায় যে, অমুক ম্যাচ দেখা ব্লাড প্রেসার এবং হৃদরোগীদের জন্য অনুচিত। এবং অমুক ম্যাচে এতো শ্রোতা ও দর্শক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

৯. এ খেলাগুলোতে নাচ, গান-বাদ্য, মদ্য পান, উলঙ্গপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও জুয়াসহ আরো অনেক শরীয়া পরিপন্থি এবং গর্হিত কাজের কেমন যেন একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

   এখন একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন যে, ওই খেলা যার উদ্দেশ্য শুধু মনকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য হওয়া উচিত ছিলো, সেটা আজ শরয়ী সীমারেখার প্রতি লক্ষ না রাখার কারণে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। (فهل من مدكر আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?)

খেলাধুলা ও অর্থনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যেসব খেলাধুলা সুস্থতা ও দৈহিক সক্ষমতার পক্ষে সহায়ক তা মৌলিকভাবে নাজায়েয বা দূষণীয় নয়। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমারেখা আছে, যা লঙ্ঘন করা হলে সাধারণ মুবাহ ও বৈধ কাজ তো দূরের কথা, নেক আমলও শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে জায়েয থাকে না। বরং আপত্তি ও প্রতিবাদের উপযুক্ত হয়ে উঠে। খেলাধুলার উদ্দেশ্য ছিল, ক্লান্তি, অবসাদ ও হীনম্মন্যতা কাটিয়ে নতুনভাবে প্রফুল্লতা ও উদ্যম নিয়ে স্ব স্ব কর্মে আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু বর্তমানে খেলাধুলার অবস্থা এই যে, তা আর খেলাধুলা নয়; বরং জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের বহু প্রয়োজন ও বাস্তব সমস্যার চেয়েও তা বহু গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খেলাধুলার আসরগুলোকে কেন্দ্র করে সারা দেশে এমন এক উন্মাদনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত এই দরিদ্র দেশের কত শত কোটি টাকা বিনষ্ট হল, কত কোটি মানুষের কত শত কোটি শ্রমঘণ্টা পানির মতো ভেসে গেল, তরুণ-যুবকদের স্বাস্থ্য, পড়া-শোনা ও নৈতিকতা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো কোনো কিছুই ভেবে দেখার ফুরসত নেই, এমনকি হৈ চৈ করতে গিয়ে আহত-নিহত হওয়ার ঘটনাগুলিও এই মুহূর্তে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। এক কথায় সাধারণ মানুষের জন্য এইসব খেলা এখন 'খেলা' নয়, জীবন-মরণের বিষয়। এই অবস্থাটাও 'বিনোদন' বলে গণ্য হতে পারে কি না তা সবার ভেবে দেখা উচিত। আরো যে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার তা হচ্ছে পর্দার পিছনের নিরবতা। ওইখানে কোনো উন্মাদনা নেই, ঐখানে আছে পয়সা-কড়ির চুলচেরা হিসাব। কারণ এইসব আসর হচ্ছে পুঁজিবাদী চক্রের পয়সা উপার্জনের মোক্ষম উপায়। ফলে খেলার পিছনে গোটা জাতির মূল্যবান সময় যেভাবে বিনষ্ট হচ্ছে তার নিন্দা ও আফসোসের ভাষা আমাদের জানা নেই।

এতৎসত্ত্বেও, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যত লাভজনক হওয়ায়, পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার বুদ্ধিজীবী নামের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি কিছু লোক লাগামহীন এই খেলাধুলাকে জাতির সামনে আশীর্বাদ হিসাবে পেশ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং তারা সরকার ও দায়িত্বশীলদের এ বিষয়ে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। এদের প্রোপাগান্ডা ও দুরভিসন্ধিমূলক বিষয়ে দায়িত্বশীল মহলের অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করে কোনো একটা বিষয়ের অনুমোদন ওই সময় দেওয়া যায়, যখন তা সামগ্রিক বিচারে মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয়। আর যদি কোনো বিষয় সামগ্রিক বিচারে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তখন শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভের হিসাব কষে তার বৈধতার অনুমোদন দেওয়া যায় না। যেমন, মদ ও জুয়ার আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

অর্থ : তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে জঘন্য পাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। আর এ দু'টোর পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর।[১]

মদ ও জুয়াতে যদিও মানুষের জন্য কিছু উপকার আছে, তাই বলে উপকার অপেক্ষা ক্ষতি গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও, শুধু উপকারের দিক বিবেচনা করে এগুলোর ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়নি।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে একই কথা বিবেচিত হবে। যখন এর লাভ ও উপকার অপেক্ষা ক্ষতি অধিক গুরুতর হয়ে উঠবে, তখন তা আর বৈধতার সীমারেখার ভিতর থাকবে না। সুতরাং,অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যত, খেলাধুলা কোনো গোষ্ঠী বা ক্লাবের জন্য উপকারী হলেও, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর লোকসান ও ক্ষতি গুরুতর হওয়ায় তা আর বৈধ থাকতে পারে না।

বর্তমানের এই খেলাধুলা একটি জাতির জন্য, -অন্যান্য অনুষঙ্গ বাদ দিলেও- শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই কতোটা অভিশাপ এবং কী পরিমাণ লোকসান ও ক্ষতি বয়ে আনে, নিম্নে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। ইনশাআল্লাহ।

আর্থিক ক্ষতির প্রসঙ্গ এলে প্রথমে আসে স্টেডিয়াম ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খরচাদি। একেকটি স্টেডিয়ামের নির্মাণ ও সংস্কারের পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং খেলার আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য যে বাজেট রাখা হয় তা দেখলে সচেতন ও সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন যে কারোরই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠবে। এটা কি আমাদের এই দরিদ্র দেশের জন্য চরম দুর্ভাগ্যজনক নয়?

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

জাতীয় পর্যায়ে কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় তা কিছুটা অনুমান করা যাবে নীচের পরিসংখ্যান দ্বারা। গত ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে গ্রান্ট থনটন নামের এক ব্রিটিশ হিসাব কর্মকর্তা বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে অর্থনৈতিক ক্ষতির একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। ওই রিপোর্টে তিনি বলেন, খেলা নিয়ে মত্ত থাকার কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার অনেক বেড়ে যায়। উপস্থিত কর্মীদেরও মন পড়ে থাকে খেলার দিকে। রাত জেগে খেলা দেখার কারণে তারা কাজ করে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি আনুমানিক ১ দশমিক ২৬ মিলিয়ন পাউন্ড, যা–খেলায় অংশগ্রহণ করে যে অর্থ আয় হয়–তার দ্বিগুণ।[১]

সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিচার্সের হিসাব মতে ২০০২ সালের বিশ্বকাপে ইউরোপীয় দেশগুলোর মোট ক্ষতি হয়েছিল ৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন পাউন্ড। (প্রাগুক্ত)

এরপর ব্যক্তি ও ঘরোয়া পর্যায়ে অর্থ অপচয়ের রয়েছে নানা দিক। নিজের প্রিয় দলের জার্সি না হলে তো চলেই না। যে দলের সমর্থন করি সে দলের একটা পতাকা তো টাঙ্গাতেই হবে। এ ছাড়াও গান-বাদ্যের উপকরণসহ অর্থ অপচয়ের রয়েছে আরো অনেক দিক। তন্মধ্যে আরেকটি দিক হলো, টিভি কেনা। টিভি না থাকলে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে তো অবশ্যই কিনতে হবে। আর থাকলেও নতুন টিভি চাই। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায় বড়ো পর্দায় খেলা দেখার জন্য বড়ো জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার আয়োজনে এবং ত্রিমাত্রিক মনিটরের ব্যবস্থার পিছনে অর্থের অপচয় কম নয়।

বিশ্বজুড়ে ক্রীড়া বাণিজ্যের গল্প আরো দীর্ঘ। বস্তুত যেকোনো ক্রীড়ার আসরই পুঁজিবাদীদের অর্থ উপার্জনের একটা উপলক্ষমাত্র। নিজেদের স্বার্থেই তারা গোটা পৃথিবীতে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। আর সাধারণ মানুষ তাদের পরিকল্পিত ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সময়, স্বাস্থ্য ও গাঁটের পয়সা অবলীলায় বিসর্জন দিয়ে থাকে। আইসিসি, বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও মিডিয়া সব পক্ষই বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা নিজেদের থলি ভারী করে। তাই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত, এতে কার লাভ, কার ক্ষতি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হজ ও কোরবানীর মওসুমে যেসব বুদ্ধিজীবী সরব হয়ে ওঠেন এবং গরিব-মিসকীনকে দান-খয়রাত করার সুফল ও যথার্থতা সম্পর্কে 'সূক্ষ্ম' বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন তারা বিশ্বকাপের সর্বব্যাপী অপচয়ের বেলায় সম্পূর্ণ নিরব হয়ে যান। তাদের বিচার-বুদ্ধি যেন দন্ত-নখরহীন হয়ে পড়ে এবং গরিব-দুঃখীর প্রতি মমতাও তখন তাদেরকে টু শব্দটি করাতে পারে না। সত্যিই বড়ো অদ্ভুত এই প্রজাতি!

এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। কিন্তু যে উন্মাদনা ও উন্মত্ততা আমাদের দেশে দেখা যায় তা পৃথিবীতে আর কোনো দেশে দেখা যায় কি না

---

১. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০০৬

সন্দেহ। এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেগুলোর নাম খেলাধুলার সাথে কখনো শোনা যায়নি; বরং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই সম্ভবত এ বৈশিষ্ট্য নিয়েই চলে। অথচ তারাও তাদের শিশু-কিশোরদের শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে সজাগ। খেলাধুলাকে জীবন-মরণের বিষয় না বানিয়েও তারা শুধু বিংশ শতাব্দীতে জীবিতই থাকেনি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিক থেকে তারা আমাদের চেয়েও অগ্রগামী। পৃথিবীর এক বৃহৎ রাষ্ট্র চীনের কথাই ধরুন, শরীরচর্চা ও দেহ সুরক্ষার কলা-কৌশলের প্রতি যতটা গুরুত্ব এদের মধ্যে পাওয়া যায় তা অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটাকেও তারা শুধু ব্যায়াম ও শরীরচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে, একে এমন ব্যাপক উন্মাদনার অনুষঙ্গ হতে দেয়নি। যা আবাল-বৃদ্ধের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখবে এবং তাদের মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য হতে উদাসীন বানিয়ে দেবে।

আজ এই জাতির প্রয়োজন খেলোয়াড়দের নয়, প্রয়োজন মেধাবী মানুষ ও দেশ গড়ার সৈনিকদের। অথচ আমরা এমন এক রঙ্গ-তামাশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছি যে, গায়ক-নায়ক ও খেলোয়াড়রাই আজ হয়ে গেছে নতুন প্রজন্মের আদর্শ।

একথাগুলির উদ্দেশ্য-আল্লাহ না করুন-শুধু সমালোচনা ও তিরস্কার করা নয়; বরং পূর্ণ দরদের সাথে দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা যে, ক্রীড়াপ্রীতি এখন সীমা অতিক্রম করেছে এবং এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি, এমন যেকোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে, যার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে। আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করুন! এভাবে আমরা আমাদের জাতিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? আমরা এমন একটি জাতি, যারা অসংখ্য সমস্যার ঘূর্ণিপাকে আটকে পড়ে আছি এবং নিজেদের প্রয়োজন পূরণে বাইরের দেশের সাহায্যের মুখাপেক্ষী, যেসব সাহায্য দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদার মূল্যে কেনা হয়। আমাদের প্রতিটি দিন একেকটি নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। শিশু-কিশোরদের সহীহ তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা নেই, আদালতে অমীমাংসিত মামলার স্তূপ জমে আছে, চারদিকে শত্রুরা হা করে আছে।

আল্লাহ পাক আমাদের এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আমাদের দুর্বল প্রচেষ্টায় এই 'মহাপ্লাবন' হয়ত রোধ করা যাবে না, কিন্তু এই সামান্য আয়োজন হচ্ছে একটি ব্যাপক পাপাচারের বিষয়ে বারাআত ও দায় মুক্তির ঘোষণা, যার অসীলায় মেহেরবান আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

ব্যাংকের প্রধান দুটি কাজ: সমাজের তিক্ত বাস্তব চিত্র

বর্তমানে ব্যাংক বলতে সাধারণত কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক ব্যাংককে বুঝায়। তাদের প্রধান কাজ-ই হলো, স্বল্প সুদে বা লাভে আমানত হিসেবে গ্রাহকদের অর্থ জমা গ্রহণ এবং অধিক সুদে বা লাভে উক্ত অর্থ ঋণ প্রদান। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি, বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ দুটি। যথা-

ক. স্বল্প সুদে আমানত হিসেবে গ্রাহকদের অর্থ জমা করা। ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব বা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে থাকে। যেমন: চলতি হিসাব (Current Deposit/Current account), সঞ্চয়ী হিসাব (Saving deposit/Saving account), স্থায়ী হিসাব (fixed deposit/ fixed account) ইত্যাদি।

খ. উক্ত অর্থ অধিক সুদে জনগণকে ঋণ প্রদান। ঋণের ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যাংক আমানতকৃত অর্থের ওপর কম সুদ প্রদান করে। অপরদিকে প্রদত্ত ঋণে অধিক সুদ আদায় করে। এ দু'য়ের পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। উদাহরণস্বরূপ, ১০০০ টাকা জমার ওপর মাসিক ৮% হারে সুদ দিবে ৮০ টাকা। এরপর তা ঋণ বাবদ প্রদান করলে ১২% হারে সুদ নিবে ১২০ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ৪০ টাকাই ব্যাংকের লাভ।

লক্ষ করুন, ১০০০ টাকা যে কোম্পানি লোন নিয়ে পণ্য উৎপাদন করল, সে ১২০ টাকা সুদসহ ১১২০ টাকা পরিশোধের জন্য তার পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিল। এর মানে এই অতিরিক্ত সুদ সাধারণ ভোক্তা শ্রেণি তথা ডিপোজিটরদের থেকেই নেওয়া হচ্ছে। একেই বলে 'পাম্পিং নীতি'। সাধারণ জনগণকে দুই পুঁজিপতি চাপ দিল; ব্যাংক ও শিল্পপতি। চাপে পড়ে বেচারা ডিপোজিটরের লাভের পরিবর্তে লোকসান গুণতে হয়।

এ কারণেই সুদের নীতিতে কখনোই সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না; বরং ধনী ও গরীবের মাঝে তফাত বাড়তেই থাকে।

জেনারেল ব্যাংকিং : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

এবার আমরা শরীয়াহ্‌র আলোকে জেনারেল ব্যাংকিংয়ের ওপর আলোচনা করব। এটিই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনার ভূমিকাস্বরূপ ব্যাংকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি উপর্যুক্ত আলোচনা মূল বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে।

জেনারেল ব্যাংকিংয়ের মৌলিক চিন্তা

ইতঃপূর্বে ব্যাংকের ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে, একেবারে শুরুতে সেই প্রাচীন যুগে ব্যাংকের মূল যে চিন্তাটি ছিল; অর্থাৎ অর্থ হেফাজত এবং বিনা সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম। এ চিন্তা থেকে পর্যায়ক্রমে ইউরোপের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। এ দুটি মৌলিক চিন্তা শরীয়াহ্ পরিপন্থি নয়। এজন্য আমরা বলতে চাই, ব্যাংকের মূল কনসেপ্ট ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

বাকি থাকল সুদের সম্পৃক্ততা। মূলত ব্যাংকের মূল কনসেপ্ট ও এর জন্মের সাথে সুদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি, ব্যাংক ইতিহাসের মাঝামাঝিতে আধুনিক যুগের শেষের দিকে ব্যাংকে সুদ প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ইউরোপের মধ্যযুগে অভিশপ্ত ইহুদি ব্যবসায়ীরা এর সাথে ব্যাপকভাবে সুদকে সম্পৃক্ত করেছে। এরপর ব্যাংকের মূল পরিচয়ই পাল্টে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক বলতেই এখন বুঝে নেওয়া হয়-'সুদি প্রতিষ্ঠান'। ব্যাংকের ডেফিনেশনেও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে। ইতিহাস না জানা থাকলে এটি বুঝা সহজ নয় যে, এর মূল পরিচয়ে সুদ ছিল না।

যাই হোক, ইউরোপের মধ্যযুগে ইহুদিদের হাতে নব আবিষ্কৃত ব্যাংকের পরিচয়ের সাথে ইসলাম সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। শুধু ইসলাম নয়; খোদ ইহুদি ধর্মসহ প্রাচীন সবকটি আসমানী ধর্মের সাথেও সাংঘর্ষিক। কারণ আসমানী সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল।[১] ইহুদিরা মুসলিম না হোক, অন্তত নিজ ধর্মে যদি অটল থাকত তাহলেও মানব-ইতিহাসে ব্যাংকের সাথে সুদ সম্পৃক্ত হতো না। মূলত তারা ছিল নামে ইহুদি; বাস্তবে স্বার্থ ও শয়তানের পূজারী।[২]

বর্তমান বিশ্বে 'ব্যাংকিং ব্যবস্থা' আর 'সুদ' মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। একটিকে ছাড়া আরেকটি চিন্তাই করা যায় না। অবশ্য মাত্র কিছুদিন হলো, ইসলামি ব্যাংকিং নতুন একটি কনসেপ্ট নিয়ে এসেছে। যা সুদমুক্ত। একে আমরা সাধুবাদ জানাই।

ব্যাংকে রাখা টাকা কি 'আমানত' নাকি 'করজ': শরয়ী দৃষ্টিকোণ

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয় তাকে আজকাল ব্যাংকিংয়ের পরিভাষায় Deposit বা 'আমানত' বলে। কিন্তু ফিকহের (Islamic law) পরিভাষায় একে 'আমানত' বলা সম্ভব নয়। কারণ, 'আমানত' একটি শরয়ী পরিভাষা (Forensic terminology)। এর বিধান ও বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. আমানতকৃত বস্তুর রিস্ক আমানতগ্রহীতার নয়; বরং আমানতদাতারই থাকে। সুতরাং আমানত গ্রহীতার অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন ছাড়া তা নষ্ট হলে এর দায়ভার তার নয়। যেমন, কেউ আপনার নিকট মোবাইল আমানত রাখল। তালাবদ্ধ রাখা সত্ত্বেও রাতের বেলা চুরি হয়ে গেল। তাহলে এর জরিমানা দেওয়া আমানতগ্রহীতার ওপর আবশ্যক নয়।

খ. আমানতগ্রহীতা নিজ প্রয়োজনে আমানতকৃত বস্তু ব্যবহার করতে পারবে না। ব্যবহার করলে তা খেয়ানত বলে পরিগণিত হবে।

গ. এর মালিক গ্রহীতা নয়। বরং আমানতদাতাই।

---

১. আবার আসমানী ধর্ম ছাড়া মানবরচিত ধর্মেও অভিশপ্ত সুদ নিষিদ্ধ। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মেও নিষিদ্ধ।

২. 'ইলুমিনাতি' এর রহস্য উদঘাটন হওয়ার পর এর সত্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে এই ফেতনা মোকাবেলা করার শক্তি দান করুন। আমীন

বলাবাহুল্য, ব্যাংকের টাকার ক্ষেত্রে 'আমানতের' উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় না। কারণ, ব্যাংকে টাকা রাখার পর তা অলসভাবে পড়ে থাকে না; বরং অন্যান্য টাকার সাথে মিলিয়ে ফেলা হয় এবং রীতিমতো তা গ্রাহকদের ঋণ দেওয়া হয়। সুদ নেওয়া হয়। আবার এ টাকার রিস্ক ব্যাংকের থাকে। মালিকও সে, তাইতো ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে থাকে। যখন গ্রাহকের প্রয়োজন হয়, তখন তাকে নিজের টাকা থেকে পরিশোধ করে দেয়। গ্রাহকের টাকা হুবহু পরিশোধ করা হয় না। ব্যাংকের এই আচরণ করজ বা ঋণের সাথে মিলে যায়। কারণ, করযের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিধান হল-

ক. ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতা নিজ প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।
খ. এর মালিক গ্রহীতা।
গ. মূল টাকা হুবহু ফেরত দিতে হবে না। বরং ওই জাতীয় বস্তু দিলেই হবে। যেমনঃ কেউ একশ টাকা ধার নিল। পরিশোধের সময় যেকোনো একশ টাকা দিলেই চলবে। হুবহু ওই একশ টাকা দিতে হবে না।

ঘ. এর রিস্ক করজ গ্রহীতার; দাতার নয়। সুতরাং কোনোরকম সীমালঙ্ঘন ছাড়াও যদি ওই টাকা নষ্ট হয় তাহলেও তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

ইসলামে বেচাকেনার একটি মূলনীতি হলো, কোনো বস্তুর ওপর বিধান আরোপের ক্ষেত্রে তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, শব্দপ্রয়োগ বা কোনো জাতির পরিভাষা হিসাবে বিধান নির্ণিত হয় না; বরং অন্তর্নিহিত উদ্দেশের দিক থেকে এর বিধান নির্ণিত হয়। এজন্যই ইন্টারেস্টকে 'মুনাফা' বললেও সেটা কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ 'রিবা' বা সুদই হবে। সুতরাং একে 'আমানত' বলা হোক, কিংবা 'ডিপোজিট'; করজের বিধান এর ওপর প্রযোজ্য হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

জনগণ তো ব্যাংকে আমানতের নিয়তে টাকা জমা রাখে। করজ বা ধার দেওয়ার নিয়তে নয়। কারণ, করজের উদ্দেশ্য হলো, ঋণ প্রদান করে সহায়তা করা। অথচ মানুষ ব্যাংকে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে টাকা জমা করে না। কেবল সম্পদ হেফাজতের উদ্দেশ্যেই জমা রাখে। তাহলে কেন কারেন্ট, সেভিং বা ফিক্সড অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে তাকে করজ বলা হবে?

উত্তরঃ এটা ঠিক যে, এখানে ব্যাংককে ঋণ প্রদান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার সময় তার নিয়তে আরও কিছু বিষয় থাকে। যথা- যখন-তখন টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ, ব্যাংক ডাকাতি হলেও টাকার দাবী ত্যাগ না করা। আবার ব্যাংকও এই নিয়তেই অ্যাকাউন্ট খুলে যে, সে এই টাকা ব্যবহার করবে, গ্রাহক যখন দাবী করবে তখন নিজ থেকে টাকা পরিশোধ করবে। এসব আচরণ করজের বৈশিষ্ট্য। আমানতের নয়। আর আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে বেচাকেনার একটি মূলনীতি হলো, কোনো বস্তুর ওপর বিধান আরোপের ক্ষেত্রে তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, শব্দপ্রয়োগ বা কোনো জাতির পরিভাষা হিসাবে বিধান নির্ণিত হয় না; বরং অন্তর্নিহিত উদ্দেশের দিক থেকে এর বিধান নির্ণিত হয়।[১]

---

১. শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী, ফিক্‌হী মাকালাত, ব্যাংক ডিপোজিট কে শরয়ী আহকাম, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, ৩/১৬-১৭

এখানে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর আমল পেশ করতে পারি। মানুষ তাঁর নিকট কেবল সুরক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থ জমা রাখত। তাঁরা তার নিকট অর্থ আমানতের নিয়তে রাখার জন্য আসত। আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য নয়। কিন্তু যুবাইর রা. জনগণ থেকে তাদের অর্থ আমানতস্বরূপ গ্রহণ করতেন না; বরং বলতেন, করজ হিসাবে রাখতে হবে।[১] অর্থাৎ, এটি আমার রিস্কে থাকবে। নষ্ট হলে জরিমানা দিব। আর আমি এ সম্পদ ব্যবহার করব।

লক্ষ করুন, তিনি এ চুক্তিকে করজ বললেন। অথচ লোকেরা করজ প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁকে টাকা দিত না। বরং উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের সুরক্ষা। এতে বুঝা গেল, 'সম্পদ সংরক্ষণ' এ নিয়ত মূল বিষয়টা করজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। করজের উদ্দেশ্য কখনো হয়, সহায়তা করে আখেরাতে সওয়াব কামানো। কখনো উদ্দেশ্য হয়, নিজের মালের হেফাজত করা। মূলত বর্তমানে সুদি ব্যাংকে মানুষ শেষোক্ত উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে।

সুতরাং শুধু নিয়তের কারণে বিধান আরোপ হবে না। কাজকর্ম, আচরণ ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে বিধান আরোপিত হবে। তাই কারেন্ট, সেভিং ও ফিক্সড অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে তা করজই হবে; আমানত না।

উক্ত আলোচনার সারকথা, প্রচলিত সুদি ব্যাংকিং ও সকল কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার অর্থ-কার্যত ঋণ প্রদান। এই ঋণ প্রদান মূলত ইসলামী আইনগত ব্যাখ্যায় ঋণ প্রদান। স্বাভাবিক রীতি অনুসারে নয়। ইসলামী আইন অনুসারে যেহেতু তা কার্যত ঋণ (কেউ কেউ বলেছেন- প্রথমে আমানত, চূড়ান্ত পর্যায়ে ঋণ), তাই এর বিপরীতে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ বা রিবা বলে বিবেচিত হবে। যা হারাম। এ কারণেই প্রচলিত সুদি ব্যাংকে টাকা রেখে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম ও সুদ।

ব্যাংকিং হিসাবঃ পরিচিতি, প্রকারভেদ ও বিধান

ব্যাংক হিসাব (Bank Account) বলতে সে হিসাবকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের আমানত গ্রহণ করে এবং চাহিবামাত্র তা পরিশোধ করে। সহজ কথায় বলা যায়, আমানতকারীদের নামে যে হিসাব খোলা হয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। অধ্যাপক হার্ডসনের মতে, ব্যাংক যে হিসেবের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে লেনদেন করে, তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। ড. এ. আর. খানের মতে, ব্যাংকের নিজস্ব নথিপত্রে যে প্রতীকের মাধ্যমে প্রতিটি মক্কেলের জমা ও উত্তোলন ব্যবহার দেখানো হয়, তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।[২]

---

১. বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, (২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.) আল-জামিউস সহীহ (সহীহ বুখারী), কিতাবুল জিহাদ, বাবু বারকাতুল গাজি ফি মালিহি, মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা : নং-৩০২৯, ১/৪৪১

২. আধুনিক ব্যাংকিং, ১৮৮ ইকবাল কবীর মোহন, কামিয়াব প্রকাশন ঢাকা

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ৪ ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে

১. Current account বা চলতি হিসাব, যাকে আরবীতে الحساب الجاري বলে। কারেন্ট অ্যাকউন্টে টাকা জমা রেখে আমানতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছে টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং টাকা জমা দিতে পারে। যেহেতু আমানতকারী যেকোন সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে, সেহেতু ব্যাংক এ আমানতের অর্থ দীর্ঘমেয়াদি খাতে ঋণ প্রদান করে না; বরং স্বল্পমেয়াদে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এ আমানতের জন্য ব্যাংক সাধারণত সুদ প্রদান করে না; বরং প্রদত্ত সেবার জন্য নির্দিষ্ট চার্জ কেটে রাখে। তবে সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক কারেন্ট অ্যাকাউন্টেও অল্প পরিমাণ সুদ প্রদান করে থাকে।

২. Saving deposit বা সঞ্চয়ী হিসাব, যাকে আরবীতে حساب التوفير বলে। ব্যাংক ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের উৎসাহিত করার জন্য গ্রাহকদের সঞ্চয়ী আমানত খোলার সুবিধা প্রদান করে। এ আমানত হিসাব হতে গ্রাহক সপ্তাহে সর্বোচ্চ দুইবার অর্থ উত্তোলন করতে পারে এবং যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দিতে পারে। ব্যাংক এ আমানতের উল্লেখযোগ্য অংশ স্বল্প ও মধ্য এবং কিছু অংশ দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে। তাই এ আমানত অর্থ বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। তবে ফিক্সড ডিপোজিটের তুলনায় এর সুদহার কম হয়ে থাকে।

৩. fixed deposit বা স্থায়ী হিসাব, যাকে আরবীতে ودائع ثابتة বলে। ব্যাংক এ অ্যাকাউন্টে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তে আমানত গ্রহণ করে থাকে। তাই স্থায়ী আমানতে রাখা টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে ফেরত নেওয়া যায় না। মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ায় এ আমানতের অর্থ বড়ো বড়ো স্থায়ী খাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবং এর সুদহার তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে।

৪. লকার (Locker), এটাকে আরবীতে خزانات المقفولة বলে। এ সিস্টেমে জনগণের মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকে। ব্যাংকের ভিতরে একটি সংরক্ষিত স্থানে জনগণের স্বর্ণ-রুপা বা মূল্যবান সম্পদ হেফাজত করে থাকে। এর জন্য ব্যাংক কেবল নির্ধারিত হারে ভাড়া গ্রহণ করে থাকে। সুদ প্রদান করে না এবং এখান থেকে ব্যাংক ব্যবসার মাধ্যমে লাভবানও হয় না। কেবলমাত্র ভাড়াই গ্রহণ করা হয়।[১]

---

১. শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী, ইসলাম আওর জাদীদ মায়িশাত ওয়া তিজারাত, হরফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. : ১৪০। ফিক্‌হী মাকালাত : ৩/১৩, যমযম প্রকাশনী

লকার, কারেন্ট, সেভিং ও ফিক্সড অ্যাকাউন্ট: শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ

লকার সিস্টেম

লকার সিস্টেমে ফিকহি দৃষ্টিকোণ হলো- ইজারা বা ভাড়া। অর্থাৎ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তার মূল্যবান বস্তুটি রাখার জন্য ব্যাংকের একটি জায়গা ভাড়া নিয়েছে। তাই সে এর ভাড়া দিবে। আর এ সম্পদ ব্যাংকের নিকট আমানতস্বরূপ থাকবে। তাই এতে আমানতের বিধান প্রয়োগ হবে। ব্যাংকের কোনোরূপ সীমালঙ্ঘন ব্যতিরেকে উক্ত সম্পদ নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জরিমানা দিতে বাধ্য নয়।

সেভিং ও ফিক্সড অ্যাকাউন্টের বিধান

সেভিং ও ফিক্সড অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার মাধ্যমে যেহেতু ব্যাংকে করজ প্রদান করা হয়। আর করজ দিয়ে অতিরিক্ত নেওয়া রিবাল কুরআন বা কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা। তাই ব্যাংক কর্তৃক মুনাফা নামে যা দেওয়া হয় তা 'রিবা' বা 'সুদ' বলে পরিগণিত হবে। যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

সুদি ব্যাংকে 'কারেন্ট অ্যাকাউন্ট' খোলার শরীয়াহ্ বিধান

জনসাধারণের ধারণা:

অনেকেই এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা ও ব্যবহার করাকে ঢালাওভাবে বৈধ বা জায়েয মনে করেন। তাই দেখা যায়-সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণির একটি বৃহৎ অংশ সুদি ব্যাংকে সুদমুক্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বেশ তৃপ্তির সাথে খোলে থাকেন। কারণ তা সুদি অ্যাকাউন্ট নয়। এতে সুদ আসে না।

প্রকাশ থাকে যে, সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক-এর সাথে সুদ যুক্ত করে থাকে। তবে গ্রাহক চাইলে এই অ্যাকাউন্ট খোলার সময়ই সুদমুক্ত হিসাবে খুলতে পারে। ইদানিং কিছু কিছু সুদি ব্যাংক অন্যান্য সেভিংস অ্যাকাউন্টেও সুদমুক্ত সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে আসছে। এমনটি হয়ে থাকলে, এ ধরনের অ্যাকাউন্টও তাদের কাছে বৈধ হবে, যারা সুদি ব্যাংকের সুদমুক্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে বৈধ মনে করে থাকেন।

মোটকথা, ব্যাংক যদিও সুদি। তবে এই অ্যাকাউন্ট বা অন্য অ্যাকাউন্ট সুদমুক্ত হলে তা ব্যবহার করা যাবে বলে সাধারণত মনে করা হয়।

প্রশ্ন হলো, সুদি ব্যাংকের সুদমুক্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের শরীয়াহ্ বৈধতা আসলেই কি নিঃশর্তভাবে প্রমাণিত? বিজ্ঞ আলিমগণ কি একে ব্যাপকভাবে বৈধ বলেছেন? কেউ বৈধ বলে থাকলে কি কি শর্ত ও প্রেক্ষাপটে বৈধ বলেছেন? বিষয়টি অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে- এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম ও মুফতি সাহেবদের একটি বক্তব্যও এমন পাওয়া যায়নি, যা ব্যাপকভাবে এর বৈধতার পক্ষে। বরং অধিকাংশ আলেম একে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

যারা কিছুটা নমনীয় হয়েছেন, তারাও বিশেষ শর্ত ও প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বলেছেন। অথচ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে, যেহেতু সুদমুক্ত অ্যাকাউন্ট, তাই তা ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। এটা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় বা বলা হয়। নিম্নে এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলিমগণের ফতোয়া ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো-

আরব বিশ্বের আলিমগণের বক্তব্য ও ফতোয়া

আরব বিশ্বের আলিমগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সিদ্ধান্ত হলো-এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না। কারণ, তা সুদমুক্ত হলেও-সামগ্রিকভাবে এতে সুদি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহযোগতিা করা হয়। তাঁদের মতে-এটি শরীয়তে নিষিদ্ধ 'পাপ কাজে সহযোগিতা' (الإعانة على المعصية) এর নিষিদ্ধ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

শাইখ আলী আহমদ ছালূছ:

"القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي" للشيخ الدكتور علي أحمد السالوس (ص ١١١-١١٢):

أماالحساب الجاري فالبنك يستفيدمن أرصدة هذه الحسابات ويستثمرها لنفسه، حيث تنتقل الملكية إليه ويضمن رد المثل. من هذا نرى أن الحساب الجاري عقد قرض بين المودع والبنك ، ومادام البنك لايعطي فائدة على هذا النوع من القروض، فالقروض إذن هنا قرض حسن، وهو يخلو من الربا، ومع هذا قد لا يخلو من الحرمة!

فالقرض الحسن إذا كان عونًا على ارتكاب الحرام فهو حرام، ومن المعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون مراب، فمعظم نشاطه يقع في دائرة الحرام. وأرصدة الحسابات الجارية يستعين بها في الإقراض بالربا، وغير ذلك من الأعمال المحرمة، غير أن المسلم عندما لايجد إلا البنوك الربوية فقد تدفعه الضرورة إلى التعامل معها، ولاحرج في هذا مادامت الضرورات تبيح المحظورات.

قالقائل:" أنا أريد أن أحفظ مالي، ونيتي تتجه إلى هذا لا إلى معاونة البنك الربوي، فإذا كان استخدامه الاستخدام السيئ فالإثم يقع عليه"

وهذا القول صحيح مادام لم يجد مكانا أمينا يحفظ فيه ماله، فلجأ إلى البنك، فالضرورة هي التي ألجأته لهذا، والضرورة تقدر بقدرها. انتهى.

সারমর্ম : কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাংক প্রফিট অর্জন করে এবং নিজেন স্বার্থে তা বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যাংক এ অর্থের মালিক হয়ে যায়। তার দায়িত্বে কেবল সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হয়।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হলো ব্যাংক এবং ডিপোজিটরের মাঝে এক প্রকারের ঋণ চুক্তি। আর যতক্ষণ ব্যাংক এই ঋণের বিপরীতে কোন প্রফিট দিবে না, ততক্ষণ সেটা এক প্রকার 'ক্বরযে হাসান', আর সেটা 'রিবা' মুক্ত। এতৎসত্ত্বেও তা হারাম থেকে মুক্ত নয়।

কারণ, 'ক্বরযে হাসান' যখন হারাম কাজে সহযোগিতার কারণ হয়, তখন সেটিও হারাম হবে। আর এটা জানা কথা যে, সুদি ব্যাংক হলো সুদি ঋণের ব্যবসায়ী, এবং সুদি ব্যাংকের অধিকাংশ লেনদেনই সুদি লেনদেন। আর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মূলত ব্যাংককে সুদি ঋণ প্রদান ও অন্যান্য হারাম লেনদেনে সহযোগিতা করে থাকে। অবশ্য একজন মুসলিম যদি সুদি ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না পেয়ে সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেনে জড়িত হয়, তবে এতে সমস্যা নেই।

কেউ বলতে পারেন, আমি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখি-কেবল সংরক্ষণের নিয়তে। ব্যাংককে সুদি কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা করার ইচ্ছা আমার নেই। এখন যদি ব্যাংক সেটাকে কোন হারাম কাজে ব্যবহার করে তাহলে এই অপরাধের গুনাহ ব্যাংকের উপর বর্তাবে। আমার উপর নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য ততক্ষণ সঠিক, যতক্ষণ পর্যন্ত সুদি ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন আস্থাযোগ্য স্থান না পেয়েই তাতে জড়িত হবে। কারণ প্রয়োজনের কারণেই সে সুদি ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়েছে। আর শরীয়াহ্র স্বীকৃত মূলনীতি হলো, "الضرورة تقدر بقدرها" জরুরত নির্ধারিত হয় তার পরিমাণ অনুযায়ী। সুতরাং যতটুকু দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাচ্ছে, এর অতিরিক্ত করা শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ।[১]

সুদি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট ফ্রি অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা বিষয়ে শাইখ বিন বায রহ.-এর ফতোয়া

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. বলেন-

"أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة، إذا كان البنك يعامل بالربا، لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية، فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها". انتهى.

---

১. কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ ওয়াল ইকতিসাদিল ইসলামী, পৃ. ১১১-১১২

'একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সুদি ব্যাংকের সুদমুক্ত অ্যাকাউন্টে টাকা না রাখাই অধিক সতর্কতা। কেননা তাতে সুদ গ্রহণ ছাড়া টাকা রাখাটাও তার সুদি কারবারে সহযোগিতা করার নামান্তর। তাই ডিপোজিটরের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা হয় যে, তার অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও তিনি গুনাহের কাজে সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতএব, কর্তব্য হলো- আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন (সুদ ও সুদি কাজে সহযোগিতা) তা থেকে বিরত থাকা এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করা।' [১]

সৌদী আরবের সর্বোচ্চ ফতোয়া বোর্ড 'লাজনাতু দায়িমা লিল-বুহুসিল ইল্‌মিয়্যা ওয়াল ইফতা' (Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta) এর ফতোয়া

إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم، لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللَّهُمَّ إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.

'ব্যাংকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে তলবি হিসাব বা মেয়াদি হিসাবে টাকা রাখা হারাম। তদ্রূপ মুনাফা গ্রহণ ছাড়াও সুদি ব্যাংকে (কারেন্ট অ্যাকাউন্টে) টাকা রাখাও হারাম। কেননা এক্ষেত্রে সুদি কারবারে সহযোগিতা করা হলো এবং সুদি কাজ করার সুযোগ দেওয়া হলো। তবে যদি একান্ত বাধ্য হয় যে, সেখানে না রাখলে সম্পদ চুরি বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সম্পদ হেফাযতের উদ্দেশ্যে সুদি ব্যাংকে টাকা রাখতে পারবে। কেননা, জরুরতের কারণে অনেক সময় সুদি ব্যাংকে টাকা রাখতে ছাড় দেওয়া হয়।'[২]

ড. গাস্‌সান মুহাম্মাদ সাহেবের মতামত

আজমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Ajman University, সংযুক্ত আরব আমিরাত) অধ্যাপক, বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. গাসসান মুহাম্মাদ শাইখ হাফি. তাঁর اختلاط الحلال بالحرام في تعاملات المصارف الإسلامية নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বা তাতে টাকা রাখার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম মুফতী

---

১. মাজমু ফাতওয়া ওয়া মাকালাত : ১০/১৫০-১৫১
২. ফাতাওয়াল লাজনাতুত দায়িমাহ লিল বুহুছিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা : ১৩/৩৪৫

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফি.-এর নমনীয় বক্তব্য উল্লেখ করার পর শাইখ মুসতফা যারকা রহ. ও অন্যান্য সমসাময়িক ফকীহদের বক্তব্যের সপক্ষে মন্তব্য করেতে গিয়ে বলেন,

"يرى الباحث بأن الراجح عدم جواز إيداع أو فتح الحسابات الجارية في البنوك التقليدية إلا إذا كان هناك ضرورة؛ لأن النقود المودعة في الحسابات الجارية تدخل في ملك البنك، وله الحق في استعمالها في معاملاته الربوية، وفي ذلك إعانة واضحة على المعاملات الربوية المحرمة شرعا." (ص:١٢٩)

অর্থাৎ, উপরোক্ত দুটি মতের মধ্যে আমার কাছে অগ্রগণ্য মত হিসেবে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে একেবারে অনন্যোপায় হয়ে না পড়লে, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচলিত সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা কিংবা তাতে টাকা রাখা বৈধ নয়। কেননা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে তা (স্বয়ংক্রিয়ভাবেই) সুদি ব্যাংকের মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং ব্যাংক তা সুদি লেনদেনে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে ব্যাংককে হারাম এবং অবৈধ সুদি লেনদেনে সহযোগিতা করা হয়।[১]

ড. আলী আল কারী[২] সাহেবের মত

বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় জেদ্দা-এর ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আলী আল-কারী 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা'র ৯ম অধিবেশনে (১৪১৫ হি./১৯৯৫ইং) উপস্থাপিত তার "الحسابات والودائع المصرفي" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

১. ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল, পৃষ্ঠা: ১২৯

২. ডক্টর মুহাম্মাদ আলী আলকারী। তিনি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা মুকাররামায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সৌদি আরবের জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সমাপ্ত করেন। সেখানে তিনি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অর্জন করেন। এরপর থেকে তিনি ইসলামী অর্থনীতিতে বিশেষভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি সৌদি আরবের জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটির ইসলামী অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক ছিলেন এবং এখনও এর সাথে নানাভাবে যুক্ত আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (Organization of the Islamic Conference)-এর অধীনে পরিচালিত ইসলামিক ফিক্হ একাডেমি এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (Islamic world Union))-এর অধীনে পরিচালিত ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিল-এর একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া তিনি ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং অর্গানাইজেশন (অ্যাওফি)-এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের একজন সদস্য এবং ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী অর্থ ও আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক জার্নাল এবং একাডেমিক কমিটির সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য।

الحسابات الجارية تعاون الإثم والعدوان:

يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:٢]

لما كان الربا من الكبائر، ولما علم أن الفوائد المصرفية التي هي أساس عمل البنوك هي من الربا المحرم، وأن البنوك إنما توجه الأموال المتجمعة لديها في الحسابات الجارية إلى التمويل بالإقراض المتضمن للفوائد الربوية، دل ذلك على أن كل حساب مصرفي جار إنما يؤدي إلى زيادة في نشاط المصرف المذكور وتوسع في قدرته على الإقراض بالربا.

والقاعدة أن ما أدى إلى حرام فهو حرام والأمور بمآلاتها، ولذلك فقد رأى البعض أن هذه الحسابات في البنوك الربوية، على رغم أنها بذاتها لا تتضمن التعامل بالفائدة، إلا أن فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة وهو عدم جواز التعاون على الإثم والعدوان، لا سيما في الحالات التي يتوفر على المجتمع فيها بنوك أخرى ومؤسسات مصرفية تنهض بنفس الوظائف والأغراض دون التعامل بالفائدة كالبنوك الإسلامية. (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ٥٤٥، بترقيم الشاملة آليا)

অর্থ : কারেন্ট অ্যাকাউন্ট: পাপ এবং সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

আর তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করো সৎকর্ম ও তাকওয়ায়।[১]

যেহেতু সুদ একটি বড় পাপ। আবার ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট; যা ব্যাংকের কাজের মূল ভিত্তি সেটা নিষিদ্ধ সুদ এবং ব্যাংক তাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থকে বিনিয়োগ করে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। তাই এ বিষয়গুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের প্রতিটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যাংকের সুদভিত্তিক ঋণ প্রদানের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করে।

আর শরীয়াহ্র নিয়ম হচ্ছে, যে জিনিস হারাম কোনো বিষয় পর্যন্ত পৌঁছায়, সেটাও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়। এ জন্যই কেউ কেউ এমন মতামত দিয়েছেন যে, কনভেনশনাল ব্যাংকের এ ধরণের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা না রাখা। স্বয়ং এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যদিও গ্রাহকের সাথে কোনো সুদি লেনদেন হচ্ছে না। তারপরও এর মধ্যে শরীয়াহ্র অন্যতম

১. সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ২

স্বীকৃত মূলনীতি ‘পাপ কাজে সহযোগিতা’ (الإعانة على المعصية) নিষিদ্ধ’-এর বিরোধিতা সুস্পষ্ট। বিশেষত যখন এলাকায় এমন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকবে, যারা কোনো প্রকার সুদি লেনদেন ছাড়াই এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন, ইসলামী ব্যাংকসমূহ।[১]

শাইখ মুস্তফা যারকা রহ.-এর মত

আরব বিশ্বের বিখ্যাত ফকীহ, শাইখ মুস্তফা যারকা রহ.[২] সুদি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

هل إيداع النقود في المصارف الربوية جائز شرعاً أم محظور؟

فنقول: إن هذا الإيداع عن غير اضطرار هو محظور وعمل آثم؛ لأن فيه تقوية للمصرف على المراباة، وهذه التقوية هي إعانة له على المعصية. ولعل هذا الاستنتاج إذا صحت تلك المقدمات يبدو من الوضوح بحيث لا مجـال فـيـه للجدل والمناقشة. وإن تلك المقدمات صحيحة بلا ريب، فهو صحيح كذلك.

هذا إذا كان الايداع في المصارف الربوية بلا اضطرار . أما إن لم يكن هناك بد من هذا الإيداع : إما لصيانة المال، أو لحـاجة أخرى مـشـروعـة كتسهيل تداوله وتحويله إلى الجهات التي يراد تحويله إليها، فإن الوجه عندئذ يختلف، ويكون المودع عندئذ غير أثم في الإيداع .

هذا ، وفي جميع الأحوال ، سواء في الضرورة أو الحاجة، من المقرر فقها، أن هذا الترخيص حكم استثنائي يتقيد بقيام الاضطرار أو الاحتياج. ويتحدد مداه بحدودهما، فلا يجوز

---

১. ইসলামী ফিক্হ একাডেমি জেদ্দা, জার্নাল : ৯/৭৩৩

২. শাইখ মুস্তফা আহমাদ আয-যারক্বা রহ.। মৃত্যু- ১৯ রবীউল আওয়াল, ১৪২০হি./৩ জুলাই, ১৯৯৯খ্রি.। ১৩২২হি./১৯০৪খ্রি. সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে ধার্মিক ও অভিজাত-জ্ঞানী পরিবারে তাঁর জন্ম। তার পিতা শাইখ আহমাদ যারক্বা (শরহুল কাওয়ায়িদিল ফিক্বহিয়্যাহ-এর লেখক) ও দাদা শাইখ মুহাম্মাদ যারক্বা রহ. হানাফী মাযহাবের তৎকালীন বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। শাইখ ইউসুফ কারযাভী রহ. এই ৩ পুরুষের বংশ পরম্পরার নাম দিয়েছেন ‘ইলম বা জ্ঞানের স্বর্ণালী চেইন’ (سلسلة الذهب في العلم)। তাঁর অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম অতুলনীয় গ্রন্থ ‘আল-মাদখাল আল-ফিক্বহী আল-আম’।

تجاوز مقدار ما تدفع به الحاجة أو الاضطرار، كما أنه يزول الترخيص بزوالهـمـا، ومن ثم وضعت القـاعـدة الفقهية القائلة: (الضرورة تقدر بقدرها) والقاعدة الأخرى: (ما جاز لعذر بطل بزواله).

ونتيجة ذلك في موضوعنا هذا الذي تعالجه، وفي واقعنا الزمني، أنه متى وجدت مؤسسات إسلامية موثوقة في البلاد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية، فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخص الاستثنائي، فلا يجوز للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية، بل يجب توجيه الإيداع إلى تلك المؤسسات الإسلامية، التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع.

وقد وجد اليوم ، والحمد لله، في عدد من البلاد الإسلامية مؤسسات من هذا القبيل، وهي المصارف الإسلامية (اللاربوية) التي قامت بصـورة نظامية وموثوقة في دبي والكويت والمملكة الأردنية والسودان ومصر، وكلها في نظر أهل المعرفة والخبرة محل ثقة اقتصادية الثمانية واستثمارية ، فهي علاوة على المقاصد الآنفة الذكر، تحقق لأصحاب الودائع فيها استثمارات حسنة المردود بالطرق الحلال في الشريعة الإسلامية بأكثر مما تعطيه المصارف الربوية من فوائد للمودعين، كما أنها تؤدي جميع الخـدمـات التجارية التي تؤديها تلك المصارف.

فلم يبق بعد قيام هذه المصارف (البنوك الإسلامية) عذر للإيداع في المصارف الربوية ، فيصبح الإيداع فيها محظورًا لمن يوجد في بلده مصرف إسلامي.

সারমর্ম:

সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা করা জায়েয নাকি হারাম?-এই প্রশ্নের উত্তরে শাইখ বলেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংক সব ধরনের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা হারাম এবং একটি পাপ কাজ। কারণ, এটি সুদি কাজে ব্যাংককে সহায়তা করার নামান্তর। তবে যদি বাস্তবিকই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ন্তর না থাকে; যেমন,

অর্থ সংরক্ষণ অথবা অন্য কোনো বৈধ প্রয়োজন। তাহলে এক্ষেত্রে আমানতকারী পাপী এবং মন্দ কাজে সহযোগী সাব্যস্ত হবে না।

আর শরীয়াহ্‌র স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে, (الضرورة تقدر بقدرها) 'জরুরত নির্ধারিত হয় তার পরিমাণ অনুযায়ী'। সুতরাং যতটুকু দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাচ্ছে, এর অতিরিক্ত করা শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে আরেকটি শরয়ী মূলনীতি হলো, (ما جاز لعذر بطل بزواله) 'ওজরের কারণে কোনো বিষয়ের বৈধতা ততোক্ষণই থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই ওজরটি বাকী থাকে'।

কিন্তু বর্তমান সময়ে দুবাই, কুয়েত, জর্ডান, সুদান এবং মিশর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সুদি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত করে দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে ডিপোজিট করার কোনো অজুহাত থাকে না, তাই যাদের দেশে ইসলামী ব্যাংক আছে তাদের জন্য সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে টাকা জমা করা শরয়ী মূলনীতির আলোকে অবৈধ সাব্যস্ত হচ্ছে।[১]

শাইখ ড. আলী আহমদ সালূস[২]

ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি, জেদ্দার ৯ম অধিবেশনে (১৪১৫ হি./১৯৯৫ ইং) ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট ও শরীয়াহ্ নিয়ে দীর্ঘ ফিক্‌হ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে উন্মুক্ত ফিক্‌হ ডিসকাশনে বিখ্যাত ফকীহগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সেশনে ড. আলী আহমদ সালূস হাফি. অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন-

أما الحساب الجاري فلا يختلف في البنك الربوي عن البنك الإسلامي في أنه عقد قرض غير أنه يختلف أيضا في الهدف، فالبنك الربوي عندما أضع في الحساب الجاري يستخدم هذا المال في الحرام، وبذلك أكون ساعدته في الحرام. من هنا جاء قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بأنه لا يجوز لمسلم أن يتعامل مع مصرف ربوي متى استطاع أن يتعامل مع مصرف إسلامي.

---

১. প্রবন্ধঃ المصارف: معاملاتها، ودائعها، فوائدها -পৃ. ১৮-২১, ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল, সংখ্যাঃ ০১, বর্ষঃ ০১, পৃ. ৩৫

২. শাইখ আলী ইবনে আহমদ আলী আসসালূস। (জন্ম-১৯৩৪খ্রি. মিসরে) তিনি মিসরী আলেম। দারুল উলূম কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে একাডেমিক ডিগ্রি, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স সার্টিফিকেট ও ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমান বয়স ৮৭-৮৮ বছর। কাতারের রাজধানী দোহায় বসবাস করেন। ১৪০১ হি. থেকে কাতার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্বরত আছেন।

অর্থাৎ সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করয এর চুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে কোনো পার্থক্য হবে না। তবে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে। সুদি ব্যাংকে যখন কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা হয়, তখন তা হারাম কাজে ব্যয় করে। আর এই কারণেই আমি তা হারাম কাজে সহযোগিতা করা মনে করি। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফিকহি বোর্ড ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিল, মক্কা- এর সিদ্ধান্ত রয়েছে। তা হলো, কোনো মুসলিম যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের সাথে কার্যক্রম করতে সক্ষম হবে, ততক্ষণ তার জন্যে সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা জায়েয নেই।[১]

ড. সামী হাসান হামূদ[২]

ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দার উক্ত অধিবেশনে 'পর্যালোচনা সেশনের' শুরুতে ড. সামী হাসান হামূদ সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন-

السؤال: إذا كان الحساب الجاري قرضا فهل يعتبر الحساب الجاري في البنك الربوي أنه معونة له على الإثم؟

الجواب: أما المعونة على الإثم في حال التعامل مع البنك الربوي فقد نقل رأي البعض بمخالفة ذلك لأصل من أصول الشريعة ولا سيما إذا وجدت البنوك الإسلامية.

প্রশ্ন : যখন কারেন্ট অ্যাকাউন্টের তাকয়ীফ হলো করয, তাহলে কি সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে গুনাহের কাজে সহযোগিতা হবে?

উত্তর: সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে কোনো কোনো আলেম গুনাহের কাজে সহযোগিতা হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ, এক্ষেত্রে এটি শরীয়াহ্‌র একটি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়। সেটি হলো গুনাহের কাজে সহযোগিতা। বিশেষত যখন ইসলামী ব্যাংক পাওয়া যাবে। তখন তো সুদি ব্যাংকে টাকা রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না। [৩]

---

১ ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল : ৯/৮৭৯

২. ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক জেদ্দা-এর অধীনে পরিচালিত ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ের গবেষক।

৩. ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল : ৯/৮৬৭

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনে মানি' হাফি.[১]

ইসলামী ফিক্হ একাডেমির উক্ত সেশনে পর্যালোচনা পর্বে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনে মানিঈ হাফি. শুরুতে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যটির গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে তা হুবহু তুলে ধরা হলো-

إن المصارف الإسلامية جاءت باستجابة وبفضل من الله -سبحانه وتعالى- لوقوفها في جانب محاربة الربا، وفي جانب محاربة الربا ما تقوم به البنوك الربوية من استحلال الربا أخذا وعطاء وغير ذلك. ففي الواقع لقد فرح واستبشر بوجودها مجموعة كبيرة من الحريصين على دينهم وعلى التمسك به وعلى أن يكون المسلمون في خير وفي نجاة من الربا ومن محاربة الله -سبحانه وتعالى- ورسوله لأهله، فإذا كان كذلك فينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر إلى هذه المصارف الإسلامية نظرة إشفاق، ونظرة مساعدة، ونظرة معاونة، وأن نيسر لهم ما وسعنا التيسير ما لم يكن ذلك إثما جريا مع قاعدة، ومع المسلك السليم الذي وجه إليه (صلى الله عليه وسلم) وكان يأخذ به حيث قالت عائشة -رضي الله عنها- ما خير (صلى الله عليه وسلم) بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

هذه مسألة أحب -أن تكون على كل حال- محل نظر، وإذا وجدنا أن هناك قولا وإن كان قولا مرجوحا فيما ذكره علماؤنا الأفاضل السابقون لكنه في الواقع لا يتعارض مع

---

১. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনে মুহাম্মাদ আল মানি' হাফি.। জন্ম- ১৩৫২হি./১৯৩০খ্রি. ৬ ডিসেম্বর সৌদি আরবের নজদ অঞ্চলে। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। বর্তমান বয়স প্রায় ৯২। ১৩৭৭হি./১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (Imam Muhammad Bin Saud Islamic University) থেকে একাডেমিক সার্টিফিকেট অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদবৃন্দের মধ্যে অন্যতম শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ., শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী। ১৩৭৭হি./১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম-এর অধীনে পরিচালিত ফতোয়া বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করেন এবং গ্র্যান্ড মুফতী সাহেবের মৃত্যু অবধি সহকারী মুফতী ও শরয়ী বিচারক হিসাবে বহাল থাকেন। ১৩৯১হি./১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় আদেশে প্রতিষ্ঠিত 'হাইআতু কিবারিল উলামা' (Council of Senior Scholars)-এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে অদ্যবধি আপন পদে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ১৩৯৫হি./১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শরীয়াহ্, প্রশাসনিক ও অর্থনীতি বিষয়ে শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ.-এর অ্যাটর্নি জেনারেল মনোনীত হন। সর্বশেষ ১৪২১হি./২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় এক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি রাজকীয় আদালতের শরয়ী উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং এখনো সেই পদেই বহাল আছেন। এছাড়াও শাইখ আব্দুল্লাহ মানিঈ প্রায় ৭০টি ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ্ বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে উম্মতে মুসলিমার এক অতুলনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামী অর্থনীতি, বিমা, ফতোয়া ও ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন শাখায় তার একাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও ফতোয়া সমগ্র, গ্রন্থ ও রচনা আছে। যেমন, বুহুস ফিল ইকতিসাতিল ইসলামী। আততামীন ওয়া হুকমুহু ফিশ-শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ। বুহূস ও ফতোয়া সমগ্র (৪খণ্ডে) ইত্যাদি।

أمر شرعي ومع دليل شرعي ومع قاعدة عامة وفي نفس الأمر يخدم هذه البنوك ويساعدها على أداء مهمتها، فلا يجوز لنا أن نقول: هذا قول مرجوح وهذا قول ضعيف. بينما نجده يساعد أو يخدم هذه البنوك وفي نفس الأمر ليس له معارض من الأصول المعتبرة من كتاب الله ومن سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ومن القياس أو من الإجماع إلا أنه قول لم يقل به جمهور أهل العلم.

সারমর্ম: 'ইসলামী ব্যাংকিং মূলত আমাদের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। এটি সুদি ব্যবস্থার প্রতিরোধ হিসাবে এসেছে। এর মাধ্যমে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। অপরদিকে প্রচলিত সুদি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সুদ আদান-প্রদান বিস্তার করতে।

ফলে যারা দ্বীন-ধর্ম অনুযায়ী চলতে আগ্রহী, তারা সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই অগ্রযাত্রায় যারপরনাই আনন্দিত হয়েছেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে তারা সুদ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা থেকে নিরাপদে থাকার সুযোগ পাবেন। বিষয়টি যখন এমনি, তখন হে আমার ভাইয়েরা! আমাদের উচিত হলো, ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি সহযোগিতা ও আন্তরিকতার হাত প্রসারিত করা। ইসলামী ব্যাংকিং-কে শরীয়াহর সাথে অগ্রসর করতে, শরীয়াহ্ সীমারেখার মধ্যে থেকে যতদূর সম্ভব সহজ পন্থা উদ্ভাবন করা। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি সহজটাই গ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এমন দু'টো বিষয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হত, যার একটি অপরটির তুলনায় সহজ, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন, যদি সেটি দোষের না হতো। আর দূষণীয় হলে তিনি তা হতে সর্বাধিক দূরে থাকতেন'।

অতএব, ইসলামী ব্যাংকিং ইস্যুতে আমরা যদি এমন কোনো শরীয়াহ্ মত পেয়ে যাই, যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়; তাহলে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। যদিও তা অগ্রগণ্য বক্তব্য না হয়। কারণ তা পূর্ববর্তী সম্মানিত আলিমগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। শর্ত হলো, সেটি শরীয়াহ্র স্পষ্ট কোনো দলিল-প্রমাণ, মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। এসব ক্ষেত্রে শুধু 'অগ্রগণ্য নয়', এমন কথা বলে তা প্রত্যাখান করা উচিত নয়। এমন কথা শোভনীয় নয়-এ মতটি মারজূহ বা অগ্রগণ্য নয় বা দুর্বল বক্তব্য। অথচ এই মত গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়াহ্ পরিপালনে অগ্রসর হচ্ছে। এর সাথে মৌলিকভাবে শরীয়াহ্ মূলনীতির সাংঘর্ষিকতাও নেই। হ্যাঁ, এমন শরীয়াহ্ মত গ্রহণ করা যাবে না, যা একেবারেই বিচ্ছিন্ন বা 'শায' বা ইজমার পরিপন্থি।[১]

---

১. ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল : ৯/৮৮৬

এরপর তিনি সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা প্রসঙ্গে বলেন-

هل يعتبر الحساب الجاري لدى البنوك الربوية تعاونا على الإثم والعدوان ؟

أعتقد أن التعامل معهم في الإيداع وفي إيثارهم في المعاملات التي من شأنها أن تقوم به المصارف الإسلامية أعتقد أن هذه نوع من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأنها تساعدهم على أداء مهمتهم الرذيلة والخبيثة وهي استحلال الربا أخذا وعطاء، ومن يتعاون على الإثم والعدوان فهو -في الواقع- معرض نفسه لغضب الله، وقد سبق وأن صدر من مجموعة من العلماء فتاوى بجواز الإيداع في البنوك الربوية إذا لم يكن هناك بنوك إسلامية أو عوامل إسلامية من شأنها أن تقوم بمثل هذه الخدمات، أما الآن والحمد لله وقد جاءت المصارف الإسلامية تقوم بنفس الخدمات التي تقوم بها المصارف الربوية ، فأعتقد أن أي إنسان يؤثر هذه البنوك الربوية على البنوك الإسلامية وهو مسلم سيحاسب على تصرفه، ولا شك أنه يعتبر متعاونا على الإثم والعدوان في ذلك.

সারমর্ম: সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা কি গুনাহের কাজে সহযোগিতা বলে বিবেচিত হবে?

আমি মনে করি সুদি ব্যাংকে টাকা রাখা এবং তাদেরকে লেনদেনে উৎসাহিত করা, এটা এক প্রকার গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। কেননা এতে তাদেরকে সুদের মতো নিকৃষ্ট কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর গুনাহের কাজে যে ব্যক্তি সহযোগিতা করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ক্রোধে নিজেকে নিক্ষেপ করল। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেখানে ইসলামী ব্যাংকিং নেই, কেবল সেক্ষেত্রে আলেমদের একটি জামাত সুদি ব্যাংকে টাকা রাখাকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে (আল্লাহর শুকরিয়া) সুদি ব্যাংকিং-এর বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম হয়ে যে ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংকের তুলনায় সুদি ব্যাংককে প্রাধান্য দিবে, অচিরেই তার উক্ত লেনদেনের উপরে তাকে পাকড়াও করা হবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা গুনাহের কাজে সহযোগিতা বলে বিবেচিত হবে।[১]

১. ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল, ৯/৮৯১

শাইখ মুহাম্মাদ আলী আত-তাসখীরী রহ.[১]

ইসলামী ফিক্হ একাডেমির উক্ত সেশনে পর্যালোচনা পর্বে শাইখ আলী আত-তাসখীরী রহ. অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন-

النقطة الخامسة: بقي مسألة واحدة فقط وهي مسألة الحساب الجاري في البنوك الربوية. لا أشك في أنها يصدق عليها الإعانة وخصوصا إذا لاحظنا الحسابات الجارية الضخمة التي يودعها أصحابها في البنوك الربوية، والتي هي تشكل دم الحياة الربوية هناك في تلك البنوك، لا ريب أنها إعانة على الإثم فإذا لم يكن هناك اضطرار في الأمد، ينبغي التحرز بالإضافة إلى الفوائد والآثار الشرعية التي تترتب على وضع الأموال في البنوك اللاربوية. وشكرا لكم.

৫ম পয়েন্ট: (সর্বশেষে) শুধু একটি মাসআলা বাকি রইল, তা হলো- সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মাসআলা। এটি যে হারাম কাজে সহযোগিতার নামান্তর, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষভাবে যদি আমরা লক্ষ করি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে সুদি ব্যাংকে মোটা অঙ্কের টাকা রাখা হয়, যেসব ব্যাংকে সুদি কারবার করা 'দেহের রক্ত তুল্য' গুরুত্ব রাখে। এ পরিস্থিতিতে এতে কোনো সন্দেহ নেই, এমন কাজ গুনাহের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে। সুতরাং একান্ত প্রয়োজন না হলে, শরীয়াহ্ উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য এর থেকে বিরত থাকা উচিত।[২]

উপরোক্ত আলিমগণ স্পষ্ট ভাষায় স্বাভাবিক অবস্থায় সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা অনুমোদন করেননি। এর সাথে 'পাপ কাজে সহযোগিতা'-এর বিষয় জড়িত। যে কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় এর শরীয়াহ্ অনুমোদন নেই।

ভারতীয় আলিমগণের ফতোয়া

মুফতী নেযামুদ্দীন রহ.

حفاظت کی غرض سے یا کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے اگو بینک میں روپیہ جمع کرنا پڑے تو ایسے شعبہ یا کھاتہ میں جمع کرنے کی کوشش کرے جس میں سود کا حساب ہی نہ لگایا جاتا ہو، پھر اگر ایسا نہ ہو سکے تو جو رقم سود کے نام سے ملے اس کو بینک میں ہر گز نہ چھوڑے بلکہ وہاں سے نکال لے۔

---

১. শাইখ মুহাম্মাদ আলী আততাসখীরী রহ. (জন্ম-১৯ অক্টোবর, ১৯৪৪খ্রি.। মৃত্যু- ১৪৪২হি./২০২০খ্রি. ৭৫ বছর বয়সে)। তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, ধর্মগুরু, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক এবং বিচারক ছিলেন। তিনি The World Assembly for the Rapprochement of Islamic Doctrines-এর প্রাক্তন মহাসচিব ছিলেন। তাকে একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দা, জার্নাল : ৯/৮৯১

অর্থাৎ, সংরক্ষণ বা কোনো আইনী পাবন্দির কারণে ব্যাংকে টাকা ডিপোজিট রাখতে হলে ইন্টারেস্ট ফ্রি অ্যাকাউন্ট বা হিসাবে রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এটা সম্ভব না হলে যে পরিমাণ সুদি মুনাফা অর্জিত হবে, সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না রেখে তুলে নিবে।[১]

দারুল উলূম দেওবন্দ

حفاظت کی کوئی دوسری صورت نہ ہونے کی بناپر حفاظت کی غرض سے بینک میں (کرنٹ یاسیونگ اکاؤنٹ کے طور پر) رقم رکھ دینے کی شکل میں جوزائد رقم بہ نام سود اسکے اکاؤنٹ میں آئے اسے نکال کر غرباء، مساکین، مستحقین زکاۃ پر صدقہ کر دیناواجب ہے اپنے استعمال میں لاناناجائز ہے -"چند اہم عصری مسائل، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند ۲/۲۷۹

অর্থাৎ, টাকা সংরক্ষণের অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাংকে (কারেন্ট বা সেভিংস অ্যাকাউন্টে) ডিপোজিট রাখার কারণে মূলধনের অতিরিক্ত প্রদত্ত সুদি মুনাফা অ্যাকাউন্ট থেকে উত্তোলন করে গরীব, মিসকীন, হতদরিদ্র ও সাদাকাহ গ্রহণের উপযুক্তদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ওয়াজিব। নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করা অবৈধ হবে।[২]

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

جہاں اسلامی بنک کی سہولت موجود نہ ہو وہاں مروجہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ رقم کی حفاظت کے لئے یہ ایک ضرورت ہے، بعض دفعہ حساب وکتاب میں بھی یہ سہولت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کمپنی کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی وغیرہ۔

جہاں اسلامی بینک کے ذریعہ کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہو وہاں سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے -جائز اس لئے کہ یہ معاملہ ودیعت کا ہے۔جو فی نفسہ جائز ہے اور مکروہ اس لئے کہ اس میں ایک جملہ سودی ادارہ سے تعلق ہے۔

অর্থাৎ যেখানে ইসলামী ব্যাংক দুর্লভ হবে, সেখানে প্রচলিত ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা জায়েয। কেননা এই প্রয়োজনটি হলো সম্পদ সংরক্ষণের জন্য। তাছাড়া কোনো কোনো সময় এটা কোম্পানির হিসাবের ক্ষেত্রেও সহজ হয়। যেমন: কোম্পানিতে কর্মরত চাকরিজীবিদের বেতন দেওয়া ইত্যাদি কাজ।

কিন্তু যেখানে ইসলামী ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা সহজলভ্য, সেখানে সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা জায়েয, কিন্তু মাকরূহ। জায়েযের কারণ হলো,

---

১. মুন্তাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯০
২. চান্দ আহাম্ম আসরী মাসায়েল, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত : খ.২, পৃ.২৭৯

এটি একটি ওয়াদিয়াহ্ লেনদেন, যা মূলত জায়েয। আর মাকরূহ এই কারণে যে, তাতে সামগ্রিকভাবে একটি সুদি কোম্পানিকে সহযোগিতা করা হচ্ছে।[১]

পাকিস্তানের আলিমগণের ফতোয়া

বিননুরী টাউন

بہتر تو یہی ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہ کھلوایا جائے، لیکن اگر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی گنجائش ہے۔

اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جتنی چاہے اپنی رقم بینک سے نکلوالے گا، اور بینک اس کا پابند ہوتا ہے کہ اس کے مطالبہ پر رقم ادا کرے، اور اکاؤنٹ ہولڈر اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ رقم نکلوانے سے پہلے بینک کو پیشگی اطلاع دے، اور اس اکاؤنٹ پر بینک کوئی نفع یا سود بھی نہیں دیتا، بلکہ اکاؤنٹ ہولڈر حفاظت وغیرہ کی غرض سے اس اکاؤنٹ میں رقم رکھواتے ہیں۔ نیز بینک اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم کا ایک حصہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھتے ہیں؛ تاکہ اکاؤنٹ ہولڈر جب بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کی ادائیگی کی جاسکے، اس ساری صورتِ حال میں اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اس کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی گنجائش ہے۔ اور جو بینک اس سے سودی کام کرے گا اس کا گناہ متعلقہ ذمہ داران کو ہوگا، نہ کہ اکاؤنٹ ہولڈر کو۔ فقط واللہ اعلم

অর্থাৎ, প্রয়োজন না থাকলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট না খোলাই ভালো, তবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন হলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ আছে।

কারণ, বর্তমান অ্যাকাউন্টধারীর অধিকার আছে যে, ব্যাংক থেকে যখন-তখন, যেভাবে ইচ্ছা তার টাকা উত্তোলন করতে পারবে এবং ব্যাংক তার দাবি অনুযায়ী টাকা দিতে বাধ্য। আর টাকা উত্তোলনের পূর্বে ব্যাংককে অবহিত করতে অ্যাকাউন্টধারী করতে বাধ্যও নয়। ব্যাংক এই অ্যাকাউন্টে কোনো লাভ বা সুদ দেয় না, বরং অ্যাকাউন্টধারী গ্রাহক নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য এই অ্যাকাউন্টে টাকা রাখে।

তাছাড়া ব্যাংক এই অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থের একটি অংশ রিজার্ভ রাখে; যাতে গ্রাহকের দাবি মাত্রই ফেরত দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টধারী গ্রাহক এ ধরনের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে পারবে।

আর ব্যাংক এই অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকার মাধ্যমে যে সুদি লেনদেন করবে, তার পাপ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের উপর বর্তাবে, গ্রাহকের উপর নয়।[২]

---

১. জাদীদ ফিক্হী মাসায়েল : ৫/৩৫৭

২. ফাতওয়া জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউন, ফাতওয়া নং : ১৪৪০০৭২০০১০৫

উপরিউক্ত আলিমগণও প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন দিয়েছেন। কিছু ফাতাওয়ায়-'প্রয়োজনে খোলা যাবে' কথাটি এসেছে। তবে দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়া থেকে এই 'প্রয়োজন' এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তা হলো-যেখানে অন্য কোনোভাবে এই প্রয়োজন পূরণ হবে না। মাও. খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী দা.বা. স্পষ্টভাবে এই কথা বলেছেন।

'পাপ কাজে সহযোগিতা' (الإعانة على المعصية) বিষয়ক মাসআলার কিছু জরুরি বিশ্লেষণ

আলোচিত মাসআলার সাথে الإعانة على المعصية-এর মাসআলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা জরুরি। যথা-

হারাম কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা-

এক. সরাসরি নিজে হারাম কাজ করা।

দুই. সরাসরি নিজে হারাম কাজ করা নয়। তবে অন্যকে হারাম কাজ করতে সহযোগিতা করা।

তিন. নিজে সরাসরি হারাম কাজ করা নয়। অন্যকে সহযোগিতা করাও নয়। তবে হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার সবব বা কারণ (The reason) হওয়া। প্রত্যেকটির বিধান ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো-

বিধান

প্রথমটি সম্পূর্ণ হারাম। দ্বিতীয়টিও নিষিদ্ধ ও গুনাহ। এর দলিল সূরা মায়েদার ২ নং আয়াত-(তরজমা) "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।"

ফিকহের ভাষায় এ স্তরকে বলা হয়-'ইয়ানত আলাল মাআসিয়্যাত' (الإعانة على المعصية)। অর্থাৎ পাপ কাজে সহযোগিতা করা (Helping others in sin)। এর পরিচয় হলো-

পাপ কাজটি সংঘটিত হওয়ার পেছনে সহযোগিতাকারীর ভূমিকা প্রধান। একমাত্র তার সহযোগিতায়ই পাপ কাজটি সংঘটিত হয়েছে। পাপ কাজটি পাপী করলেও এর সাথে সহযোগিতাকারীর সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয় না।

এর তিনটি প্রকার রয়েছে। তা হলো-

ক. সহযোগিতার নিয়ত করা। যেমন, পাপ কাজে সহযোগিতা করার নিয়তে গানের সিডি ভাড়া দেওয়া। ঘর ভাড়া দেওয়া যেন পতিতাবৃত্তিতে সহযোগিতা হয়।

খ. মূল চুক্তিতে গুনাহর কথা উল্লেখ থাকবে। যেমন, কেউ বলল, আমার কাছে আপনার বাড়িটি ভাড়া দিন। তাতে আমি মদের বার খুলব অথবা সিনেমা হল করব ইত্যাদি।

গ. এমন বস্তু বিক্রি করা যার একমাত্র ব্যবহার গুনাহের কাজে হয়ে থাকে। অথবা এমন বস্তু ভাড়া দেওয়া, যার একমাত্র ব্যবহার গুনাহের কাজে হয়ে থাকে। বিষয়টি জ্ঞাত। যদিও মূল চুক্তিতে গুনাহের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ না করা হয়।

উপরোক্ত তিন প্রকারেই মূল পাপ কাজটি অন্য কেউ করলেও তা সংঘটিত হওয়ার পেছনে সহযোগিতাকারীর ভূমিকাই প্রধান। তা হলো, পাপ কাজের নিয়ত করা। হয় স্পষ্টভাবে, না হয় বিধানগত দিক থেকে। (শেষের দুটি ক্ষেত্রে পাপ কাজের নিয়ত 'বিধানগত'ভাবে বিদ্যমান) সুতরাং এখানে চুক্তির উভয় পক্ষ গুনাহগার হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই গুনাহ চুক্তির মাধ্যমেই হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তীতে গুনাহের কাজে ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহার না করলেও চুক্তির গুনাহ থেকে যাবে।

তৃতীয় প্রকার: তা হলো, নিজে সরাসরি হারাম কাজ করা নয়। অন্যকে সহযোগিতা করাও নয়। তবে হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার সবব বা কারণ (The reason) হওয়া। একে ফিকহের পরিভাষায় 'তাসাব্বুব' (التسبب) বলা হয়।

এর পরিচয় হলো, পাপ কাজটি সরাসরি সহযোগিতাকারীর কারণে হয় না; বরং সে কাজটির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ/মাধ্যম হয়।

বিধান

এটিও মৌলিকভাবে হারাম। কুরআনুল কারীমে এসেছে-"হে মুসলিমগণ, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে।"[১]

দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির (ইয়ানত ও তাসাব্বুব) মাঝে মোটা দাগের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ-

ক্র.নং	ইয়ানত (Helping others in sin)	তাসাব্বুব (The reason)
০১	এটি সাধারণত পাপ কাজের সাথে সরাসরি নিয়তের দিক থেকে সম্পৃক্ত হয়।	এটি সরাসরি পাপ কাজের সাথে কর্মগত দিক থেকে সম্পৃক্ত হয়।
০২	পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে।	পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হয়।
০৩	এটি হারাম।	এটি ক্ষেত্র বিশেষ কখনও হারাম, কখনও মাকরূহ হয়।

১. সূরা আনআম, আয়াত : ১০৮

এখানে ভাবার বিষয় হলো, 'তাসাব্বুব' (The reason) একটি বিস্তৃত বিষয়। সব ধরনের মুবাহ কাজও 'তাসাব্বুব'-এর মধ্যে এসে যায়। যদি একে ব্যাপক রাখা হয় তবে দুনিয়ার কোনো মুবাহ কাজ-ই হয়ত জায়েয থাকবে না। যেমন, গ্রামের কৃষক ফসল করার পর অনেকেই তা খায়। ভাল-মন্দ সকল মানুষই তা গ্রহণ করে। এর মধ্যে চোরও আছে। এভাবে চিন্তা করলে কোনো মুবাহ কাজই বৈধ থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী একটি সীমারেখা অবশ্যই থাকবে। বৈধতা ও অবৈধতার একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে।

এই সীমারেখা (Boundary) নির্ধারণ কাজ সহজ নয়। অত্যন্ত জটিল কাজ। হাদীস ও ফিকহের যাবতীয় মূলনীতি সামনে রেখে তা নির্ণয় করতে হবে। বিষয়টি অতি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় এ নিয়ে মতভেদ থাকাও স্বাভাবিক। আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ফকীহগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো-

'তাসাব্বুব' (The reason)-এর প্রকার

'তাসাব্বুব' (The reason) দু' ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. নিকটবর্তী সবব (কারণ)।

খ. দূরবর্তী সবব (কারণ)।

নিকটবর্তী সবব

নিকটবর্তী সবব আবার দু' ধরনের। যথা-ক. হারাম। খ. মাকরূহে তাহরীমি।

হারাম

এই প্রকার সববের বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. সহযোগিতাকারী পাপ কাজটি ঘটার শক্তিশালী মাধ্যম হওয়া। (المحرك القوي)

খ. সহযোগিতাকারীর সহযোগিতা যদি না হতো তাহলে সাধারণত পাপ কাজটি ঘটার বাহ্যিক কোনো কারণ থাকত না।

উদাহরণ, হিন্দুদের দেবতাদেরকে গালি-গালাজ করা, অশ্লীল মুভি তৈরি করা, পর্ন ছড়ানো, অশ্লীল মুভির সিডি ভাড়া দেওয়া, ইত্যাদি।

বিধান

এসব সবব এত শক্তিশালী যে তা মূল পাপ কাজ করারই নামান্তর। এজন্য যে 'সবব' হলো তার দিকেও পাপ কাজের নিসবত হবে। যদিও মাঝে আরেক ব্যক্তি পাপ করে। তাই এ ধরনের সববের শিকার হওয়া হারাম।

মাকরূহে তাহরীমী

এই প্রকার 'সববের' বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. পাপ কাজটি ঘটার একমাত্র শক্তিশালী মাধ্যম নয়।
খ. সহযোগিতাকারী পাপ কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে কেবল সহায়ক হওয়া।
গ. পাপ কাজটি বস্তুর মূলের সাথেই সম্পৃক্ত। পাপ কাজের জন্য স্বতন্ত্র কোনো পরিবর্তন বা কাজ করতে হয় না।
ঘ. পাপ কাজ ঘটার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকা। চুক্তিতে স্পষ্ট না বলা, নিয়তও না থাকা।

উদাহরণ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা, ফেতনাবাজদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা ইত্যাদি।

বিধান

এসব সববের শিকার হওয়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে জানা না থাকলে মাযুর বলে গণ্য হবে। এরপর যখন জানবে তখন এর থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

আর যদি চুক্তিতে পাপ কাজের কথা স্পষ্ট বলা থাকে অথবা পাপ কাজে সহযোগিতা করার নিয়ত থাকে তবে তো তা দ্বিতীয় প্রকার তথা 'ইয়ানত আলাল মাআসিয়্যাত' (Helping others in sin) এর মধ্যে ঢুকে যাবে, যা কঠিনভাবে হারাম।

দূরবর্তী সবব

এটিও দু' ধরনের। যথা-
এক. মাকরূহে তানযিহী, দুই. বৈধ।

মাকরূহে তানযিহী

এই প্রকার সববের বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. যে অবস্থায় আছে এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বস্তু দিয়ে পাপ কাজ করা যাবে না।
খ. পাপ কাজ করতে হলে তাতে স্বতন্ত্র কাজ করতে হবে।
গ. সংশ্লিষ্ট বস্তুটি সরাসরি পাপ কাজের কোনো মাধ্যম হওয়া।

উদাহরণ, ফেতনাবাজদের নিকট লোহা বিক্রি করা, এরপর সেটা দিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করা ইত্যাদি।

বিধান

এসব সববের শিকার হওয়া মাকরুহে তানযিহী। তাহরীমি নয়। কারণ, মাঝে স্বতন্ত্র কাজ করতে হয়। তবে সহযোগিতার নিয়ত থাকলে তা 'ইয়ানত আলা মাআসয়্যািতের' মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৈধ

তা হলো-পাপ কাজের সাথে সম্পর্কটা দূরবর্তী সম্পর্ক। সেটা সরাসরি পাপ কাজের কোন মাধ্যম নয়। মাঝে একাধিক মধ্যস্থতা থাকে। যেমন, মুদি দোকানের জন্য দোকান ভাড়া দিলেন। সেই দোকান থেকে সুদখোরও তার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করে। এগুলো বৈধ।

আমাদের সমাজে এ ধরনের কাজই বেশি। অনেকে ভুল করে এসবকে পাপ মনে করে থাকে। আর বলে-সুদ থেকে তো বাঁচা সম্ভব নয়। যেমন, মুদি দোকান থেকে যে পণ্য কিনবেন সেটা তো সুদি লোন দিয়ে কোম্পানি তৈরি করেছে। গাড়িতে উঠবেন, ওই গাড়ি তো সুদি লোনে ক্রয় করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়া নিবেন, ওই বাড়িতো বাড়ির মালিক সুদি লোন দিয়ে বানিয়েছে ইত্যাদি। এসব স্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, সুদি লোন দিয়ে বাড়ি তৈরি ও সেই বাড়ি ভাড়া নেওয়া স্বতন্ত্র দুটি বিষয়। অনেক দুর্বল চিত্তের লোকরা এসব কারণে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হয়।[১]

দ্যা এসেম্বলি অব মুসলিম জুরিস্টস, আমেরিকা-এর শরীয়াহ্ সিদ্ধান্ত

১৪২৮ হিজরী/২০০৮ইং সনে বাহরাইনে আমেরিকার 'মাজমাউ ফুকাহাউশ শারীয়াহ্' (The Assembly of Muslim Jurists At America) তাঁদের পঞ্চম সেমিনারে এ বিষয়ে মৌলিক কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সংক্ষেপে রেজুলেশনটি বেশ সমৃদ্ধ ও চমৎকার। তা হলো-

পাপ কাজে সহযোগিতা করার চারটি স্তর হতে পারে। যথা-

ক. সরাসরি ও ইচ্ছাকৃত (Intentional) পাপ কাজে সহযোগিতা হবে। যেমন, কাউকে মদ দেওয়া হলো, যেনো সে তা পান করে। (مباشرة مقصودة)

খ. সরাসরি পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। তবে নিয়ত থাকবে না। যেমন, হারাম কোনো পণ্য বিক্রয় করা, যার বৈধ কোনো ব্যবহার নেই। (مباشرة غير مقصودة) এটি তখনি, যখন হারাম কাজে সহযোগিতার নিয়ত থাকবে না।

গ. পাপ কাজে সহযোগিতা করার ইচ্ছা আছে, তবে সেটা সরাসরি সহযোগিতা নয়। যেমন, সিগারেট বা মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। (مقصودة غير مباشرة)

ঘ. সরাসরি সহযোগিতা নয়, ইচ্ছাও নেই। যেমন, এমন বস্তু বিক্রয় করা, যার বৈধ ব্যবহারও আছে। মোবাইল, ল্যাপটপ বিক্রয় করা এর অন্তর্ভুক্ত। (غير مباشرة، ولا مقصودة)

---

১. জাওয়াহিরুল ফিক্হ (নতুন এডিশন), খ.৭, পৃ.৫১০; ফিকহুল বুয়ূ : খ. ১,পৃ. ১৮৯-১৯৪

উক্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছিল-উপর্যুক্ত চার প্রকারের মাঝে প্রথম তিন প্রকার নিষিদ্ধ ও অবৈধ। শুধু চতুর্থ প্রকার বৈধ[১]।

তবে অন্যান্য ফকীহগণ উক্ত চতুর্থ প্রকারের সাথে এটি যুক্ত করেছেন যে, এক্ষেত্রে যদি নিশ্চিত বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা যায়, ক্রেতা/গ্রাহক এর অবৈধ ব্যবহার করবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাও অবৈধ হয়ে যাবে। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন, যার কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা হবে, যদি জানা যায়, সে তা দিয়ে মদ বানাবে, তাহলে তার কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা যাবে না। তবে এর জন্য স্ব-প্রণোদিত হয়ে আলাদা করে ইনভেস্টিগেশন করা জরুরি নয়।

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে আমরা যদি সুদি ব্যাংকের সুদমুক্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা নিয়ে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যায়-

সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও 'পাপ কাজে সহযোগিতা'-এর প্রসঙ্গ

সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হলে-সেটি 'ইয়ানাহ আলাল মা'সিয়্যাহ' (পাপ কাজে সহযোগিতা) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত। পূর্বে তা সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। পূর্বোক্ত ফকীহগণের বিশ্লেষণের আলোকে-সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হলে-তা নিম্নোক্ত পন্থায় পাপ কাজে সহযোগিতা বলে বিবেচিত হয়-

১. এতে সুদি ব্যাংকের সম্পদ (Asset) বৃদ্ধি হয়।
২. সুদি ব্যাংকের ইনকাম (ফি/চার্জ) হয়।
৩. ব্যাংক সুদি ঋণ প্রদাণের সুযোগ পায়।
৪. সুদি আয় তৈরি হয়।

মোটকথা, উক্ত অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকার উপর সুদ না দেওয়া হলেও, এর মাধ্যমে সুদি ব্যাংককে তার সুদি কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়। এতে সন্দেহ নেই। এখন নির্ণয় করতে হবে-এই সহযোগিতার স্তর কি?

স্তর নির্ণয়-একটি জটিল কাজ। আমাদের ক্ষুদ্র উপলব্ধিতে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি ঘটে-গ্রাহকের জানা থাকে, এ অর্থ সুদি ব্যাংকের সামগ্রিক সুদি কাজে একটি সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে। (সাপোর্টের পূর্বোক্ত ৪টি ধরন পূর্বে বলা হয়েছে) ব্যাংক মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই এ কাজগুলো করতে পারে। (সুনআহ বা মধ্যবর্তী কাজ নেই) এ বিবেচনায় তা مباشرة غير مقصودة (সরাসরি পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। তবে নিয়ত থাকবে না) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি তা পূর্বোক্ত

---

১. ইসলাম সুওয়াল জওয়াব, প্রশ্ন নং: ৩৪৭৫৮৬। (লিংক:
https://islamqa.info/ar/answers/247586/ ضابط الاعانة المحرمة على المعصية)

বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'সবেবে কারীব' (নিকটতম কারণ)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'মাকরূহে তাহরীমী' হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্তত 'মাকরূহে তানযীহীর' চেয়ে যে কিছুটা প্রবল হবে-এতে সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে হযরত থানভী রহ.-এর নিম্নোক্ত ফতোয়া বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য.-

دوسرا یہ محذور ضرور لازم آیا کہ اس شخص نے ایسے لوگوں کو قرض دیا جو اس سے ربا کا نفع حاصل کریں گے تو یہ ان کی اعانت ہوئی معصیت پر جو کہ مقدمہ ثالثہ کی رو سے معصیت ہے۔

অর্থাৎ, দ্বিতীয়ত আবশ্যিকভাবে এই বিষয়টি চলে আসে যে, ওই ব্যক্তি এমন ব্যাক্তিকে ঋণ দিল, যে তারা দ্বারা সুদের মুনাফা ভোগ করবে। এইভাবে তাকে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হলো। যেটা তৃতীয় ভূমিকা অনুযায়ী এক প্রকার গুনাহ।[১]

কিছু সন্দেহ ও অপনোদন

- সুদি ব্যাংকে নানা ধরনের কাজ হয়। হারাম কাজ যেমন আছে, হালাল কাজও আছে। যেমন, মানুষের মূল টাকা ফেরত দেওয়া। টাকা ট্রান্সফার করা। নানা বিল আদায় করা ইত্যাদি। সুতরাং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রদত্ত অর্থ যে সুদি ঋণ প্রদান বাবদ ব্যবহৃত হচ্ছে তা নিশ্চিত নয়।

এর জবাব হলো-সুদি ব্যাংকের মূল কার্যক্রম-সুদি ঋণ প্রদান করা। এর বাইরে অন্যান্য কাজগুলো প্রাসঙ্গিক; মূল নয়। সুতরাং মূল ও প্রধান কাজ-ই এখানে বিবেচ্য হবে। এ হিসাবে হারাম কাজেই এর ব্যবহার প্রবল।

- টাকা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং ব্যাংক সুদি ঋণ প্রদান করলেও আপনার টাকাই এ বাবদ প্রদান করা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়।

এর জবাব হলো-এটি ঠিক টাকার কোনো রং হয় না। এটি নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে যেখানে জানা যাবে-লোকটি সুদি লেনদেন করে, তাকে টাকা ধার দেওয়া পাপ কাজে সহযোগিতা করারই নামান্তর। (থানভী রহ.-এর বক্তব্য, প্রাগুক্ত)

- এ অ্যাকাউন্টে আপনি অর্থ জমা না করলেও ব্যাংক সুদি কাজ করবে। সুতরাং আপনার অর্থ-ই সুদি কাজে প্রধান ভূমিকা রাখছে না।

এর জবাব হলো, যদি এমনই হতো, আমি টাকা দিলে কেবল তখনই সে হারাম পন্থায় তা ব্যবহার করবে, নতুবা করবে না, তখন তা হারাম হয়ে যেতো। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে সেটি নয়, তবে সরাসরি সহযোগিতা হচ্ছে, তাই হারাম না হয়ে মাকরূহে তাহরীমী হচ্ছে। যা হারামের কাছাকাছি। অথবা মাকরূহে তানযীহীর চেয়ে কিছুটা অধিক।

---

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/১৫৯

মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বৈধ নয়। এর মাধ্যমে পাপ কাজে সহযোগিতা হয়। ফিকহি দৃষ্টিতে এটি মাকরূহে তাহরীমীর স্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অথবা অন্তত মাকরূহে তানযীহীর চেয়ে কিছুটা বেশি। (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সর্বাধিক জ্ঞাত)।

শাইখ মুফতি তাকী উসমানী হাফি. সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বৈধ বলেছেন?

এ বিষয়ে সাধারণত একটি কথা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, মুফতি তাকী উসমানী দা.বা. সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বৈধ বলেছেন। এ কথার বাস্তবতা কতটুকু?

মুফতি সাহেবের এ বিষয়ক বক্তব্যসমূহকে কয়েকটি ধাপে উল্লেখ করা হলো-

এক. যদি কারো ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়, তাহলে তার জন্য সুদি-অসুদি যেকোনও প্রকার ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করা উচিত। শাইখুল ইসলাম হাফি. রচিত গ্রন্থ “গায়রে সুদি ব্যাংকারী”[১]তে বলেন-

اور جن میں بینکوں سے معاملے کو میں جائز سمجھتا ہوں ان کے بارے میں بھی اگر کوئی مشورہ کرے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بینک سے تمویل حاصل کئے بغیر کام چلا سکتے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر آپ تمویل حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں تو سودی بینکوں کے بجائے ان سے رجوع کریں۔ (غیر سودی بینکاری، ص ۵۲)۔

দুই. যদি ব্যাংকে টাকা রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় হয় তাহলে উত্তম পন্থা হলো, ব্যাংকের লকারে রাখা। এ বিষয়ে তিনি “ফতোয়ায়ে উসমানী”[২]তে লেখেন-

"بینک میں حفاظت کی غرض سے رقم رکھوائی ہے، تو سب سے بہتر اور بے غبار صورت یہ ہے کہ لاکر میں رکھوائے"۔ اھ۔

তিন. শরীয়াহসম্মত ব্যাংক থাকা অবস্থায় সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা মাকরূহে তানযীহী। তিনি লিখেছেন-

غاية ما في الباب أن يكون هذا الإيداع مكروهاً كراهة تنزيه

সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, এভাবে সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে অর্থ রাখা মাকরূহে তানযীহী হবে।[৩]

---

১. গায়রে সুদি ব্যাংকারী : ৫২
২. ফাতোয়ায়ে উসমানী : ৩/ ২৬৮, ফতোয়া নং : ১১১১
৩. ফিকহুল বুয়ূ, : পৃ. ১০৬৩

চার. স্বীকৃত শরীয়াহসম্মত ব্যাংক না থাকলে, প্রয়োজনে সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা যাবে। তখন মাকরূহে তানযীহী থাকবে না। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর "ফিকহুল বুয়ূ" নামক জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে লিখেছেন-

"غير أن هذه الرخصة إنما يجوز العمل بها إن لم يوجد مصرف غير ربوي، فإن وجد بشكل مقبول شرعا فلاينبغي العمل بهذه الرخصة".انتهى.

অর্থ : এ অনুমোদন বা সুযোগ কেবল তখন-ই গ্রহণ করা যাবে, যেখানে অ-সুদি ব্যাংক পাওয়া যাবে না। যদি শরঈ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাংক পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে এ 'সুযোগ-মতের' উপর আমল করার অবকাশ নেই।[১]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল-হযরত স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচলিত ব্যাংকিং এর সাথে লেনদেন করাকেই নিরুৎসাহিত করেন। একান্ত টাকা রাখতে হলে সম্ভব হলে লকারে রাখতে বলেন। তা সম্ভব না হলে, স্বীকৃত শরীয়াহ্ ব্যাংকে টাকা রাখবে। শরীয়াহ্ ব্যাংক থাকাবস্থায় সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা মাকরূহে তানযীহী।

তবে শরীয়াহ্ ব্যাংক না থাকলে, তখন প্রয়োজনের কারণে সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজন থাকায় তখন মাকরূহ থাকবে না। বোঝা গেল-প্রয়োজন আছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে। শরীয়াহ্ ব্যাংক নেই বা স্বীকৃত শরীয়াহ্ ব্যাংকিং নয়-তখনও প্রয়োজন ছাড়া সুদি ব্যাংকিং-এর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা অনুমোদিত নয়।

হযরতের বক্তব্যের সাথে অন্যদের বক্তব্যের পার্থক্য

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এ মাসআলাকে 'পাপ কাজে সহযোগিতা'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাঁর মতে-সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হলে-এর মাধ্যমে পাপ কাজে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা হয় না। অর্থাৎ 'সববে কারিব' হয়ে 'মাকরূহে তাহরীমী' হয় না। জেদ্দাহ ফিক্হ একাডেমির ডিসকাশন সেশনে তিনি স্পষ্ট বলেছেন-

فقد ذكرت المبادئ الفقهية في مسألة الإعانة على المعصية وأن هذا المبدأ لا ينطبق على إيداع الأموال في الحساب الجاري.

অর্থ : 'আমি 'পাপ কাজে সহযোগিতার মাসআলা' বিষয়ে ফিকহি মূলনীতি উল্লেখ করেছি। এসব মূলনীতি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না' (পৃ.৯০০)

অপরদিকে একাডেমির উক্ত সেশনে উপস্থিত ফকীহগণের মাঝে যারাই এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই একে 'পাপ কাজে সহযোগিতা'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। পূর্বে তা উল্লেখ হয়েছে। অন্যদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তাঁদের কাছে এটি 'মাকরূহে তাহরীমী' হবে।

---

১. প্রাগুক্ত

আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে-কিভাবে তা 'পাপ কাজে সহযোগিতা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও এর বিপক্ষে নানা সন্দেহ ও এর অপনোদন করা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে-এটি মাকরূহে তাহরীমী না হলেও মাকরূহে তানযীহীর চেয়ে কিছুটা প্রবল।

উল্লেখ্য, শাইখুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ রচিত "বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ"এর একটি বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনের কারণে সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার 'কারাহাত' চলে যায়।

"ولا شك أن كثيرا من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك و يحتاج الإنسان بإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى البنوك، فالحاجة ظاهرة مشاهدة و ترتفع مثل هذه الكراهة التنزيهية بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى".انتهى.

তবে আমরা ইতিপূর্বেই তাঁর রচিত "ফিকহুল বুয়ূ" গ্রন্থের ভাষ্য থেকে উল্লেখ করেছি যে, কারাহাত তখনই যাবে যখন শরীয়াহ্সম্মত ব্যাংক না থাকবে। "বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ"-এর বক্তব্য লেখা হয়েছে ১৪১৬ হিজরীতে। আর "ফিকহুল বুয়ূ" সংকলনের সময় হচ্ছে ১৪৩৬ হিজরী। সুতরাং এক্ষেত্রে "ফিকহুল বুয়ূ"র বক্তব্য তার শেষ বক্তব্য বলেই মনে হয়।

ফলাফলের বিবেচনায়-উক্ত মতভেদ কি প্রযোজ্য হবে?

সুদি ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা-অ-সুদি ব্যাংক থাকাবস্থায়-কারও কাছেই শরীয়াহ্সম্মত নয়। এই 'শরীয়াহ্সম্মত না হওয়া'-এর অর্থ মুফতী তাকী উসমানী হাফি.-এর নিকট, সবচেয়ে বেশি হলে মাকরূহে তানযীহী। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের নিকট আরও কঠিন। তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য আমলের বিবেচনায়-আমাদের দৃষ্টিতে উভয় মতের মাঝে ভিন্নতা নেই। তবে একাডেমিক ডিসকাশন-এর বিবেচনায় পার্থক্য হতে পারে। সেটি ভিন্ন কথা।

এখন প্রশ্ন হলো-ইসলামী ব্যাংকিং থাকাবস্থায় সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা নিষেধ করা হয়েছে। হযরত তাকী সাহেব হাফি.-এর বক্তব্য হলো, بشكل مقبول شرعاً শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আমাদের দেশে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থা কি এরকম যে, তাদের শরীয়াহ্ পরিপালনের উপর আস্থা রাখা যায়? কেউ যদি বলেন, তাদের শরীয়াহ্ পরিপালনের উপর আস্থা নেই বিধায় এক্ষেত্রে সুদি-অসুদি বরাবর। তাই সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। উলামায়ে কেরামের শর্ত এখানে অনুপস্থিত। এ কথা কি সঠিক হবে?

এর উত্তর হলো, এটি ঠিক যে, আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ্ পরিপালন প্রত্যাশিত মাত্রায় নেই। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে উদাসীন। গ্রাহক সচেতনতাও কম। স্টোক হোল্ডারদের আন্তরিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রয়োজন পরিমাণ দক্ষ শরীয়াহ্ জনবলেরও সংকট আছে। শরীয়াহ্ বোর্ডসমূহের ভূমিকাও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উজ্জ্বল নয়। শরীয়াহ্ সংশ্লিষ্ট নানা ক্রটি-বিচ্যুতি প্রায়শই হয়ে থাকে। পণ্য বিক্রয় না করেও, হস্তগত না করেও বহু মুরাবাহা লেনদেন হচ্ছে।

এসব বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে এর পাশাপাশি আরও কিছু বাস্তবতা আছে। তা হলো, কিছু আপসহীন আলেম আছেন, যারা শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিত করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর হার দিন দিন বাড়ছে। কমছে না। আগের চেয়ে শরীয়াহ্ পরিপালনের সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে। সেটি রেগুলেটরি পর্যায় থেকে সকল পর্যায়ে কম-বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। ব্যাংকিং জনবলও ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে। এসব ইতিবাচক ফলাফলের একটি দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত হলো-ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রতি বছর মোটা অঙ্কের অর্থ ডাউটফুল আয় হিসাবে সিএসআর ফান্ডে দান করে থাকে। এটি অন্যান্য সনাতনী ব্যাংকে অনুশীলিত নয়।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক ও সুদি ব্যাংককে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। তাই أصل دفع الشر الأعظم من الشرين এর ও أهون البليتين অনুযায়ী সুদি ব্যাংকিংকে প্রমোট করা হয়-এমন যেকোনো পদক্ষেপ সমর্থিত নয়। সে আলোকে সুদি ব্যাংকিং-এ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা অনুমোদিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে শাইখ সুলাইমান ইবনে মানি' হাফি.-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এক নজরে সুদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে শরীয়াহ্ গাইডলাইন

প্রয়োজন ছাড়া প্রচলিত যেকোনো ব্যাংক-এ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বা কোনো লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। একান্ত প্রয়োজন হলে সুদি ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না; বরং ইসলামী এমন কোনো ব্যাংক নির্বাচন করতে হবে, যাদের শরীয়াহ্ পরিপালন তুলনামূলক ভালো। শরীয়াহ্ পরিপালন যাচাই করার সহজ কিছু মাধ্যম হলো-

ক. শরীয়াহ্ বোর্ডে বিজ্ঞ আলিমদের উপস্থিতি আছে কি না যাচাই করা।
খ. ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের শরীয়াহ্ পরিপালনে আন্তরিকতা ও অনুশীলন যথাসম্ভব যাচাই করা।
গ. ব্যাংকিং বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আলিমগণের পরামর্শ গ্রহণ করা।[১]

---

১. কারেন্ট একাউন্ট বিষয়ক উক্ত লেখা উস্তাযে মুহতারাম মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম হাফি.-এর গবেষণা থেকে গৃহীত। আল্লাহ পাক হযরতকে নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

সুদের টাকা কি জনকল্যাণমূলক কাজেও দেওয়া যাবে?

সুদ বা সকল প্রকার হারাম মালের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্‌র আদেশ হচ্ছে, সদকা করে দেওয়া। এ কারণে অনেক আলেম মনে করেন যে, সুদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। দলিল হিসাবে তারা বলেন,

হারাম মালের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে যেসকল বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে তাতে تصدق به অথবা وجب عليه التصدق অথবা تصدق على الفقراء والمساكين এসেছে। অর্থাৎ সদকা বা গরীব-মিসকীনদের ওপর সদকা করার কথা রয়েছে। কোথাও ওয়াক্‌ফ বা জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করার কথা উল্লেখ নেই।

'সদকা' বা 'তাসাদ্দাকা' শব্দদ্বয় যখন মুতলাক (Absolute) ব্যবহার হয় তখন ফুকাহায়ে কেরামদের রীতি অনুযায়ী তা 'ওয়াজিবুত তামলীক' বা অত্যাবশ্যকরূপে একজনকে উক্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া বুঝায়। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম আবু বকর আল জাসসাস রহ. লিখেছেন-

قوله: وفي الرقاب وعتق الرقبة، لا يسمى صدقة وما أعطي في ثمن الرقبة فليس بصدقة... وأيضا فإن الصدقة تقتضي تمليكا والعبد لم يملك شيئا بالعتق... شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه.

অর্থাৎ, সদকা 'তামলীক' বা মালিক বানিয়ে দেওয়াকে দাবি করে থাকে। (অন্যত্র বলেন) সদকার শর্ত হলো, সদকাকৃত বস্তুটি সদকাগ্রহীতার মালিকানায় প্রবেশ করা।[১]

হেদায়ার প্রখ্যাত ভাষ্যকার ফকীহ ইমাম ইবনে হুমাম রহ. লিখেছেন-

(قوله لانعدام التمليك وهو الركن) فإن الله تعالى سماها صدقة، وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير، وهذا في البناء ظاهر وكذا في التكفين لأنه ليس تمليكا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে সদকা বলেছেন, আর সদকার হাকিকত (Real meaning) হলো, ফকীরকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর কোনো জনকল্যাণমূলক নির্মাণ প্রকল্প, কারো দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে 'মালিক বানিয়ে দেওয়া' বিষয়টি অনুপস্থিত। বিধায় এগুলোতে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়।[২]

---

১. আল-জাসসাস, আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্‌সাস আর-রাযী, মৃত্যু : ৩৭০, আহকামুল কুরআন, ক্বদীমি কুতুবখানা, করাচি : খ. ৩ পৃ. ১৮৩

২. ইমাম ইবনে হুমাম, কামাল উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ : মৃত্যু : ৮৬১ হি., ফাতহুল কাদীর, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ : খ. ২ পৃ. ২৭২

এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, 'সদকা' শব্দটি যখন মুতলাক তথা সাধারণভাবে ব্যবহার হবে তখন তা 'তামলীক' বা মালিক বানিয়ে দেওয়ার অর্থে বুঝাবে।

হারাম মালের যখন মালিক পাওয়া না যাবে তখন তা লুকতা তথা কুঁড়িয়ে পাওয়া সম্পদের মত হবে। অর্থাৎ মালিক পাওয়া না গেলে বা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হলে ফকিরকে দান দিতে হবে। সুতরাং জনকল্যাণমূলক ফান্ডে দান করা যাবে না।[১]

সারকথা : তাদের মতে সুদের টাকা ফকীর-মিসকীনকেই দান করতে হবে। জনকল্যাণমূলক বা যে সকল ক্ষেত্রে 'মালিক বানানো' সম্ভব নয়, সেখানে সুদের টাকা ব্যয় করা বৈধ নয়।

এ মতের প্রবক্তা হলেন, মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী রহ.,[২] হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানভী শহীদ রহ.,[৩] মুফতী শফী রহ.,[৪] মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.,[৫] সহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আর কোনো কোনো আলেমের মতে হারাম মাল দান করার সময় দানগ্রহীতাকে উক্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। সুতরাং দানগ্রহীতা যদি কোনো ব্যক্তি না হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান হয় এরপরও তাতে দান করা যাবে। অতএব তাদের নিকট জনকল্যাণমূলক ফান্ডে সুদের টাকা দেওয়া যাবে।

তাদের যুক্তি হলো, হারাম মালের 'ওয়াজিবুত তামলীক' বা 'কাউকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে'এ বিষয়টি কোন ফুকাহায়ে কেরাম থেকে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। যারা মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করেন তারা 'তাসাদ্দাকা' বা 'ওয়াজাবা আলাইহিত তাসাদ্দুক' বা এ জাতীয় বর্ণনা দলিল হিসাবে পেশ করে থাকেন। যেহেতু সদকা সাধারণত 'তামলীক' হয়ে থাকে। তাই হারাম মালকেও ওয়াজিবুত তামলীক মনে করা হয়েছে। অথচ নফল সদকার ক্ষেত্রেও 'সদকা' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। সেখানে তো কেউ 'তামলীক' উদ্দেশ্য নেয় না। নফল সদকা যেকোনো খাতে ব্যয় করা যায়। যেমন, হাদীসে এসেছে-

---

১. মুহাম্মাদ শফী ইবনে ইয়াসিন আদ্ দেওবন্দী আল-উসমানী (১৩৯৬হি./১৯৭৬ইং), জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ইশবায়ূল কালাম ফি মাছরাফিস সাদকা মিনাল মালিল হারাম, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, খ.৩ পৃ.৩২৫-৩২৯

২. মুফতী আযীযুর রহমান, মৃত্যু : ১৩৪৭হি./১৯২৮ইং ফতোওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, মাকতাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ : খ. ১৪ পৃ. ৪৭

৩. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানভী শহীদ রহ., আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ : খ. ৭ পৃ. ৩৪৭

৪. মুহাম্মাদ শফী ইবনে ইয়াসিন আদ্ দেওবন্দী আল-উসমানী (১৩৯৬হি./১৯৭৬ইং), জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ইশবায়ূল কালাম ফি মাছরাফিস সাদকা মিনাল মালিল হারাম, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, খ.৩ পৃ.৩২৫

৫. জাদীদ ফিক্হী মাবাহেস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদি লেনদেন, ইদারাতুল কুরআন, করাচি : খ, ২ পৃ, ৩৩৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه.

অর্থাৎ, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার তিনটি আমল ছাড়া বাকী সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. উপকারী ইল্‌ম, তিন. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।[১]

এ হাদীসে 'সদকা' শব্দের প্রয়োগ হলেও তা 'তামলীক বুঝায়নি। বুঝা গেল 'তামলীক' ছাড়াও সদকা হতে পারে।

তদ্রূপ ওয়াকফের মাঝেও সদকা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।[২] যেখানে 'তামলীক' শর্ত নয়।

হানাফী মাযহাবের ইমামদের বক্তব্য থেকেও এ কথা বুঝে আসে, যে সকল হারাম মাল দান করা ওয়াজিব তার ব্যয়ের খাত সর্ব দিক থেকে যাকাতের মত নয়; বরং বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। যেমন,

ক. যাকাত নিজের মা-বাবা, স্ত্রীকে দেওয়া যায় না। কিন্তু হারাম মাল গ্রহীতা নিজের মা-বাবাকে দান করতে পারে।

খ. যাকাত বনী হাশেম গোত্রের লোকদের দেওয়া যায় না। কিন্তু হারাম মাল থেকে (কারো কারো মতে) দেওয়া যায়।

গ. যাকাত যিম্মিদের দেওয়া যায় না। কিন্তু হারাম মাল তাদেরকে দেওয়া যায়।

হারাম মালের ব্যয়খাত অনেকে লুকতা বা কুঁড়িয়ে পাওয়া সম্পদের মত মনে করেন। আর লুকতার মাল কারো কারো মতে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা যায়।[৩]

হারাম মালের ব্যয়খাত শুধু ফকীর-মিসকীনের বিশেষায়িত হওয়ার বিষয়টি কেবল হানাফি মাযহাবের ইমামদের নিকট। অন্য ইমামদের নিকট মুসলমানদের কল্যাণার্থে ব্যয় হতে পারে।[৪]

---

১. সহীহ মুসলীম : ১৬৩১; ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইশী আন্‌-নাইসাবুরী রহ., মৃত্যু : ২৬১ হি., সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়্যত, বাবু মা ইউলহাকুল ইনসানু মিনাছ ছওয়াবি, মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা : হাদিস নং : ১৬৩১ খ. ২, পৃ. ৪১

২. বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, (২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.) আল-জামিউস সহীহ (সহীহ বুখারী), কিতাবুল ওয়াকফ, বাবুশ শুরুত ফিল ওয়াকফি, মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা : নং-২৬৫৬, খ.২ পৃ.৩৮২, সহীহ মুসলিম : নং-১৬৩২ খ.২ পৃ.৪১

৩. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদীন আশ্‌-শামী, মুহাম্মাদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয, মৃত্যু : ১২৫২ হি./১৮৩৬ ইং, এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচি, খ. ২, পৃ. ৩৩৮

৪. কারাফী, শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে ইদরিস আল-মালিকী, মৃত্যু : ৬৮৪হি., আয্‌-যখীরা, কিতাবুল কিরায, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, নববী, মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়্যা আন্‌-নববী, মৃত্যু : ৬৭৬ হি., আল-মাজমূ', দারুল হাদীস, কায়রো, প্রকাশকাল-২০১০ইং, খ. ১০ পৃ.৫২০-৫২১, আল মারদাবী, আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান, মৃত্যু : ৮৮৫হি., আল-ইনসাফ, দারু ইয়াহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, খ. ১১ : পৃ. ২১৩

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা হারাম মালের ব্যয়খাতে 'তামলীক' শর্ত না হওয়া উচিত বলে মনে হয়। কেননা, এসকল মাল মূল মালিকের পক্ষ থেকে মূলত নফল সদকা করা হয়। আর নফল সদকার খাতে 'তামলীক' শর্ত নয়।[১]

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফি. বলেন, হারাম মালের মূল উদ্দেশ্য হলো, সদকা করার মাধ্যমে মূল মালিককে সওয়াব পৌঁছানো। 'তামলীক' বা 'মালিক বানানো' শর্ত করা আমার কাছে বোধগম্য নয়।[২]

সারকথা : যেহেতু তাদের নিকট হারাম মালের দানের ক্ষেত্রে 'তামলীক' বা মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। সুতরাং তাদের নিকট সুদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।

এ মতের প্রবক্তা হলেন, মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ.,[৩] মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ., মুফতী সাঈদ আহমদ সাহারানপুরী রহ. (মুআল্লিমুল হুজ্জাজের লেখক), শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.,[৪] মুফতী রফী উসমানী রহ.,[৫] মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ[৬] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আন্তর্জাতিক ফিক্হ ফোরামের সিদ্ধান্ত

১৯৮৯ সালের ৮-১১ ডিসেম্বর ইসলামী ফিকাহ একাডেমি ইন্ডিয়ার একটি আন্তর্জাতিক ফিকহি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ব্যাংকিং সুদ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে- ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা মসজিদ ও তার সংশ্লিষ্ট কাজে খরচ করা যাবে না এবং এ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ স্কলারের মত হলো, ব্যাংকের সুদ 'সদকায়ে ওয়াজিবাহ' বা ওয়াজিব সদকাসমূহের খাত ছাড়াও জনকল্যাণমূলক কাজে দান করা যাবে।[৭]

'উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান দেওয়া বেশ কঠিন। তবে এ বিষয়ে আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ.-এর কথাটা ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি বলেন, এ বিষয়টি যেহেতু মতানৈক্যপূর্ণ, তাই

---

১. শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী, ফতোয়ায়ে উসমানী, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, খ. ৩, পৃ. ১৩০-১৪০
২. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৯
৩. মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ. (১৩২১ হি.), ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ : খ. ৯, পৃ,২৬৩
৪. জাদীদ ফিক্হী মাবাহেস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদি লেনদেন, দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম এডিশন-২০১৭ইং, খ. ১০ পৃ. ৭৮৪
৫. শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী, ফতোয়ায়ে উসমানী, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, খ. ৩ পৃ. ১৪০
৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৯
৭. জাদীদ ফিক্হী মাবাহেস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদি লেনদেন, দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম এডিশন-২০১৭ইং, খ. ১০ পৃ. ৭৮০

এভাবে বলা যায়, জনকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা যাবে, তবে গরীব-মিসকিনরে দেওয়া উত্তম।[১]

সুদ দান করে দেওয়ার নিয়তে সুদি অ্যাকাউন্ট খোলা

কেউ কেউ বলেন, অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা নিজস্ব প্রয়োজনে খরচ না করে গরীর-দুঃখীদের মাঝে দান করে দিবেন। নিজে সুদ খাবেন না। তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। এটিও ভুল পন্থা।

প্রথমত, মুনাফা লাভের আশায় ব্যাংকে টাকা রাখার মাধ্যমে সুদি লেনদেনে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। যদিও ওই মুনাফা নিজে ব্যবহার না করে কোনো ভালো কাজে খরচ করার নিয়ত করা হয়। আর সুদি লেনদেনে লিপ্ত হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুদের অর্থ কোনো ভালো কাজে দান করার পরামর্শ বা নির্দেশ তখনই কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে, যে মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দরুন শরীয়াহ্ নিষিদ্ধ লেনদেন সম্পাদন করে ফেলেছে। যার ফলে সে সুদের টাকা প্রাপ্ত হয়েছে অথবা এমন ব্যক্তিকে এ জাতীয় পরামর্শ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি ব্যবসা বা অর্থনীতি সংক্রান্ত লেনদেনে এখন পর্যন্ত শরীয়াহ্র বিধানের অনুকরণ করেনি। যার ফলে তার কাছে সুদের টাকা এসে গেছে। এখন সে নিজের কাজে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে চাচ্ছে এবং সুদের টাকা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করছে। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া হবে যে, তুমি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এই টাকা কোনো ভালো কাজে সদকা করে দাও। কিন্তু যে শরীয়াহ্র বিধানাবলী মেনে চলে। সে যদি সুদি ব্যাংকে নিজের টাকা এ নিয়তে রাখে যে, সুদ যা আসবে তা ভালো কাজে দান করে দিবো। তাহলে তার উদাহরণ হবে ওই ব্যক্তির মতো, যে এই নিয়তে গুনাহের কাজে লিপ্ত হলো যে, পরবর্তীতে তাওবা করে ফেলবে। অথচ একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো, সে এমন কোনো কাজ বা গুনাহে লিপ্তই হবে না, যার কারণে তাওবা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।[২]

অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সুদের বিধান

মাসআলা না জানা থাকার কারণে সুদি ব্যাংকে কেউ অ্যাকাউন্ট করেছিল। এখন সে বের হয়ে আসতে চায়। এদিকে ইতোমধ্যে তার অ্যাকাউন্টে সুদ জমা হয়ে গেছে। এই সুদ কী করবে? এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা-

ক. ব্যাংক থেকে কেবল মূল টাকা উত্তোলন করবে। সুদ তুলবে না। ওখানেই রেখে দিবে। এ মতের প্রবক্তাদের যুক্তি হলো,

---

১. ফতওয়ায়ে রহিমিয়া, খ. ৯, পৃ. ২৭৯, দারুল ইশাআত করাচি

২. ফিক্বহী মাকালাত, ব্যাংক ডিপোজিট কে শরয়ী আহকাম, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, ৩/২১-২২

➤ সুদ তুলে নিলে তো সুদ হস্তগত করা হবে। আর সুদ হস্তগত করা গুনাহ। সুতরাং গুনাহ করে সুদ সদকা করে দেওয়ার তুলনায় গুনাতে না জড়ানোই ভালো।[১]

➤ উক্ত টাকা হাতে এলে খরচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

➤ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সুদের যে অংশ-ই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও।[২] উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুদ ছেড়ে দিতে বলেছেন। তাই সুদ নেওয়া যাবে না। ব্যাংকেই থেকে যাবে।

যুক্তি খণ্ডন

ক. অ্যাকাউন্টে সুদ জমা হওয়ার অর্থই হলো সুদ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের হস্তগত হওয়া। কারণ ওই টাকা ব্যাংকের মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। এখন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার উক্ত টাকা যা খুশি তা করতে পারবে। বাস্তবে হস্তগত হওয়া আর অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানা স্থানান্তর হয়ে যায়। হস্তগত যেহেতু প্রমাণিত হলো, এখন পথ দুটি। হয় সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিবে। নতুবা নাপাকী থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য গরিব কোনো লোককে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় পন্থাটিই অগ্রগণ্য।[৩] আল কুরআনের আয়াতের মর্ম হলো, সুদ যখন হস্তগত হয়নি। তখন সুদ না নিয়ে ছেড়ে দিবে। আর আমাদের এখানে সুদ হস্তগত হয়ে গেছে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা দলিল দেওয়া শুদ্ধ নয়।

খ. অমুসলিম দেশের সুদি ব্যাংকে সুদ জমা হলে তা নিতে পারবে। এ মতের যুক্তি হলো, অমুসলিম রাষ্ট্র এই টাকা মুসলমানদের বিপক্ষে খরচ করবে।[৪]

গ. অ্যাকাউন্টে আসার কারণে যেহেতু উক্ত সুদের টাকা হস্তগত হয়েই গেছে। এখন তা থেকে নিষ্কৃতির পথ একটিই। আর তা হলো, সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে। ব্যাংকে রেখে দিবে না। এ মতের পক্ষে যুক্তি হলো,

➤ সুদ যেহেতু হস্তগত হয়েই গেছে। এখন তার ওপর জরুরি হলো, মূল মালিককে উক্ত টাকা ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু এখানে মূল মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, মালিক তো অগণিত লোনগ্রহীতা। যারা লোন নিয়ে ব্যাংককে সুদ দিয়েছে। অতএব এটি মালে লুকতা তথা হারানো বস্তুর পর্যায়ভুক্ত। আর এর বিধান হলো, মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলে কোন গরিব লোককে মূল মালিকের পক্ষ থেকে দান করে দিবে। সুতরাং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তা সদকা করে দিবে। কারণ রেখে দিলে এক সময় তা Unclaim a/c হয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংকে জমা হয়ে যেতে পারে। এরপর এ টাকা

---

১. ফতোয়ায়ে উসমানী, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ৩/২৬৮
২. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮
৩. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ৭/৩৪৬
৪. এ মতের যথার্থতা ও খণ্ডন সামনে ভিন্ন শিরোনামে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

কোথায় ব্যয় হবে তা অনিশ্চিত। হতে পারে, খোদ ব্যাংকই তা ব্যবহার করবে।

- ব্যাংকে রিটার্ন করার সুযোগ নেই। কারণ, তা ব্যাংকের মালিকানা থেকে বের হয়ে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানায় চলে এসেছে।

অগ্রগণ্য মতামত

শেষোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য। এটিই বর্তমানে অধিকাংশ ফকীহের মতামত। শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফি. লিখেছেন, 'এ মাসআলায় পূর্বে আমি ব্যাংক থেকে সুদ না উঠানোর কথা বলে থাকতাম। কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কোনো আলেম বিশেষ করে মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রহ. আমাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিলে তা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হলো যে, ব্যাংকের সুদ উঠিয়ে তা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিবে। বিশেষ করে অনেক আলেমদের অবস্থান বর্তমানে এই ফতোয়ার ওপর।[১]

মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ. লিখেছেন, ব্যাংক থেকে যে সুদ পাওয়া যায় নিয়মানুযায়ী তা গ্রহণ না করা উচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে মুফতিগণ এই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ব্যাংকের সুদ গ্রহণ করা জরুরি। আর বর্তমানে এই ফতোয়া থেকে সরে আসার কোনো কারণ নেই। এই কারণে সকল মুফতিগণ এমত পোষণ করেন যে, উক্ত সুদ উত্তোলন করে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো গরিব ব্যক্তিকে দান করে দিবে।[২]

ইন্ডিয়া ফিক্‌হ একাডেমির সিদ্ধান্ত ১৯৮৯ সালের ৮-১১ ডিসেম্বর ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি ইন্ডিয়ার একটি আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ব্যাংকিং সুদ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে- ব্যাংকের সুদ ব্যাংকে ফেলে রাখবে না; বরং উঠিয়ে দান করে দিবে।[৩]

সুদের টাকা দান করার সময় নিয়ত কী হবে?

সাধারণত যেকোনো দানের ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়ত থাকে। কিন্তু সুদ দানের ক্ষেত্রে এই নিয়ত করা যায় না। কারণ,

প্রথমত, এটি মূলত নিজের সদকা নয়। তাই সদকা করার সময় মূল মালিকের পক্ষ থেকে সদকার নিয়ত করবে। নিজের পক্ষ থেকে নয়। কারণ, এ অর্থ মূলত তার না। যে ব্যাংকে সুদ দিয়েছে তার। সুতরাং এটি তার সুদের গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি লাভ। বিধায় মূল মালিকের পক্ষ থেকে দান করার নিয়ত করে নিজে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, এটি মূলত পাপ ও ময়লা থেকে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যম। দান করে সওয়াব কামানো এখানে মুখ্য নয়। হ্যাঁ, এটি ভিন্ন কথা যে, শরীয়াহ্‌র এই বিধান পরিপালনের

---

১. ফতোয়ায়ে উসমানী, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ : ৩/২৬৮
২. জাদীদ ফিক্‌হী মাবাহিস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদি লেনদেন : ২/৩৩৯
৩. জাদীদ ফিক্‌হী মাবাহিস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদি লেনদেন : ২/৫৭২

কারণে বান্দা সওয়াব পাবে। ইন্ডিয়া ফিক্হ একাডেমির সিদ্ধান্তেও বলা হয়েছে, "তুলে এনে ফকীর-মিসকীনকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে"।[১]

অমুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাংকের সুদ গ্রহণ

অমুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাংক থেকেও সুদ গ্রহণ নাজায়েয। আকাবীরে দেওবন্দের অধিকাংশ উক্ত মত পোষণ করেছেন। শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফি. বলেন, 'মুসলমান ও কাফেরের লেনদেনের মাঝে সুদ হয় না' এ কথা গ্রহণযোগ্য না।[২] তবে সুদ জমা হয়ে গেলে অমুসলিমদের ব্যাংকে রেখে দিবে না; বরং তুলে এনে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে।[৩]

সরকারি ট্যাক্সবাবদ সুদি অর্থ প্রদান

সুদের টাকা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স বা ন্যায়সংগত ট্যাক্স দেওয়া জায়েয নয়। কেননা সুদের টাকা দিয়ে কোন ধরনের উপকার ভোগ করা বৈধ নয়। আর ট্যাক্স দেওয়ার দ্বারা ট্যাক্সদাতা উপকৃত হচ্ছে, নিজেও এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করছে। অতএব তা জায়েয হবে না।[৪]

গরিব ব্যক্তি কি সুদ খেতে পারবে?

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কারো যদি সুদি ব্যাংকে সুদ জমা হয় তাহলে তার ক্ষেত্রেও একই বিধান যে, সে ওই টাকা অন্য যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে সদকা করতে হবে। নিজে গরিব বলে খেতে পারবে না। কারণ, এর উদ্দেশ্য হলো, নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ত করা। অবশ্য একান্ত অপারগতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে নিজে গ্রহণ করতে পারবে।[৫]

সুদ দিয়ে ঘুস প্রদান

এটি বৈধ নয়; বরং দ্বিগুণ গুনাহ। সুদ গ্রহণ ও ঘুস প্রদান করার। সুদের অর্থ যেহেতু হারাম তাই তা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে। কোনোভাবেই নিজে উপকৃত হওয়া যাবে না।[৬]

সুদের টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করা

ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা মাদরাসার বাথরুম নির্মাণে ব্যবহার জায়েয আছে। তবে মসজিদের বাথরুম নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি না, এ বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ.-এর ফতোয়া হলো, সুদের টাকা মসজিদে ব্যয় করা যাবে না (সেটা

---

১. জাদীদ ফিক্হী মাবাহিস : ২/৫৭২
২.ফতোয়ায়ে উসমানী, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ : ৩/২৬৯
৩. ফিকহি মাকালাত : ১/২৭৯-২৮০
৪. ফাতওয়া জামেয়া ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন, ফাতওয়া নং: ১৪৪২০২২০০৩২৫
৫. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল : ৭/৩৪৬
৬. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল : ৭/৩৪৭

মসজিদের জমাকৃত টাকা থেকে হোক বা অন্য কারো টাকা থেকে)। বরং এর খাত হচ্ছে, ফকীর ও মিসকিন।[১] অপরদিকে মুফতি সাঈদ আহমদ রহ. (মুফতি, মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুর- এর মত ছিলো, মসজিদের বাথরুমে তা ব্যয় করা যাবে।[২] আর আবদুর রহীম লাজপুরী রহ.-এর অভিমতও হলো, এটা মসজিদের অন্যান্য কাজে ব্যয় করা না গেলেও মসজিদের বাথরুমের কাজে ব্যয় করা যাবে।[৩]

ফিক্হ একাডেমি ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত হলো, সুদের টাকা মসজিদ-সংশ্লিষ্ট কিছুতে ব্যয় করা যাবে না।[৪] এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। কারণ মসজিদ ও মসজিদ-সংশ্লিষ্ট কাজে হালাল টাকা ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া বাথরুম শুধু দরিদ্র মুসল্লিরাই ব্যবহার করে না, বিত্তবানরাও ব্যবহার করে।[৫]

সুদের টাকা খরচ করে ফেললে করণীয়

প্রাপ্ত সুদের টাকার মালিক জানা থাকলে যথাসম্ভব তার কাছে বা সে মারা গেলে তার ওয়ারিশদের নিকট তা পৌঁছে দিবে। পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব হলে তা মূল মালিকের পক্ষ থেকে দান করে দিবে। আর হারাম মাল ভোগ করার মতো গর্হিত কাজ করে ফেলার কারণে কায়মনোবাক্যে তওবা-ইস্তেগফার জারী রাখবে। ভবিষ্যতে যেন এমন কাজ না হয়, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।[৬]

ব্যাংকের মনোগ্রামে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখার বিধান

যেহেতু ব্যাংক সুদি কারবার করে থাকে। তাই হারাম কাজের শুরুতে এই পবিত্র কালিমা লিখা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। এটি ইসলামের সাথে চরম ধৃষ্টতা হিসাবে পরিগণিত হবে।[৭]

সুদি ব্যাংকে চাকরি করা

সুদি ব্যাংকে শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে দু' ধরনের চাকরি রয়েছে। যথা-

১. সরাসরি সুদের সাথে সম্পৃক্ত চাকরি। এটি নাজায়েয। হাদীসে এসেছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَيْهِ.

---

১. কিফায়াতুল মুফতী : ১১/২২৮
২. ফাতওয়ায়ে রহিমিয়া : ৯/২৫৮
৩. ফাতওয়ায়ে রহিমিয়া : ৯/২৭৯
৪.জাদীদ ফিক্হী মাবাহিস : ২/৫৭২,
৫. মাসিক আল কাউসার, প্রশ্ন নং : ৪৮৫৩
৬. প্রাগুক্ত
৭. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল : ৭/৩১৮

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ প্রদানকারী, সুদের সাক্ষীদ্বয় ও সুদের লেখকদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন।'[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন-

آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ، وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায়- সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, জেনেশুনে সুদি বিষয়ে স্বাক্ষীদ্বয়... কিয়ামতের দিন অভিশপ্ত।[২]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক, সুদের সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, এখানে সবাই সমান গুনাহের অংশীদার।[৩]

২. সরাসরি সুদের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন চাকরী। যেমন, দারোয়ানির চাকরি, ড্রাইভিং করা ইত্যাদি। এমন চাকরি জায়েয হলেও তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু কেউ যদি এ ধরনের চাকরি করে, তাহলে তার প্রাপ্ত বেতন হারাম হবে কি না-এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

মুফতি তাকী উসমানী হাফি. এর মতে, এ ধরনের চাকরির বেতন হারাম হবে না। কারণ ব্যাংকে চার ধরনের টাকা থাকে। যথা:

১. মূল পুঁজি
২. ডিপোজিটরদের টাকা
৩. বৈধ সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত ইনকাম

---

১. সুনানে তিরমিযী : ১২০৬; হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন-

حديث عبدالله حديث حسن صحيح

২. মুসনাদে আহমদ, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালা : নং-৪০৯০, খ. ৭, পৃ. ১৬৭। মুহাক্কিক শুয়াইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له ورواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن الحارث الأعور عن ابن مسعود رضي الله عنه

৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ', বাবুর রিবা : নং-১৫৯৮, খ. ২, পৃ. ২৭

৪. সুদ হিসেবে প্রাপ্ত ইনকাম। উক্ত চার প্রকার টাকার মধ্যে কেবল চতুর্থটি হারাম। বাকিগুলো বৈধ। এটা জানা কথা যে, টাকা আলাদা করে রাখা হয় না; বরং মিশ্রিত থাকে, তাই সমুদয় অর্থের মাঝে হালালের অংশই অধিক। এজন্য বেতন গ্রহণ হারাম হবে না।[১]

অপরদিকে মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ, ফতোয়া দিয়েছেন, এধরনের চাকরি বৈধ নয়। প্রাপ্ত বেতন হারাম হবে। কারণ, বেতন হলো ব্যাংকের ব্যয়। আর ব্যাংক তার ব্যয় নির্বাহ করে আয় থেকে। আর ব্যাংকের আয়ের প্রধান মাধ্যম হলো সুদ। সুতরাং সুদ থেকে প্রাপ্ত বেতন হারাম হবে।[২]

দ্বিতীয় মতটি অ্যাকাউন্টিং নীতির দিক থেকে সমর্থিত। কারণ, সেলারিকে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। আর সকল ব্যয় বাদ দিয়েই প্রফিট হিসাব করা হয়। এটাই সাধারণ নিয়ম। ব্যয় কখনো মূল পুঁজি বা ডিপজিটরদের টাকা থেকে নির্বাহ করা হয় না। এমনটি হলে তো ব্যাংক ব্যবসাই করতে পারবে না। আর ব্যাংকের প্রফিটের মূল অংশ সুদ ভিত্তিক আয়। এর তুলনায় অন্যান্য চার্জ গৌণ।

মোটকথা, ব্যাংকে দ্বিতীয় প্রকারের চাকরির বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। দালিলিক বিবেচনায় আমাদের কাছে দ্বিতীয় মতামত অগ্যগণ্য। তবে যেহেতু ভিন্ন মতও আছে, সে মতামতকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। তাই এ ধরনের চাকরি থেকেও যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞ মুফতি সাহেবদের সাথে মশওয়ারা করে নেওয়া জরুরি।

সুদি ব্যাংকের চাকরি ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তির করণীয়

হারাম বিষতুল্য। অতএব সুদের ভয়াবহতা উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথে বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে দরিদ্রতার ভয়কে প্রাধান্য দিবে না; বরং কুরআনের ঘোষণাটি মনে রাখবে- আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তাঁর কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।[৩]

কোনো কারণে উপস্থিত বের হওয়া সম্ভব না হলে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবে। তা হলো-

ক. হালাল উপার্জনের তালাশ ও চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।
খ. হালাল চাকরির জন্য কায়মনোবাক্যে দুআ জারী রাখবে।

---

১. ফাতওয়ায়ে উসমানী, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, কুতুবখানা নাঈমিয়া দেওবন্দ
২. আহসানুল ফাতওয়া, খ. ৭ পৃ. ২১, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ
৩. সূরা তালাক, আয়াত : ২-৩

গ. 'নিজে হারাম কাজে লিপ্ত' এই কথা বারবার স্মরণ করবে। বারবার আল্লাহ তাআলার কাছে এ চাকরি থেকে বের হওয়ার জন্য তাওফীক কামনা করবে। এতে বের হওয়া সহজ হবে। হালাল রিযিক মিলবে।

ঘ. হারাম বেতন ঘরে খরচ করবে না। বরং কোনো অমুসলিম থেকে ঋণ নিয়ে চলবে। ঋণ শোধ করবে ওই সেলারি থেকে। যদি অমুসলিম করজ দাতা না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম দুটি করা ছাড়া আর কিইবা করার আছে।[১]

উল্লেখ্য, এটি মৌলিক মাসআলা নয়; বরং অপারগতার মাসআলা। মনে রাখবেন, এ মাসআলায় সুদ হালাল হয়ে যায়নি। উলামায়ে কেরাম এটা ফতোয়া হিসাবে নয়; বরং মশওয়ারা হিসাবে বলে থাকেন। কারণ, তাঁরা ভয় পান, এখনই চাকরি ছাড়লে হয়তোবা ঈমান ও আমল কিংবা আরো বড়ো কোনো হুমকির সম্মুখীন হতে হবে।

মাওলানা মায়মূন যায়েদ (শিক্ষাবর্ষ: ১৪৩৬-৩৭ হি.)

তোফায়েল আহমদ আম্মার (শিক্ষাবর্ষ: ১৪৪৩-৪৪ হি.)

১. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ৭/৩৫৮

হাদীস বিশারদগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাও যে জায়েয তা বুঝানোর জন্য।[১]

২. বসার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা অর্থাৎ পান করার স্থানটি ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে হওয়ার কারণে তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

৩. ভিড়ের কারণে।[২]

উল্লেখিত প্রথম কারণের ভিত্তিতে কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিস যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাকে জায়েয বলেছেন।[৩] আর সাধারণ অবস্থায় পানি পান করার আদব হলো বসে পান করা।[৪] তাই অন্যান্য কারণের প্রতি লক্ষ করে কিছু ফকিহ বসে পান করার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, কিছু মানুষ যমযমের পানি পান করার সময় বসা থেকে দাঁড়িয়ে যান, যা কোনো ফকীহ ও মুহাদ্দিস উল্লেখ করেননি।

পানাহারের আদবসমূহ

১. অবশ্যই খাদ্য ও পানীয় হালাল হতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّها النّاسُ، إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلّا طَيِّبًا، وإنَّ اللهَ أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِما أمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوا صالِحًا، إنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون ٥١] وقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِيَ بِالحَرامِ، فَأنّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ؟

---

১. ফতহুল বারী : ৩/৬২৯

২. মিরকাতুল মাফাতীহ : ৮/১৬৪

৩. আল-মুহীতুল বুরহানী : ১/১৭৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ১/২৫; শরহুল মুনইয়াহ : ৩৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক : ১/৪৪; ফতহুল বারী ৩/৬২৯; মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/১৬৪; রদ্দুল মুহতার ১/১২৯; মাজমাউল আনহুর ১/১৭, ইবরাহীম হালাবী রাহ. (শরহুল মুনইয়াহ ৩৬)। আরো দেখুন, মোল্লা আলী কারী রাহ. কৃত 'শরহুশ শামায়েল' : ১/২৫০; আলাউদ্দিন হাসকাফি রাহ. কৃত 'আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৯; সহ প্রমুখ ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণের লিখনী

৪. আলমুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা : ৮/২৩৮, গিযায়ুল আলবাব শরহু মানযুমাতিল আদাব : ২/১৪১, শরহু মুসলিম লিন নববী : ১৩/১৯৫

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقالُوا: ما عِنْدَنا إلّا خَلٌّ، فَدَعا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، ويَقُولُ: نِعْمَ الأُدُمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ.

অর্থ : একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গৃহের লোকদের নিকট (রুটি খাওয়ার জন্য) তরকারী চাইলেন। ঘর থেকে জানানো হলো, তরকারি হিসেবে সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটাই পেশ করো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকা দিয়ে রুটি খাচ্ছিলেন, আর বলছিলেন সিরকা তো অনেক ভালো তরকারী, সিরকা তো অনেক ভালো তরকারী।[১]

২২. পেটকে তিনভাগ করে খাবার খাওয়া। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ما مَلأَ آدَمِيٌّ وِعاءً شَرًّا مِن بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كانَ لَا مَحالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ وثُلُثٌ لِشَرابِهِ وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

অর্থ : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। খাবার এতটুকু খাওয়াই যথেষ্ট যতটুকু খেলে কোমর সোজা করে দাঁড়ানো যায়। এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[২]

পানাহারের প্রাসঙ্গিক মাসআলাসমূহ

খাবার খাওয়ার আদর্শ পদ্ধতি

খাবার খাওয়ার আদর্শ পদ্ধতি হলো জমিনে কোনো কিছু বিছিয়ে খাওয়া। কারণ এতে খাবার পড়লে উঠিয়ে খাওয়া যায় এবং কাপড়ও নষ্ট হয় না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: «ما أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوانٍ، ولَا فِي سُكْرُجَةٍ، ولَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ» قُلْتُ لِقَتادَةَ: عَلَامَ يَأْكُلُونَ؟ قالَ: عَلَى السُّفَرِ.

---

১. সহীহ মুসলিম : ২০৫২

২. জামে তিরমিযী : ২৩৮০; মুসতাদরাকে হাকেম : ৭১৩৯

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো "খিওয়ান" (টেবিল জাতীয় উচুঁ স্থানে)-এর ওপর খাবার রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট বাটিতেও আহার করেননি। আর তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটি তৈরি করা হয়নি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে তারা কিসের ওপর আহার করতেন? তিনি বললেন, সুফরাহ-এর ওপর।[১]

سفرة (সুফরাহ) শব্দের অর্থ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর বিখ্যাত শরাহ "ফাতহুল বারীতে" বলেছেন,

وأَنَّ أَصْلَهَا الطَّعامُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ المُسافِرُ وأَكْثَرُ ما يُصْنَعُ فِي جِلْدٍ فَنُقِلَ اسْمُ الطَّعامِ إلى ما يُوضَعُ فِيهِ.

অর্থ : মুসাফির সাথে নেওয়ার জন্যে যে খাবার তৈরি করে থাকে তাকে "সুফরা" বলা হয়। অধিকাংশ সময় এ খাবার কোনো চামড়ায় রাখা হতো। পরবর্তিতে ওই খাবারের নামে (যে বস্তুর মধ্যে খাবার রাখা হতো) ওই বস্তুর নামকরণ করা হয়, অর্থাৎ ওই বস্তুকেই "সুফরা" তথা দস্তরখান বলার প্রচলন শুরু হয়।[২]

বুঝা গেল, সুফরা উঁচু কিছু নয়; বরং জমিনে রাখা পাত্র, যার ওপর খাবার খাওয়া হয়।

চেয়ারে বসে খাবার খাওয়ার বিধান

বর্তমান যামানায় চেয়ার-টেবিলে বসে খাবার খাওয়া কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট নয় এবং অহংকারের আলামতও মনে করা হয় না। এই জন্য চেয়ার-টেবিলে বসে খাবার খাওয়া বৈধ।[৩] তবে এটি অনুত্তম সুন্নত পরিপন্থি হওয়ার কারণে। সুন্নত হলো মাটিতে বসে খাওয়া।

খাবার শেষে পাত্রে হাত ধুয়ে সেই পানি পান করা

খাবার বাসনে হাত ধুয়ে সেই পানি খাওয়া সুন্নত নয়। হাদীস ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। অতএব একে সুন্নাহ মনে করা চরম ভ্রান্তি। বরং কেউ একে সুন্নত মনে করলে তার গুনাহ হবে। অবশ্য সুন্নত বা মুস্তাহাব মনে না করে কেবল বৈধ আমল হিসাবে যদি কেউ তা করে, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যান্য বৈধ আমল যেমন, এটিও তেমন। এর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

---

১. সহীহ বুখারী : ৫৪১৫, ৬৪৫০
২. ফতহুল বারী : ৯/৫৯২; আরো দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াযি ৫/৩৯৯; উমদাতুল কারী : ৫৩৮৪, মিরকাতুল মাফাতীহ : ৪১২৯; লিসানুল আরব : ৪/৩৬৮
৩. ফতোয়া কাসিমিয়া : ২৪/৪৪

বাম হাতে পানি পান করা

বিনা ওযরে বাম হাতে পানি পান করা মাকরূহ। একাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন, এবং ইরশাদ করেছেন যে, শয়তান বাম হাতে পানি পান করে। হাদীসে এসেছে,

> عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: لا تَأْكُلُوا بِالشِّمالِ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَأْكُلُ بِالشِّمالِ.

> **অর্থ :** হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বাম হাতে আহার করবে না। কারণ, শয়তান বাম হাতে আহার করে।[১]

মাথায় টুপি না পরে খাবার খাওয়া

পানাহারের সময় মাথা ঢাকা জরুরি নয়। অতএব টুপি ছাড়াও পানাহার করা যাবে।[২]

চামচ দিয়ে খাবার খাওয়া

খাবার ক্ষেত্রে একটি আদব হলো, বিনয়ের সাথে খাবার খাওয়া। হাত দিয়ে খাবার খাওয়া বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ।

এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে আহার গ্রহণ করতেন। হাদীসে এসেছে,

> عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

> **অর্থ :** প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়ে আহার করতেন এবং তিনি হাত মুছে ফেলার পূর্বে চেটে খেতেন।[৩]

অতএব স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব খাবার হাত দিয়ে খাওয়া যায়, তা হাত দিয়ে খাওয়াই উত্তম। এছাড়া চামচ দিয়ে খাওয়ার মধ্যে কিছু খাবার অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই এ কারণেও চামচের ব্যবহার না করাই ভালো। অবশ্য যেসব খাবার হাত দিয়ে খাওয়া যায়

---

১. সহীহ মুসলিম : ২০১৯
২. রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৪০ (এইচ এম সাঈদ); ফতোয়া হিন্দিয়া : ৫/৩৩৭ (বৈরুত); ফতোয়া মাহমুদিয়া : ২৪/১৬০-১৬১
৩. সহীহ মুসলিম : ২০৩২

না। যেমনঃ তরল জাতীয় খাবার, কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে, সেক্ষেত্রে চামচের ব্যবহার দূষণীয় নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো,

১. অহংকারবোধ না থাকা।

২. বিধর্মীদের সংস্কৃতির অনুসরণের নিয়ত না থাকা।

৩. খাবারের কোনো অংশ যেন অপচয় না হওয়া। এজন্য প্রয়োজনে খাবার শেষে বরতন চেটে খেতে হবে।[১]

কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া

মৌলিকভাবে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া বৈধ। এটি হালাল উদ্ভিদ। তবে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে মুখে যেহেতু দুর্গন্ধ হয়, তাই তা খেয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার না করে মসজিদে কিংবা জনসম্মুখে যাওয়া মাকরূহ।[২] হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

অর্থ : বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খেয়েছে, সে যেন (মুখ না ধুয়ে) আমাদের নিকট অথবা আমাদের মসজিদে না আসে। সে যেন ঘরেই বসে থাকে।[৩]

---

১. আলমিনহাজ শরহু মুসলিম : ২/১৭৫ মাকতাবায়ে ইসলামিয়াঃ

فِي هذه الأحاديث أنواع من سُنَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا اسْتِحْبَابُ لَعْقِ الْيَدِ مُحَافَظَةً عَلَى بَرَكَةِ الطَّعَامِ وَتَنْظِيفًا لَهَا وَاسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلالعذر بأن يكون مرقاوغيره مما لا يمكن بِثَلَاثٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ

২. আল মিনহাজ শরহু মুসলিম : ২/১৮৩-

قَوْلُهُ فِي الثُّومِ (فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قال لاولكنى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ الثُّومِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ أَوْ حُضُورَ جَمْعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ مُخَاطَبَةَ الْكِبَارِ وَيَلْحَقُ بِالثُّومِ كل ماله رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ.

আরো দেখুন : ফতহুল বারী : ২/৪৩২; উমদাতুল কারী : ৬/১৪৬; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪/৪০; রদ্দুল মুহতার : ১/৬৬১

৩. সহীহ বুখারী : ৮৫৫

খাবার খাওয়া অবস্থায় চুপ থাকা

খাবার খাওয়ার সময় চুপ থাকার কোনো বিধান শরীয়তে নেই। বরং ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, খাবার খাওয়ার সময় একেবারেই চুপ না থাকা উচিত। মাঝেমধ্যে ভালো কোনো কথা বলা চাই।[১] তদ্রূপ খাবার খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত বা মাঝে মাঝে "আলহামদুলিল্লাহও" বলা উচিত। তবে তেমন কোনো জটিল আলোচনা থেকে বিরত থাকা চাই, যা বলতে বা শুনতে গেলে খাবারের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

দাঁড়িয়ে পানাহার করার বিধান

দাঁড়িয়ে পানাহার করা সুন্নত পরিপন্থি। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ، فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

অর্থ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, দাঁড়িয়ে আহার করতেও নিষেধ করেছেন? হযরত আনাস রা. বললেন, এটা দাঁড়িয়ে পান করার চেয়েও বেশি খারাপ।[২]

অতএব স্বাভাবিক অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা ঠিক নয়। অবশ্য যেখানে বসার কোনো ভদ্রোচিত ব্যবস্থা নেই এবং খাবারেরও চাহিদা রয়েছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পানাহারের অবকাশ আছে।[৩]

---

১. ইহয়াউয়ু উলুমিদ দীন : ৫/২২৭-

(أَنْ لَا يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ) إذا شرعوا فى الأكل، (فإن ذلك من سيرة العجم) فإنهم يعدون الكلام فى حالة الأكل من سوء الادب وليس كذلك (ولكن يتكلمون بالمعروف) وبما يتناسب الوقت والحال (ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها) ليعتبر بذلك ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة فربما يبدو منها شئ فيقذر الطعام.

আরো দেখুন : ফতোয়া হিন্দিয়া : ৫/৩৯৯; রদ্দুল মুহতার : ৬/১৪১

২. সহীহ মুসলিম : ৫২৩৪

৩. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪/১৮-

وإذا ثبت أحاديث النهى فالمسلك الخامس أولى، وهو أن تحمل على كراهة التنزيه ولا يعارضه حديث على فى نفى الكراهة... والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه- أن الكراهة إنما هى فى المواقع التى يتيسر فيها محل للجلوس، فاما اذا لم يتيسر او كان فى الجلوس تكلف شديد، فلا كراهة أيضا، انتهى.

চারজানু হয়ে বসে পানাহার করা

চারজানু হয়ে বসে পানাহার করা নাজায়েয নয়।[১] তবে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে নববী সুন্নাহ যেহেতু বিনয়াবলম্বন করা। তাই উলামায়ে কেরাম বলেন, এক্ষেত্রে বসার আদব হলো,

১. হাঁটু গেড়ে আত্তাহিয়্যাতুর সূরতে বসা।
২. বাম পা মাটিতে বিছিয়ে ডান হাঁটু খাড়া রেখে বসা।
৩. দু'পদতলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটু খাড়া রেখে বসা।[২]

খাওয়ার মাঝে মাঝে পানি পান করা

এটি একটি মুবাহ কাজ। এর সাথে নবীজীর সুন্নতের কোনো সম্পর্ক নেই।

ধূমপান করার বিধান

ধূমপান করার দ্বারা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় ও মানুষের কষ্ট হয়। তাই এটা মাকরূহ। এছাড়া এতে সম্পদের অপচয়ও আছে। আর শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।[৩]

---

১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪/৩১;

اما الجلوس متربعا بدون اسناد الظهر الى ما خلفه او الميلان على احد الشقين فالظاهر انه جائز بدون كراهة، لعدم ما يدل على كراهته.الخ

২. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪/৩১;

وذكر العلماء أن أدب الطعام أن يجلس الرجل جاخيا على ركبته و ظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الأخرى

৩. ফতোয়া মাহমুদিয়া : ১৮/৩৮৯, কিফায়াতুল মুফতি ১৩/২৪৭; তানকীহুল ফতোয়াল হামীদিয়া : খ. ২, পৃ. ৩৬৬ (মাকতাবায়ে রশীদিয়া):

الأول أن الأصل في المنافع الإباحة ، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا} ، واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوب ، الثانية قوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده }، والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى {أحل لكم الطيبات } والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها ، والثاني أن الأصل في المضار التحريم ، والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام {لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول؛ إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب ، والترياق أو بالاستقذار كالمخاط ، والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا، وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع، فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت انتفاعه، فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين، فإن أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير، نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مرغوب ولو لم ينفع ولم يضر، هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب ، والله أعلم بالصواب. كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى .

ফতোয়ায়ে শরইয়্যাহ : খ. ১০, পৃ. ১৪৫, রদ্দুল মুহতার : ১/৬৬১

জর্দা দিয়ে পান খাওয়া

পানের সাথে জর্দা বা তামাক[1] খাওয়া ডাক্তারি মতে শারীরিক ক্ষতির কারণ। তাই যথাসম্ভব এর থেকে বিরত থাকা উচিত। আর কারো ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে, তার জন্য এটা থেকে বিরত থাকা আরো বেশি জরুরি।

উল্লেখ্য, যারা পান, জর্দা খায়, তাদের জন্য নামাজ আদায়ের পূর্বে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া কর্তব্য, যেন পানের কনাগুলো বের হয়ে যায় এবং গন্ধ না হয়।[2]

পানের সাথে চুন খাওয়া

মৌলিকভাবে পানের সাথে চুন খাওয়া বৈধ। তবে কোনো চুন যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তাহলে তা খাওয়া উচিত নয়।[3]

জুতা পরিধান করে পানাহার করা কি মাকরূহ?

জুতা পরিধান করে পানাহার করা মাকরূহ নয়। তবে জুতা খুলে পানাহার করাই শ্রেয়। এতে আরাম ও প্রশান্তি অর্জিত হয় এবং বিনয় ও ভদ্রতাও প্রকাশ পায়।[4]

হিন্দুদের হোটেলে তাদের বানানো রুটি ও সবজি খাওয়ার বিধান

হিন্দুদের খাওয়ার পাত্র যদি পাক হওয়া নিশ্চিত হয় কিংবা এতে কোনো হারাম বস্তু ব্যবহার না হয় তাহলে তাদের হোটেলে উক্ত খাবার গ্রহণে অসুবিধা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে তাদের হোটেলে না খাওয়া চাই।[5]

---

১. জর্দা (তামাক) : জর্দা এক ধরনের তামাকজাত পণ্য। এটা সাধারণত পানের সাথে মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জর্দা পানের স্বাদ ও গন্ধ বাড়িয়ে দেয়। ফলে তা পানসেবীদের কাছে এক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে সমাদৃত। জর্দা তামাক হতে প্রস্তুত হওয়ায় এটা নেশার উদ্রেক করে। যার কারণে এটা নেশার বস্তু হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পানের সাথে ছাড়াও চিবিয়ে কিংবা দাঁতের ফাঁকে রেখেও এটা ব্যবহার করা হয়। যেগুলো শুধুমাত্র নেশার জন্যই ব্যবহৃত হয়। জর্দার অ্যালকালয়েড ও নিকোটিন অধিক মাত্রায় বিষাক্ত। ক্যানসার গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা– আই. এ. আর. সি. এর মতে– যারা পানের সাথে তামাকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাদের সাধারণের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি মুখে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২. রদ্দুল মুহতার : ১/৬৬১; ফতোয়া শারইয়্যাহ : খ. ১০, পৃ. ১৪৫, তানকীহুল ফাতাওয়া হামীদিয়া : ২/৩৬৬

৩. মাজমুআতু রাসায়েলে লখনবী (নফউল মুফতী ওয়াস সায়েল) : ৪/১৪৮:

الاستفسار: هل يجوز أكل النورة فى الورق المأكول فى أمصار الهند وهو التنبول؟ الاستبشار: نعم! فى نصاب الاحتساب: وذكر الحلوائى: أن أكل الطين إن كان يضر يكره، وإلا فلا. وان كان يتناوله قليلا أو يفعله احيانا، لا يكره. قال العبد الضعيف عفا الله شانه : ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع ورق الماكول فى ديار الهند. لأنه قليل نافع، فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها، وهو الخمرة، انتهى.

وقد نقل عنه فى خزانة الرواية ومجمع البركات أيضا:

আরো দেখুন : ফতোয়া হিন্দিয়া ৫/৩৯৪; ফতোয়া দারুল উলুম দেওবন্দ : ১৬/৬৭; আহসানুল ফতোয়া ৮/৩৭৪

৪. ফয়জুল কাদীর : ১/৩৮৫; ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ : ১৬/৫১; আহসানুল ফতোয়া : ৮/১১১

৫. আন নুতাফ ফিল ফতোয়া : পৃ. ৪৩৫; ফতোয়া মাহমুদীয়া : ১৮/৩৯; আপকে মাসায়েল : ৮/৩৯৭

নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পূর্বেই ফুটন্ত পানিতে হাঁস-মুরগি ইত্যাদি চুবানোর বিধান

পানি যদি এত বেশি গরম ও উত্তপ্ত হয় যে, নাপাকি গোশতের ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে ওই গোশত নাপাক হয়ে যাবে। খাওয়া বৈধ হবে না। এ পরিমাণ গরম না হলে তা খাওয়া বৈধ।[১] বর্তমানে সাধারণত পানি অনেক বেশি গরম থাকে না। অতএব এমনটি হলে তা খাওয়া যাবে।

- মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম (১৪৩৬-৩৭হি. শিক্ষাবর্ষ)
- মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (১৪৪৩-৪৪হি. শিক্ষাবর্ষ)

---

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকিল ফালাহ : পৃ. ৮৬:

وعلى هذا الدجاج الخ" يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكثت فيه بعدذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وان لم يصل الماء إلى حد الغليان أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا كما حققه الكمال

বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ, ২/৪৯ :

.... لأن درجة الحرارة فى هذا الماء لا تبلغ إلى نقطة الغليان حيث تكون أقل بكثير من مأة درجة (مأوية) ثم بقاء الدجاج فى هذا الماء الحر لا يجاوز دقائق معدودة لا يكفى لتشرب اللحم النجاسةَ، والفقهاء الذين قالوا بنجاسة الدجاج إنما قالوا ذلك إذا كان الماء بلغ إلى درجة الغليان، ويبقى فيه الدجاج مدة تكفى لتشرب اللحم النجاسة... وقد ادخلت يدى فلم يكن محرقا فضلا من كونه بلغ الى حد الغليان، انتهى.

আরো দেখুন: ফতহুল কাদীর: ১/২১০; আল-বাহরুর রায়েক: ১/৪১৫